স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শিল্পের বিবর্তন

(১৯৪৮-২০০৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি এইচ ডি ডিগ্রি-এর আংশিক শর্তপূরণের জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষকঃ

শুভদীপ দাস

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২

২০২২

Certificate

Certified that the thesis entitled **স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শিল্পের বিবর্তন (১৯৪৮-২০০৭)** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor	Signature of the Candidate
Date:-	Date:-

আমার প্রয়াত পিতার উদ্দেশ্যে

যিনি নিজে একজন বিদ্যুতশিল্পের কর্মী ছিলেন।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i-iii

শব্দসংক্ষেপণ iv

সারণিসূচি v

চিত্রসূচি vi

ভূমিকা ১-২৭

প্রথম অধ্যায় ২৮-৭০

বিদ্যুৎ শক্তির বিবর্তন ও ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারঃ প্রাক্কথন

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭১-১৬০

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার

তৃতীয় অধ্যায় ১৬১-২২৭

বিদ্যুতশিল্প ও শ্রমিকঃ প্রেক্ষাপট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

চতুর্থ অধ্যায় ২২৮-২৮০

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও অচিরাচরিত শক্তির আগমন

পঞ্চম অধ্যায় ২৮১-৩১৯

সমাজ ও পরিবেশঃ প্রসঙ্গ বিদ্যুৎ

উপসংহার ৩২০-৩৩৭

পরিশিষ্ট ৩৩৮-৩৪৩

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৪-৩৫৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি আমার এই গবেষণাপত্রের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা (ড.) মহুয়া সরকারের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি ইতিহাস বিভাগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে এবং শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও আমার এই গবেষণাপত্রের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে আমি তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁর থেকে পেয়েছি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপত্য স্নেহ। আমাকে তিনি তাঁর কাছে গবেষণার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী রইলাম। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টাই এই গবেষণাকর্ম সম্পন্নের অন্যতম পাথেয়।

আমার বাবা স্বর্গীয় শম্ভুনাথ দাস, সিইএসসিতে শিফট ক্লিনার ছিলেন। ১৯৯৭ সালে নাইট ডিউটি করে ফেরার সময়ে যাদবপুর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ৪ বছর লড়াইয়ের পর ২০০১ সালে পুনরায় তিনি কাজে যোগ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু কিছুটা বাধ্য হয়েই তাকে ২০০৪ সালে স্বেচ্ছায় অবসর নিতে হয়েছিল। মনে পড়ে মাঝে মাঝে বাবার সাথে ভিক্টোরিয়া হাউস (সিইএসসি-র হেড অফিস) যেতাম, দেখতাম বড় বড় মেশিনগুলো। তখন বুঝতামা না কোনটা বয়লার মেশিন আর কোনটা কুলিং প্ল্যান্টের অংশ। আকর্ষণটা তখন থেকেই ছিল, পরবর্তীতে যখন এমফিলে সুযোগ পেলাম তখন প্রয়োজনীয় পড়াশোনা করতে পারলাম। এই বিষয়ে আগ্রহের অভাব ছিল না, তাই সেই আগ্রহ থেকেই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা।

আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসারি কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রূপকুমার বর্মন ও কৌশিক রায় মহাশয়কে যারা নানা সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের যাদের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া বিভাগে দীর্ঘ ১৪টা বছর থাকতে পারতাম না। এই কর্মে সব সময় আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, টাউন হল গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভ, স্টেট আর্কাইভ, নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাই উক্ত সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আলাদা ভাবে নাম উল্লেখ করব সিইএসসি-র শ্রী তরুণ ভরদ্বাজ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের শ্রী বিতান মজুমদার, গোপাল মুখার্জি ও অরুণ কুমার দে মহাশয়ের, যাদের সহযোগিতা ছাড়া তথ্য সংগ্রহের কাজটি আরো কঠিন হয়ে উঠত। ধন্যবাদ জানাই আমার গবেষক বন্ধু ও সহপাঠী মুরারি মোহন মিস্ত্রী, অঞ্জন দাস ও প্রাঞ্জল নন্দী-র। শুভঙ্কর দা, অনির্বাণ দা, অমীয় দা, অলোক দা, ময়ূখ দা'র থেকে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি, এদের প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী। অপলক, পার্থ, মৃন্ময়, মানিক দা, অম্লান দা, চিন্ময় দা, গণেশ দা ও সম্প্রীতি দি'র প্রতি কৃতজ্ঞ সর্বদা পাশে দাঁড়ানোর জন্য। গৌরব দা, অর্ক দা ও বসুধিতা দি-র প্রতি কৃতজ্ঞ বিভিন্ন সময় আমায় স্টাডি ম্যাটেরিয়াল যোগাড় করে দেওয়ার জন্য। আলাদা করে বলতে চাই আমার সহধর্মিণী আহিতাগ্নির কথা যে সর্বদা বিভিন্নভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে ও ক্রমাগত আমাকে উৎসাহিত করে গিয়েছে। সর্বোপরি আমার পরিবারবর্গের (মা, দিদি, মেসো, মামা, আহিতাগ্নির বাবা ও মা) যে সমর্থন, স্নেহ-ভালোবাসা, মানসিক ও আর্থিক সাহায্য পেয়ে এসেছি তাঁদের প্রতিও সমপরিমাণ ঋণী তাই তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। মৌসুমি (বটু) মাসী, সুবিদীত মেসো ও সায়নের কথা বিশেষ ভাবে বলতে চাই যাদের সাহায্য ছাড়া এই অধমের ন্যাশনাল আর্কাইভের কাজ কিছুতেই সম্পন্ন হত না। আলাদা ভাবে বলতে চাই আমার স্বর্গীয় বাবার কথা যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের জন্যই আজ

এই জায়গায় পৌঁছাতে আমি সক্ষম হয়েছি। আমার এই গবেষণাকর্ম তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সেই সকল মানুষের যারা বিভিন্ন ভাবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করেছেন। পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই সেইসকল মানুষকে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার এই গবেষণাকর্ম শেষ করতে সাহায্য করেছেন।

শুভদীপ দাস
গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দসংক্ষেপণ

CESC(সি.ই.এস.সি)	Calcutta Electric Supply Corporation
DVC(ডি.ভি.সি)	Damodar Valley Corporation
DPL(ডি.পি.এল)	Durgapur Projects Limited
WBSEB(ডব্লিউ.বি.,এস.ই.বি)	West Bengal State Electricity Board
CEA(সি.ই.এ)	Central Electricity Authority
REC(আর.ই.সি)	Rural Electrification Corporation
USAID *(ইউ.এস.এ.আই.ডি)*	United States Agency for International Development
USNRECA *(ইউ.এস.এন.আর.সি.এ)*	United States National Rural Electric Cooperative Association
NDS *(এন.ডি.এস)*	National Development Strategies
WWF *(ডব্লিউ.ডব্লিউ.এফ)*	World Wild Life Fund
IUCN *(আই.ইউ.সি.এন)*	International Union for Conservation of Nature

সারণিসূচি

(১) ২.১- ৩১শে মার্চ ১৯৭১ সাল অবধি বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুতায়নের হার, পৃ-১১৩।

(২) ৪.১- কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক ও ডিজেল পাম্প, পৃ-২৫২।

(৩) ৪.২- গৃহস্থ বাড়িতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস (গ্রাম), পৃ-২৬৩ ।

(৪) ৪.৩- গৃহস্থ বাড়িতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস (শহর), পৃ-২৬৩।

চিত্রসূচি

১. চিত্র ১ই নভেম্বর অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তি সঞ্চয় ৭ সালের ১৯৪৭ - নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক এক বিজ্ঞাপন। পৃষ্ঠা-৩৩৮

২. চিত্র ২ ও ৩- ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত দীপ্তি ও উজ্জ্বলা কোম্পানির হ্যারিকেন এর বিজ্ঞাপন। পৃষ্ঠা-৩৩৮

৩. চিত্র ৪- ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ফ্যানের বিজ্ঞাপন। পৃষ্ঠা-৩৩৮

৪. চিত্র ৫স্বাধীনতা - দিবসের প্রাক্কালে কলকাতায় ,উদযাপন ”আজাদ হিন্দ দিবস“ পিছনে চলমান বৈদ্যুতিক ট্রাম। পৃষ্ঠা-৩৩৯

৫. চিত্র ৬- লোডশেডিংর সময়ে কলকাতার রাস্তা।- পৃষ্ঠা-৩৩৯

৬. চিত্র ৭- ১৯৪০ সালের হাতিবাগান মোড়ে চলমান বৈদ্যুতিক ট্রাম। পৃষ্ঠা-৩৩৯

৭. চিত্র ৮- লিট্ এন্ড ফিল থিয়েটারসালে স্যার জোসেফ সোয়ানের বক্তৃতার সময় ১৮৮০: এটি বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা আলোকিত প্রথম পাবলিক রুম ছিল। পৃষ্ঠা-৩৪০

৮. চিত্র ৯ ও ১০- ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত কিছু স্ট্রীট লাইট। পৃষ্ঠা-৩৪০

৯. চিত্র ১১- অ্যান‘ আনস্ট্রেইন্ড ডিমন’ ১৯০০- সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিদ্যুৎ বিরোধী কার্টুন। পৃষ্ঠা-৩৪০

১০.চিত্র ১২- জনৈক সিইএসসি কর্মীর পরিচয়পত্র (হাতে লেখা) পৃষ্ঠা-৩৪১

১১.চিত্র ১৩- জনৈক সিইএসসি কর্মীর পরিচয়পত্র (ডিজিটাল) পৃষ্ঠা-৩৪১

১২.চিত্র ১৪- জনৈক সিইএসসি কর্মীর অবসরের সময়ে সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া শুভেচ্ছাপত্র পৃষ্ঠা-৩৪১

১৩.চিত্র ১৫ বাম)দিকে ১৬ ও ((ডানদিকে(: সিইএসসির নিউ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ - কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম ও বয়লার হাউসের কিছু অংশ। পৃষ্ঠা-৩৪২

১৪.চিত্র ১৭ -সিইএসসির নিউ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাঠামো।- পৃষ্ঠা-৩৪২

১৫.চিত্র ১৮ -উপর থেকে তোলা সিইএসসির নিউ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ- কেন্দ্রের ছবি। পৃষ্ঠা-৩৪২

১৬.চিত্র ১৯- বিভিন্ন পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত (যুগান্তর ,আনন্দবাজার ,দৈনিক বসুমতী) বিদ্যুতশিল্প সংক্রান্ত কিছু খবর। পৃষ্ঠা-৩৪৩

ভূমিকা

বিদ্যুৎ এমন একটি পরিষেবামূলক পণ্য যা অন্য যেকোন সাধারণ উৎপাদিত পণ্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিদ্যুতের উৎপাদন পদ্ধতি, বিক্রির বাজার, যোগান-সরবরাহ সমস্ত কিছুই অন্য যে কোন উৎপাদিত বস্তুর থেকে এতটাই আলাদা যে কোন দেশের সভ্যতার বিকাশের নিরিখে বিদ্যুৎকে সব দিক থেকেই অত্যন্ত সংবেদনশীল মাপকাঠিতে বিচার করা প্রয়োজন। সমাজ জীবনে বিদ্যুৎ অতি প্রয়োজনীয় এক পণ্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে গোটা দেশ জড়িয়ে থাকে। সে কারণেই সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি-নির্ধারণ করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরী। যেকোনো দেশের কল-কারখানা, কৃষিকাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহন ও যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল এবং দৈনন্দিন জনজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্যুৎ অপরিহার্য, তাই দেশ পরিচালনার ভার যাঁদের উপর থাকে সেই রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথম কর্তব্যই হল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রটিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হওয়া। জনগণ ও দেশের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক বিদ্যুৎ-নীতি নির্ধারণ করা ও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই তা বাস্তবায়িত করা।

লন্ডনে বিদ্যুতের আবির্ভাবের এক যুগের মধ্যেই উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছিল। প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের বিদ্যুৎশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে এই উৎপাদনের বেশীরভাগটাই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশান পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে যুক্ত ছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তা কখনই প্রকৃত অর্থে জনহিতকর ছিল না। গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক শাসকরা এই

উৎপাদিত বিদ্যুতের সম্ভাব্য গ্রাহক হিসাবে ‘শিল্পক্ষেত্র’-কে চিহ্নিত করলেও তা প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। উদ্ভুত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের সরবরাহের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। ক্রমশ বিদ্যুতের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলাতে থাকে এবং বলা বাহুল্য শিল্প থেকে শুরু করে গৃহস্থ বাড়ির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহারের সুত্রপাত হলেও বাস্তবিকভাবে বিদ্যুতশিল্পের বিকাশ স্বাধীনোত্তর পর্বে গতি পেয়েছিল। স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুতের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। এই সংস্থার উপর কলকাতা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের দায়িত্ব ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে স্বাধীনতার পরে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, নতুন রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদল ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার আখ্যান নিয়ে আলোচনা হলেও সামগ্রিকভাবে বিদ্যুতশিল্প, তার বিবর্তন এবং সঙ্কট ঐতিহাসিকদের দ্বারা সেভাবে আলোচিত হয়নি। কিছুটা সেই তাগিদে এই বিদ্যুতশিল্পের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনার মত অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় নিজেকে ব্রতী করেছি। আবার একথাও স্বীকার্য যে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থপঞ্জী বা উপাদানের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্প বিষয়ক ইতিহাস কোনও ভাবেই এই সামান্য আলোচনায় সমাপ্ত হওয়ার নয়। এই গবেষণা সন্দর্ভের নামকরণ করা হয়েছে স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিবর্তন (১৯৪৮-২০০৭)। গবেষণার শুরুর সময়কাল হিসাবে ১৯৪৮ সাল নেওয়ার উদ্দেশ্য হল এই যে স্বাধীন ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ আইন ১৯৪৮ সালেই প্রণয়ন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল এবং ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের কাজকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙ্গে তিনটি পৃথক সংস্থা গঠিত হয়েছিল।

মানুষ হল অনন্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। সেই সূচনা কাল থেকে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার ও অদেখাকে দেখার আগ্রহ মানবজাতির মননে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ এবং লব্ধ জ্ঞানের বাস্তবিক প্রয়োগ, মানুষকে অন্য সকল প্রাণীর তুলনায় প্রতিনিয়ত উন্নততর করে তুলেছে। এই জ্ঞানই মানুষের সামগ্রিক বিবর্তনের পথকে সুগম করেছিল এবং মানুষ যত বিবর্তিত হয়েছিল ততই তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল যা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। এই বিবর্তিত অগ্রগতির সঙ্গেই মানুষের মস্তিস্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিল নিত্য নতুন কলাকৌশল, যা জন্ম দিয়েছিল আশ্চর্য সব আবিষ্কারের। এই আবিষ্কার মানুষের জীবন তথা সমগ্র সভ্যতার চরিত্রকেই বদলে দিতে সাহায্য করেছিল। অরণ্যের বৃক্ষবাসী মানুষের কাছে আগুন ছিল সৃষ্টির সব থেকে বড় আশীর্বাদ। শুরুর দিকে মানুষ আগুনকে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেও সে যত 'সভ্য' হয়েছে, তার দ্বারা আগুনের ব্যবহারেরও তারতম্য দেখা গিয়েছে। আলোকিতকরণের জন্য আগুনের প্রয়োজন ক্রমশই বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় শতকে প্রাচীন মিশরে, পাতলা কাপড়ের টুকরো পাকিয়ে সেটিকে উচ্চতাপে গলিত পশুর চর্বির মধ্যে ডুবিয়ে এক ধরণের লম্বা বাতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

সপ্তদশ শতকে আবির্ভাব হয় 'মোমবাতি'র, যা অচিরেই ঘর আলোকিতকরণের মূল সরঞ্জাম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথেই এই 'আলো'-র উৎস বদলাতে থাকে, পশুচর্বি থেকে শুরু করে মোমবাতি এবং সেখান থেকে আসে গ্যাস এর মাধমে আলোর ব্যবস্থা এবং এর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'বিদ্যুৎ' বা 'ইলেক্ট্রিসিটি'। বিগত ২০০ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানব সভ্যতা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগে কখনও সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনে এত দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে নতুন নতুন

প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে মানবজীবন এক ধাক্কায় বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ছে। পরিবর্তনটা শুধু ব্যবহারিক জীবনেই নয়, মানসিক জগতেও এবং এই শতাব্দীর প্রত্যাশা, প্রাপ্তি নিয়ে যেকোন আলোচনাতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।

প্রস্তর যুগ থেকেই বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে মানুষ পরিশ্রম লাঘব করার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করেছিল। এগুলিকে ঠিক তথাকথিত যন্ত্র বলা না গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে মানুষের কায়িক শ্রমকে লাঘব করতে তা ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে একথাও ঠিক যে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে 'যন্ত্র বানিয়ে সেই পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ তার চেয়ে বলশালী জন্তুদের শিকার করত। যন্ত্র চালাতে প্রয়োজন ছিল 'শক্তি'র এবং ঐ সময়ে মানুষের কাছে শক্তির একমাত্র উৎস ছিল তাদের নিজেদের কায়িক শ্রম। ক্রমান্বয়ে এই মানুষই নিজেদের প্রয়োজনে কৃষিকাজকে গুরুত্ব দিয়েছিল এবং তা মানুষকে স্থায়ী বসতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই স্থায়ী বসতি জন্ম দিয়েছিল মেহেরগড়, হরপ্পা, মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার। কৃষিভিত্তিক এই সভ্যতাগুলি তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের (কাঠের লাঙ্গল) ব্যবহার করেছিল। সমগ্র প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়েও কৃষিভিত্তিক এই কর্মকাণ্ড বজায় ছিল এবং বলা বাহুল্য ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে গিয়েছিল। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ইউরোপীয় ম্যানর ব্যবস্থায় কৃষিক্ষেত্রে কায়িক শক্তির পরিবর্তে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রাকৃতিক শক্তি রূপান্তরের যন্ত্র হিসেবে বায়ু ও জলের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কল-এর ব্যবহার। কৃষিতে, সেচের কাজে ও শস্য মাড়াই করতে এর ব্যবহার করা হয়েছিল। একই ভাবে সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উন্নতি হলেও বৃহৎ আঙ্গিকে সেগুলির সামাজিকীকরণের উদাহরণ তেমন পাওয়া যায় না। সমাজে

তখন কায়িক পরিশ্রম করত দাসেরা তাই যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারের কোনও চাহিদাই সমাজে ছিল না।

রেনেসাঁস পরবর্তী প্রাক শিল্পবিপ্লবের যুগে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। ১৬৯৮ সালে, ইংরেজ যন্ত্রবীদ টমাস সাভেরি, ফায়ার ইঞ্জিন নামক আগুনের সাহয্যে জল ফুটিয়ে বাষ্প করার একটি যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছিলেন।[১] সাভেরির পাম্পের দক্ষতা বেশি না হলেও খনিতে জমে যাওয়া জল বের করে আনার কাজে এই যন্ত্র খুব সফল হয়েছিল। ১৭১২ সালে টমাস নিউকোমেন ও টমাস সাভেরি, ডাডলে ক্যাসেলের সামনে বাষ্পশক্তি ব্যবহার করে একটি উন্নত পাম্পের প্রথম ব্যবহারিক দক্ষতার পরীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই যন্ত্রের ধারণার উন্নতির চেষ্টা চালিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের জেমস ওয়াট ও রিচার্ড ট্রেভেথিক এবং আমেরিকার অলিভার ইভানস। শেষে ১৭৮২ সালে ওয়াট একটি উন্নতমানের দ্বি-ঘাত ইঞ্জিনের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। ১৮২৫ সালে জর্জ স্টিফেনসনের বাস্পচালিত 'লোকোমোটিভ অ্যাক্টিভ', ইংল্যান্ডের ডারহাম কাউন্টির স্টক্টন ও ডার্লিংটনের মধ্যে প্রথমবার যাত্রী ও মাল উভয়ই একসাথে বহন করেছিল। ক্রমে মানুষ পেশী ও পশুশক্তির গণ্ডি পেরিয়ে প্রাকৃতিক শক্তি এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনে অভাবনীয় সব পরিবর্তনের প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিল।

বাষ্পশক্তির একটা সমস্যা এই যে এই শক্তি যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে তারই কাছাকাছি তা ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যিক। অর্থাৎ একে বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয় এবং একে সঞ্চয় করে রাখাও সম্ভব নয়। এর সমাধান হিসাবে মানুষের পরিচয় হয়েছিল 'বিদ্যুৎ' শক্তির সঙ্গে। ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন এক কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া হলেও বাস্তবিক ব্যবহারের দিক থেকে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। পরিবাহী তারের

মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সঙ্গেই বিদ্যুৎকে সঞ্চয় করে রাখাও যেত। নঞর্থক হলেও বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাথে মানুষের পরিচিতি বহুদিনের। প্রাথমিক পর্বে এই সংক্রান্ত গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন মুলতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক গ্রীক পণ্ডিত লক্ষ্য করেন যে তৈল স্ফটিককে (অ্যাম্বার) পশুলোম দিয়ে ঘষলে সেটি ছোটখাট হাল্কা জিনিসকে আকর্ষণ করতে পারে। এই সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত গবেষণাধর্মী কাজ করেছিলেন উইলিয়াম গিলবার্ট। তিনি দেখলেন যে অ্যাম্বার ছাড়াও গন্ধক বা কাঁচের মণ্ডকে সিল্ক, ফ্ল্যানেল বা পশুলোম দিয়ে ঘষলে তারা ছোট ছোট কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। অ্যাম্বারের গ্রীক প্রতিশব্দ 'electron'-এর নামানুসারে গিলবার্ট এই ধর্মের নাম দিয়েছিলেন 'electricity'। বিদ্যুতের প্রকৃতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা আরও সহজবোধ্য হয়েছিল যখন ১৭২৯ সালে স্টিফেন গ্রে বিদ্যুতের পরিবাহিতা আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রে দেখিয়েছিলেন যে ফ্লানেল দিয়ে ঘষা কাঁচদণ্ডের বিদ্যুৎ অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত করে দেওয়া যায় এবং একটি বিদ্যুৎ আহিত বস্তুকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়ই করতে পারে। এই বিষয়ে ফ্রান্সিস হাক্সবি বিস্তারিত গবেষণা করে বিদ্যুতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করা ক্ষমতার প্রমাণ দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৭৩৩ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস ডু ফে অধিকতর গবেষণার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বিদ্যুৎ দুই প্রকার, যথা- ভিট্রিয়াস এবং রেজিন্স জাতীয়।[৩] পরবর্তীকালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাবে জাঁ আঁতোয়াঁ নোল্যেৎ এই গবেষণার নামকরণ করেছিলেন 'দুই ফ্লুইড তত্ত্ব'। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যান্ডের উইলিয়াম ওয়াটসন এবং আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন -এর গবেষণায় উঠে এসেছিল 'এক ফ্লুইড তত্ত্ব'। ফ্রাঙ্কলিন মনে করতেন তড়িত বা বিদ্যুৎ দু' ধরনের নয়, এক ধরনেরই হয় এবং এটি একটি নির্বস্তুক প্রবাহী যা সব বস্তুতেই রয়েছে। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক গ্যালভানি অন্য এক পরীক্ষা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘটনাটি আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু এই পরীক্ষার

গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেসান্দ্রো ভোল্টা। ১৭৯৫ সালে ভোল্টা দেখিয়েছিলেন যে দুটি স্বতন্ত্র ধাতুর টুকরোকে কোনও তরলে ডোবালে বা ভিজে কাপড় দিয়ে যুক্ত করলে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এই হলো প্রথম তড়িৎ কোষ এবং কোষেরই উন্নত রূপ হলো ব্যাটারি। 'বিদ্যুৎ'রহস্য ভেদ করার জন্য এই সময়ে বহু গবেষণামূলক কাজ দেখা যায়। ১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে দীর্ঘ গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন প্রথম ডায়নামো। এর থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতকে বলা হলো আবিষ্ট বিদ্যুৎ। একটি পৃথক পরীক্ষায় ফ্যারাডে একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে একটি পরিবাহী কুণ্ডলী বা অ্যার্মেচার রাখলেন। একটি জলপ্রবাহ চালিত কাঠের ঢাকার সাথে অ্যার্মেচার জুড়ে দিয়ে একে ঘোরানোর ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছিলেন। অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে অ্যার্মেচার ঘোরার ফলে এর দু-প্রান্তে বিভবপ্রভেদ তৈরি হয়েছিল এবং বহির্বর্তনীতে অ্যার্মেচার প্রান্তদ্বয় যুক্ত থাকলে প্রত্যাবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। এইভাবেই মানুষ ক্রমে যান্ত্রিক শক্তিকে থেকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের কৌশল রপ্ত করেছিল। এই অ্যার্মেচার কি দিয়ে এবং কি পদ্ধতিতে ঘোরানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কিরূপ (তাপ/জল/পারমাণবিক বিদ্যুৎ) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। সমসাময়িক সময়ে পারস্যের যন্ত্রপ্রস্তুতকারি হিপ্পোলাইট পিক্সি একটি চৌম্বকীয় বৈদ্যুতিক উৎপাদকযন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে এই যন্ত্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ একমুখী এবং তিনি দাবী করেন যে পদার্থবিদরা তাদের যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যেসব কাজে ব্যবহার করেন, তার উৎপাদিত বিদ্যুৎও সেই সকল কাজের জন্য যোগ্য। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম ফোদারগিল কোক এবং স্যার চার্লস হুইটস্টোন প্রথম ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জানা গেলেও শিল্প বা গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার মত সংবহন ও বণ্টন ব্যবস্থার পদ্ধতি মানবজাতির আয়ত্বে ছিল না। বেশ কিছুদিন পর এডিসন বিদ্যুৎকেন্দ্রের

পরিকল্পনা করলে এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল।[৫] জে ডি বার্নাল এই বিলম্বের কারণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কে দায়ী করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে বিদ্যুৎ শক্তিই ইতিহাসে প্রথম যা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গবেষণা থেক লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে এক সুসংবদ্ধ আকারে বৃহৎ শিল্পের কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়েছিল।[৬]

মানুষ যত উন্নততর সভ্যতার নির্মাণ করেছিল ততই তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কৌশলও মানুষ দ্রুত রপ্ত করেনিয়েছিল। একদিকে যেমন বিদ্যুতের ধরণ, উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টন নিয়ে গবেষণা এগিয়ে গিয়েছিল তেমনই ইতিমধ্যে প্রচলিত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে আলোকিতকরণের উন্নততর ব্যবস্থা খোঁজার কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। ১৮০২ সালে স্যার হামফ্রে ডেভি প্রথম উচ্চচাপযুক্ত কার্বন বাতি আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের যোগানের অভাবে এই বাতির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভবপর হয়নি। এর কিছুদিন পর ১৮০৫ সালে উইলিয়াম মার্ডক ম্যাঞ্চেস্টারের ফিলিপস এবং লি বাটন মিল-কে গ্যাসের আলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাথমিক ভাবে এই উদ্যোগ ৫০টি বাতি দিয়ে শুরু হলেও অচিরেই তা ৯০৪টি বাতিতে পৌঁছেছিল। মার্ডক বৃহৎ আঙ্গিকে এই কাজ শুরু করতে চাইলেও তিনি বুল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানির একজন কর্মচারী ছিলেন মাত্র। বুল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানি এই যুগান্তকারী কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী না হওয়ায় নতুন কোন প্রযুক্তি এই ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারেনি এবং অবশেষে ১৮১৪ সালে কোম্পানি তাদের গ্যাস লাইটিং-এর ব্যবস্থাটিকে বন্ধ করে দিয়েছিল। ডেভি কর্তৃক আবিষ্কৃত বাতি যুগান্তকারী ঘটনা হলেও এই বাতিতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল যা উইলিয়াম পেট্রি ও উইলিয়াম স্টেইট সংশোধন করেছিলেন। ১৮৫০

সালে এই সংশোধিত বাতি-র আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। উন্নত প্রযুক্তির এই বাতি লন্ডনের জাতীয় শিল্প যাদুঘরে আলোকিতকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। এইসময়ে ১৮৫২ সালে সোসাইটি দে আই অ্যালিয়েন্স নামক প্রথম একটি ইঙ্গ ফরাসী বৈদ্যুতিক প্রজ্বলন কোম্পানি গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ সালে ট্রিনিটি হাউসের অনুরোধে মাইকেল ফ্যারাডের পরিদর্শনে ব্ল্যাকওয়েল-এ বৈদ্যুতিক আর্ক বাতির প্রদর্শন হয়েছিল বলে জানা যায়। উচ্চচাপমুক্ত কার্বন বাতির আরো এক উন্নত সংস্করণ প্রস্তুত করেন রাশিয়ান টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার পাভেল ইয়ারলোচকভ। প্যারিস শহরে প্রথম এই বাতি প্রদর্শিত হয়। বৈদ্যুতিক আর্ক বাতির ব্যবহার বা ধারণা বহু পুরাতন হলেও সঠিক বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের ব্যবহার ১৮৭০-র দশকে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহারে দিগন্ত খুলে দেয়। আর্ক বাতিগুলি মূলতঃ আলোকিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে বড় বড় বাজার এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে। জানা যায় ১৮৭০ সালে ব্রিটেনে প্রায় ৭০০ আর্ক বাতি পথবাতি হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং প্রায় সমসংখ্যক বাতিই গৃহস্থ বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৭]

১৮৮০'র দশক থেকে সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে সারের গোডালমিং অঞ্চলে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৮২ সালে স্যার ইউলিয়াম সিমেন্স-র মতানুসারে পুরো গোডালমিং অঞ্চলে, এই উৎপাদন কেন্দ্রের ৮-১০ জন বিদ্যুতের ব্যবহারকারী ছিলেন। এই সময়ে এরা প্রায় ৫৭টি বাতি আলোকিত করতেন। এই অঞ্চলের হাউস অফ কমেন্সর সিলেক্ট কমিটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে একটি বিল-কে মান্যতা দেয় যা বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক আলোকিতকরণের আইন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এডিসন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের হলবর্ণ ভিয়াডেক্ট-এ একটি পরীক্ষামুলক বাষ্পীয় শক্তির উৎপাদক কেন্দ্র থেকে উৎপাদন শুরু করেছিলেন। এরপর তিনি সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের পার্ল স্ট্রীট স্টেমন নামক একটি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন এবং

দুই বছরের মধ্যেই এই উৎপাদন কেন্দ্রের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ জনে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে রবার্ট হ্যামন্ড ১৮৮১ সালে ব্রাইটন অঞ্চলে ব্রাম আর্ক লাইটিং-এর প্রদর্শনী করে সফলতা লাভ করেছিলেন এবং ১৮৮২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি পাকাপাকিভাবে ঐ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮০-র দশকে ইংল্যান্ডে ক্রম্পটন অ্যান্ড কোং ও সোয়ান ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি, আমেরিকার থমসন-হাউসটন ইলেকট্রিক কোম্পানি ও ওয়েস্টিং হাউস এবং জার্মানির সিমেন্স কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের কাজে যুক্ত ছিল। এই ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে ইউরোপে ও আমেরিকায় বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮] ৮০-র দশক অবধি ব্যবহৃত বা উৎপাদিত বিদ্যুৎ ছিল মূলতঃ স্থির তড়িৎ ধরনের। এই ধরনের তড়িৎকে অনেক দূরে প্রেরণ করা ছিল অসুবিধাজনক। উৎপাদিত বিদ্যুৎ দূরে প্রেরণ করতে প্রয়োজন ছিল বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের। এই বিবর্তিত বিদ্যুৎপ্রবাহ আবিষ্কারের পুরোধা ছিলেন নিকোলাস টেসলা। প্রাথমিক ভাবে টেসলার বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন এবং তাঁর গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকা যান। ১৮৮৮ সালে টেসলা পলিফেজ ইনডাকশান মোটর আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারস নামক প্রতিষ্ঠানে বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে একটি লেখা পাঠালে এবং তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের সাথে এডিসন ও তাঁর অনুগামীদের মতান্তর হয়েছিল। এডিসন বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহকে মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক মনে করতেন এবং তিনি এর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করারও চেষ্টা করেছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন ঐ সময়ে টেসলাকে এ.সি মোটর বা বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের মোটর তৈরির কাজে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে টেসলা বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং শিকাগো-তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কলোম্বিয়ান প্রদর্শনীতে বিবর্তিত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় আলোকিতকরণের

উদ্দেশ্যে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় নায়গ্রা ফলস থেকে টেসলা জেনারেটার-র সাহায্যে বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ, আলোকিতকরণের জন্য, ৩৫ কি.মি দূরে বাফেলো শহরে সরবরাহিত হয়েছিল। এই ঘটনা বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী প্রয়োগ ছিল, যা প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিরাচরিত ধারণাকে বদলে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। বিবর্তিত বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমেই উৎপাদনস্থল থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলেও বিদ্যুৎ প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।[৯] পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই সূত্রপাত হয়েছিল এক নতুন সম্ভাবনাময় যুগের।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ব্যবহারে যেরকম একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে, সভ্যতার আদিপর্ব থেকে কিন্তু এরকম ছিল না। প্রাচীন যুগের ধাতব স্তম্ভগুলি ভারতীয়দের ধাতু সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে। মধ্যযুগে আরবীয় বা ভারতীয়রা বিজ্ঞানের বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয়দের দক্ষতা ছিল সর্বজনবিদিত। ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ভারতীয়রা বিস্ময়করভাবে পারদর্শী ছিল। আবার বাংলার আবহাওয়া মসলিন ও মলমল বুননে সহায়ক ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা সেই প্রযুক্তির হদিশ যেমন পায় নি তেমনই কার্পাসতন্তুও তারা উৎপাদন করতে পারত না। ধাতু শিল্প, বিশেষ করে লৌহ, তাম্র, দস্তা শিল্প সেই মৌর্য যুগ থেকে উচ্চাসনে ছিল, যত দিন না ব্রিটিশ শক্তি আধুনিক ধাতু প্রযুক্তি দিয়ে তাকে টেনে নামিয়েছিল। মূলত পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপীয়দের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর দখল শুরু হয়েছিল। বহুল পরিমাণে প্রযুক্তির আবিস্কার ইউরোপীয়দের একচেটিয়া

আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এই আধিপত্যই ইউরোপীয়দের বিশেষতঃ ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই 'প্রযুক্তি' নামক হাতিয়ারই ব্যবহার করেছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। একথা অনস্বীকার্য যে ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতবর্ষকে অন্ধকারময়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সর্বোপরি নতুন কিছু গ্রহণে অনিচ্ছুক ও নিরুৎসাহী সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিভাত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন সংজ্ঞা নির্মিত হতে থাকে এবং এই মতবাদের সমর্থকরা প্রচার করতে থাকে ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতি এবং হিতসাধন একমাত্র ব্রিটিশদের দ্বারাই সম্ভব। শুধুমাত্র নিত্যনতুন অঞ্চল ও মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করাই নয়, সাম্রাজ্যবাদ তাদের কাছে ছিল একই সাথে সেখানকার মানুষ এবং ভূখণ্ড-কে বলপূর্বক উন্নত এবং আধুনিকীকরণে সামিল করার এক দাম্ভিক প্রচেষ্টাও। প্রাচ্যের উপনিবেশিক পরিমণ্ডলে এই জাতীয় ধ্যান-ধারণাকে বারবার শক্তিশালী ও পুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা।[১০] বণিকগোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভাব ঘটলেও অচিরেই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির কোন শিক্ষা না থাকায় ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় করায়। সাম্রাজ্যবিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিল। ক্রমশ এই বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে ভারতীয়রা নিজেদের মত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে থেকে।

ভারতের মধ্যে বাংলা-র ভূমিকা এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় এবং পশ্চিমের ঐতিহাসিকদের মতে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলার বিজ্ঞান চেতনার জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় এক আধুনিক

বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার সন্ধান করেছিল। এই শ্রেণীর মূল লক্ষ্যই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। ক্রমে 'বিজ্ঞান' বিষয় হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম চালু করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, ডঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রমুখ বিংশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞান সাধনায় নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন।[১১] তবে বিংশ শতকের গোড়া অবধি ব্রিটিশরা ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশেষত কারিগরী শিক্ষার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল। অধ্যাপক দীপক কুমার বিজ্ঞানকে সামাজিক কার্যকলাপ হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রশ্ন করেন শিল্প এবং বাণিজ্যের অনুপস্থিতিতে বিজ্ঞানের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি ভারতীয়দের বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হওয়ার এই সময়কালকে, বিশেষতঃ উনবিংশ শতকের শেষ ভাগকে 'The phase of colonial science' অর্থাৎ ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত করেন।[১২] ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, বাছাই করা মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর ভারতীয়দেরই উচ্চশিক্ষা দানের জন্য চিহ্নিত করেছিল। এর ফলস্বরূপ প্রযুক্তিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ার বা এরূপ কাজকর্মে ভারতীয়দের মধ্যেই অঘোষিত দুইটি শ্রেণী তৈরী হয়ে গিয়েছিল যথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত 'বাবু' ইঞ্জিনিয়ার এবং অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মিস্ত্রি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তথাকথিত পুঁথিগত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও এই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর 'মিস্ত্রী'রাও প্রযুক্তিবিদ্যায় ছাপ রেখে গিয়েছিল। এমন একজন ছিলেন টিটাগড় নিবাসী শ্রী গোলকচন্দ্র কর্মকার। তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম 'ইঞ্জিনিয়ার'। গোলকচন্দ্র কর্মকার, উইলিয়াম কেরির ছাপাখানায় ব্যবহৃত বিদেশী বাষ্পীয় ইঞ্জিনটি পর্যবেক্ষণ করে কোনরকম সাহায্য ছাড়াই দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার করে একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রস্তুত করেছিলেন। উইলিয়াম কেরির প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-হর্টিকালচারাল

সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে গোলকচন্দ্র তাঁর এই বাষ্পচালিত যন্ত্রটির প্রদর্শন করেছিলেন। এ ছাড়াও ১৮২৮ সালে ১৬ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে গোলকচন্দ্র তাঁর ইঞ্জিনটি দিয়ে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নামক এক নতুন শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রথম ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন শিবচন্দ্র নন্দি। তিনিই প্রথম টরেটক্কায় ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় বার্তা পাঠান। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য বার্তাপ্রেরকদের প্রশিক্ষনের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৩] উনবিংশ শতকের শেষের দশকে, বাংলায় দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তির ছাপ রেখেছিল। এই সংস্থা দেশীয় প্রযুক্তিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা ও বিভিন্ন রকমের বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী করে খ্যাতি লাভ করেছিল।

প্রযুক্তি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার মতই ভারতবর্ষে বিদ্যুতের আগমন ব্রিটিশদের হাত ধরে ঔপনিবেশিক সময়েই। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের প্রধান শহরগুলি, গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং বন্দরগুলির বিদ্যুতায়ন করেছিল। লন্ডনে বিদ্যুৎ আগমনের ১০ বছর এবং নিউ ইয়র্কের ১৭ বছর পর ভারতবর্ষে বিদ্যুতের আগমন ঘটে। ভারতবর্ষের বিদ্যুতায়নের সূচনালগ্নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এর সিদ্রাপং-এ গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র[১৪] এবং কলকাতার ইমামবাগ লেন-এ স্থাপিত হয়েছিল প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১০ই নভেম্বর ১৮৯৭ সালে দার্জিলিং পুরসভার উদ্যোগে সিদ্রাপং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ সমাপ্ত হয়েছিল এবং ১৭ই এপ্রিল ১৮৯৭ সালে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের উদ্যোগে কলকাতার ইমামবাগ লেনের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যাত্রা শুরু করেছিল।[১৫] ঔপনিবেশিক পর্বে, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই

কর্পোরেশান, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্ব লাভ করে। ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা ও দার্জিলিং ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন সেরকম গুরুত্ব লাভ করেনি বললেই চলে। একথা অনস্বীকার্য যে নগরায়নের প্রভাব কলকাতা অঞ্চলেই সবথেকে বেশী অনুভূত হয়েছিল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পগুলির মত বিদ্যুৎশিল্পেও মুনাফা লাভই ছিল প্রথম এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই এই অঞ্চলেই বিদ্যুতশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকারও এই ব্যবস্থাপনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল তাই আলাদা করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নজির পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর দেশগঠনের দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রনায়করা অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে শিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া শিল্পের উন্নয়ন বাস্তবিকভাবে সম্ভবপর নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে বিদ্যুতশিল্পের প্রসারে ব্রতী হলে স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের জোয়ার আসে। স্বাধীনোত্তর পর্বে ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। ক্রমে এই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সীমিত সম্পদ, রাজনৈতিক সমীকরণের মত বিভিন্ন চড়াই-উতরাই এর সম্মুখীন হয়েও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনকে অনুসরণ করে রাজ্যের বিদ্যুতশিল্পের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে এটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্যুতায়ন পশ্চিমবঙ্গের নগরায়নের পথকে সুগম করার মধ্যে দিয়ে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ধারণাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। একথা

অনস্বীকার্য যে বিদ্যুতের সহজলভ্যতা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই নয় সমগ্র দেশকেই এক ধাক্কায় অনেকটা অগ্রসর করেছিল।

সামগ্রিকভাবে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের এই পরিবর্তন ও তার ইতিহাস এবং তৎকালীন নাগরিক সমাজে বিদ্যুতায়নের বাস্তবিক গ্রহণযোগ্যতা এক বিশদ আলোচনার বিষয়বস্তু। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের আমলে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে স্বাধীন ভারতীয় সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের কাছে আজও অনেকাংশেই অজানা। তাই এই গবেষণা সন্ধর্ভে এই অজানা ইতিহাস অনুধাবনের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে যে একেবারেই আলোচনা হয়নি তা নয়, বেশ কিছু প্রবন্ধ ও বই এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতবর্ষের বিদ্যুতায়ন বা বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার নিয়ে বেশ প্রবন্ধ ও বই বর্তমান তাই আমি নিম্নোক্ত আলোচনাকে দুইভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে রেখেছি সেই সকল প্রবন্ধ ও বইগুলিকে যেগুলি ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা এবং দ্বিতীয় ভাগে রেখেছি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রবন্ধ ও বইগুলিকে। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের বিদ্যুতায়নের গতিপ্রকৃতির সাথে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের বিবর্তন কিন্তু একই সরলরেখায় অগ্রসর হয়নি। সুনিলা এস কালে তাঁর 'ইলেকট্রিফায়িং ইন্ডিয়াঃ রিজিওনাল পলিটিকাল ইকোনমিস অফ ডেভেলাপমেন্ট' গ্রন্থে ঔপনিবেশিক আমল থেকে একবিংশ শতক অবধি ভারতের মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুতের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে কেন্দ্র-রাজ্য রাজনৈতিক সমীকরণ ভারতে এক অসম বিদ্যুতায়নে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি বিদ্যুতায়নে আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। জ্যোতি কে পারেখ তাঁর 'এনার্জি সিস্টেমস অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট,

কন্সট্রেইন্টস, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অফ এনার্জি ফর ডেভেলাপিং রিজিয়ান্স’ গ্রন্থে কৃষিক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিদ্যুৎ বা শক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচলিত ও অপ্রচলিত উৎস নিয়েও আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। শ্রীনিবাস রাও এবং জন লুর্ডুস্বামী তাদের ‘কলোনিয়ালিসম অ্যান্ড দি ডেভেলাপমেন্ট অফ ইলেকট্রিসিটিঃ দি কেস অফ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, ১৯০০-৪৭’ গ্রন্থে ঔপনিবেশিক আমলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের মতে বিদ্যুতশিল্পের উন্নতির মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য শিল্পগুলির উন্নয়ন হয়েছিল যা আদতে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করেছিল। রাজেন্দ্র কুমার পাচৌরি তাঁর ‘এনার্জি পলিসি ফর ইন্ডিয়াঃ অ্যান ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যানালিসিস’ গ্রন্থে ভারতের বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। থমাস বি. স্মিথ তাঁর লেখা 'ইন্ডিয়া'স ইলেকট্রিক পাওয়ার ক্রাইসিস, হোয়াই ডু দি লাইটস গো আউট' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনোত্তর পর্বের বৈদ্যুতিক পরিকল্পনার খামতি ও বিদ্যুতের ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কে ভি কারান্থ তাঁর ‘প্ল্যানিং ইন্ডিয়াস ইলেকট্রিফিকেশান’ নামক পুস্তিকাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নির্মলা ব্যানার্জি তাঁর ‘ডিমান্ড ফর ইলেক্ট্রিসিটি’ গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও ক্ষেত্রর বিদ্যুতের চাহিদা নিয়ে নিজের সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। তিনি একই সঙ্গে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশানর কার্যক্রম নিয়েও এই বইতে আলাদা ভাবে আলোচনা করেছেন। শর্মিলা বসু তাঁর ‘মানি, এনার্জি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার, দি স্টেট অ্যান্ড দি হাউসহোল্ড ইন ইন্ডিয়া’স রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন পলিসি’ গ্রন্থে ভারতের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের নীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে তিনি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সিদ্ধার্থ চন্দ্র মুখার্জি তাঁর ‘স্টেপ্স অফ পাওয়ারঃ নোটস অন দি হিস্ট্রি অফ ইলেকট্রিফিকেশান ইন ইন্ডিয়া (১৮৮৩-১৯৩০)’ প্রবন্ধে

ঔপনিবেশিক ভারতে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর পি ভগত তাঁর ‘রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট’ গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ ভারতের বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার ও চরিত্র উন্মোচনে অত্যন্ত সহায়ক। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্প নিয়েও বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বর্তমান। অমিতাভ রায় তাঁর ‘বাংলার বিদ্যুৎ-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন’ নামক বইটিতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশক অবধি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতায়নের সামগ্রিক বিস্তারকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিদ্যুৎ বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ ও বই এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। সুকান্ত চৌধুরী সম্পাদিত 'ক্যালকাটা দি লিভিং সিটি' গ্রন্থে (প্রথম পর্ব) শ্রী পি. থাঙ্কাপ্পান নায়ার তাঁর ‘সিভিক অ্যান্ড পাবলিক সার্ভিসেস ইন ওল্ড ক্যালকাটা' শীর্ষক প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক কলকাতার পথবাতি নিয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি তেলের বাতির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক কলকাতার রাস্তা আলোকিতকরণের প্রচেষ্টা এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে রাস্তা আলোকিতকরণের কাজে প্রথমে গ্যাস এবং পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রী সিদ্ধার্থ ঘোষ তার 'কলের শহর কলকাতা' বইটিতে কলকাতায় বিদ্যুৎ আগমনের প্রাথমিক পর্যায়কে তুলে ধরেছিলেন এবং এর পাশাপাশি বৈদ্যুতিকশিল্পের সাথে যুক্ত দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছেন। সুকান্ত চৌধুরী সম্পাদিত 'ক্যালকাটা দি লিভিং সিটি' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে শ্রী গৌতম গুপ্ত 'ক্যালকাটা'স পাওয়ার সাপ্লাই' নামক প্রবন্ধে কলকাতার বিদ্যুতায়ন এবং তার সাথে বিংশ শতকের আশির দশকে হওয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিখিল সুর তাঁর 'কলকাতার নগরায়ণ: রূপান্তরের রূপরেখা (১৮০৩-১৮৭৬)' গ্রন্থে কলকাতার নগরায়ণ এবং কলকাতার রাজপথের রাত্রিকালীন আলোকসজ্জা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাংবাদিক গৌতম গুপ্ত বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির বিদ্যুতশিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে এক সমীক্ষা করেন এবং এই সমীক্ষার ফলাফল 'ইলেকট্রিসিটি; ক্যালকাটা ভার্সেস ওয়েস্টবেঙ্গল' নামক এক পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও তার সাথে সেই সময়ে হওয়া বিদ্যুতের ঘাটতির সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনিমেষ চ্যাটার্জি তাঁর "'নিউ ওয়াইন ইন নিউ বটলস'; ক্লাস পলিটিক্স অ্যান্ড দি 'আনইভেন ইলেকট্রিফিকেশান' অফ কলোনিয়াল ইন্ডিয়া" প্রবন্ধে শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের বাধা ও গৃহস্থবাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবহার ও তার সামাজিক অভিঘাত নিয়ে আলোচনা করেছেন। এলিজাবেথ চ্যাটার্জি তাঁর 'দি পলিটিক্স অফ ইলেকট্রিসিটি রিফর্মঃ এভিডেন্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া' নামক প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে বিদ্যুতশিল্পের সংস্কারে রাজ্য রাজনীতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক শুভব্রত সরকার তার বই 'লেট দেয়ার বি লাইটঃ ইঞ্জিনিয়ারিং, এন্ট্রাপ্রেনিয়রশিপ অ্যান্ড ইলেক্ট্রিসিটি ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল'-তে ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পোদ্যোগ ও বিদ্যুতায়নের সামাজিক অভিঘাত নিয়ে। তাঁর গবেষণা নিবন্ধ 'ডোমেস্টিকেটিং ইলেকট্রিক পাওয়ার: গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রি, ইউটিলিটিস অ্যান্ড রিসার্চ ইন কলোনিয়াল ক্যালকাটা'-তে ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতার বিদ্যুতায়ন এবং বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন এবং তাঁর অপর আরেকটি লেখা 'দি ইলেক্ট্রিফিকেশন অফ কলোনিয়াল ক্যালকাটা, রোল অফ ইনভেস্টার্স বিউরোক্র্যাটস অ্যান্ড ফরেন বিজনেস অর্গানাইজেশন; ১৮৮০-১৯৪০' প্রবন্ধে বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে বিনোয়োগকারী ও আমলাদের ভূমিকা ও প্রশাসনিক বিষয়গুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচ্য সকল গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বিদ্যুতশিল্পের বিবর্তন ও বিস্তার সম্পর্কে ধারণা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এইগুলির মধ্যেও বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলির উত্তর নিয়ে তেমন বিশেষ আলোচনা হয়নি। বিদ্যুতের আবিষ্কার ও ভারতবর্ষে বিদ্যুতের আগমন এবং ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার এবং স্বাধীনোত্তর পর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিবর্তনের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লেখা প্রয়োজন। বিদ্যুতশিল্পের কর্মী ও সমকালীন রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা একেবারেই অপ্রতুল। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন ও সেই সংক্রান্ত কাজে অচিরাচরিত শক্তির ভূমিকা নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। আবার বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারের যে এক সামাজিক প্রভাব রয়েছে তা কিন্তু আজও আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে। শিক্ষা, রাজনীতি বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিদ্যুতের থাকা বা না থাকার কি প্রভাব সেইসকল বিষয়ে কোন আলোচনাই সেইভাবে হয়নি। বিদ্যুতায়নের প্রভাবে ‘আলোকিত’ ও ‘অনালোকিত’, অলিখিত যে দুধরনের নাগরিক জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল সেই নিয়ে আলোচনাও অপ্রতুল। সর্বোপরি পরিবেশের উপর বিদ্যুতায়নের প্রভাব কিংবা গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিচারে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা নিয়েও আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। তাই এই গবেষণা সন্ধর্ভে পূর্বোক্ত অজানা ইতিহাস অনুধাবনের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলিকে ৫টি অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হল ভূমিকার এই পর্বে। উপরোক্ত আলোচনার প্রসঙ্গে আমি নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নকে সামনে রেখে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। প্রথমত ‘বিদ্যুৎ’-এর আবিষ্কার থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তা জনসাধারনের ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠার যে ইতিহাস এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বিদ্যুতের আগমনের প্রেক্ষাপট কেমন ছিল? স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের ধারাবাহিক বিস্তার এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ভূমিকা কেমন ছিল? বিদ্যুতশিল্পের অন্যতম অঙ্গ ছিল

শ্রমিকরা। তাদের অবস্থান ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কেমন ছিল তাও বিস্তারিত গবেষণার দাবী রাখে। ভারতবর্ষের মত গ্রামীণ অঞ্চলপূর্ণ দেশে গ্রাম-নগরের অর্থনৈতিক ব্যবধান দূরীকরণে বিদ্যুতের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ছিল না, তবে সামগ্রিক দেশের তুলনায় এরাজ্য গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার ছিল তুলনামূলক কম। এর অন্যতম কারণ কি ছিল বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ভূমিকা কি ছিল? আবার বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আধুনিকতার যে সংজ্ঞা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল বিদ্যুৎ শক্তি। শিক্ষা, রাজনীতি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বা বলা ভালো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের যে প্রভাব আছে তা কিরূপ? পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন লোডশেডিং এর সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এই লোডশেডিং কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল? সর্বোপরি পরিবেশের উপর বিদ্যুতের কি প্রভাব ছিল তাও এই গবেষণা সন্ধর্ভের আলোচ্য বিষয়। এই সন্ধর্ভের মধ্যে দিয়ে পূর্বোক্ত অজানা ইতিহাস অনুধাবনের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলিকে পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে, ভূমিকার পর্বে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'বিদ্যুৎ শক্তির বিবর্তন ও ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারঃ প্রাক্কথন'। যেকোনো আলোচনার আগেই এক সঠিক পটভূমিকা প্রয়োজন বিশেষ করে বিদ্যুতের মত এক অতি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা যা কালের নিয়মে পণ্যে পরিণত হয় তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তা একদম শুরুর থেকে হওয়াই শ্রেয়। তাই একদম সূচনা লগ্ন থেকে 'বিদ্যুৎ' শক্তির আবিষ্কার, তা নিয়ে ইউরোপীয়দের বিভিন্ন গবেষণা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ইতিহাসকে এই অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

শিক্ষার সুযোগ এবং তার সাথে দেশীয় প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উল্লেখ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার এবং বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ভূমিকা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার'। এই অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথম বিদ্যুৎ আইনের প্রবর্তন এবং সেই আইনানুসারে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের জন্য ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিদ্যুতশিল্পের উত্থান সহজ ছিল না। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অন্যদিকে রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু শিল্পক্ষেত্র; এর সাথে ছিল সরকারি সংস্থা হওয়ার দরুণ কাজে গতিময়তার অভাব এবং সর্বোপরি রাজ্য-কেন্দ্র রাজনৈতিক সমীকরণের কঠিন অঙ্ক। এই সব বাধা অতিক্রম করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের লক্ষ্য ছিল কলকাতা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এই অধ্যায়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিস্তার এবং পাশাপাশি বিদ্যুতশিল্পের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিদ্যুতশিল্প ও শ্রমিকঃ প্রেক্ষাপট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ'। এই অধ্যায়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূচনালগ্নে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রায় ৯০% অস্থায়ী কর্মী ছিল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কর্মীদের সংগঠিত হওয়া এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রবেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে একাধিক আন্দোলন এবং

সেই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। একদিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং অন্যদিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক আনীত অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের শ্রমিকদেরকে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এই শ্রমিকরা কিভাবে রাজ্য রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল এবং বিভিন্ন সরকারি নীতি নির্ধারণে শ্রমিকদের ভূমিকা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও অচিরাচরিত শক্তির আগমন'। এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সরকারি নিয়মানুযায়ী গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সংজ্ঞা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ভূমিকা বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায়, পশ্চিমবঙ্গ, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের নিরিখে কিছুটা পিছিয়ে ছিল। এই পিছিয়ে থাকার পিছনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ভূমিকা এবং কৃষিক্ষেত্রের সাথে বিদ্যুতায়নের কিরূপ সম্পর্ক সেই নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের ভূমিকা এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য নিয়ে আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলের বিদ্যুতায়নের জন্য অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগ এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে শহরাঞ্চলের ভূমিকা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। প্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির প্রয়োজনীয়তাও এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'সমাজ ও পরিবেশঃ প্রসঙ্গ বিদ্যুৎ'। বিদ্যুতের ব্যবহার নাগরিক জীবনকে এক ধাক্কায় অনেকটা উন্নীত করে দিয়েছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যুতায়নের প্রভাবে 'আলোকিত' ও 'অনালোকিত', যে অলিখিত দুধরনের নাগরিক জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিদ্যুতশিল্পের ভূমিকা সদর্থক ছিল কিনা এবং বিদ্যুতায়নের সামাজিক প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে যে পরিবর্তন এনেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুতায়নের কি প্রভাব অর্থাৎ গণপরিবহণ থেকে শুরু করে চিকিৎসাব্যবস্থা কিংবা শহর ও গ্রামের মধ্যেকার দুরত্ব হ্রাসে বিদ্যুৎ সহায়ক হয়ে উঠেছিল কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি খেলাধুলা, শিক্ষা, নাগরিক জীবন, বিনোদন তথা দাম্পত্যে বিদ্যুৎ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। একই সঙ্গে বিদ্যুত শক্তি এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর তার কিরূপ প্রভাব পড়েছিল তা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল এবং বাস্তুতন্ত্রে তার বিরূপ প্রভাব কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র বিশ্বকে এক কঠিন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাছে তা এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

আলোচ্য গবেষণা করতে গিয়ে প্রাথমিক ও সহায়ক উভয় উপাদান এবং ব্যবহারিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই তা সম্পন্ন করতে হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে ইংরেজি শব্দগুলি বাংলা হরফে লেখার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণা সন্দর্ভে আমি বানানের ক্ষেত্রে আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করেছি। গবেষণার প্রয়োজনে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় সহকারী উপাদান সংগ্রহ করেছি। একই সঙ্গে সহকারী উপাদান চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদনের উপরও কাজ করেছি। প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে আমি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নথি দেখেছি। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট যেমন সিলেক্ট কমিটি, পাওয়ার ইকোনমি কমিটি প্রভৃতি এবং বিভিন্ন দপ্তর যেমন আইন মন্ত্রক, বাণিজ্য এবং শিল্প, বাণিজ্য

এবং শ্রম, বাণিজ্য মন্ত্রক প্রভৃতির নথি দেখেছি। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেই কিছু পুরাতন খবরের কাগজ যেমন দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, দি গার্ডিয়ান, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর প্রভৃতি আমার বিশেষ কাজে লেগেছে। কলকাতার টাউন হল গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত মিউনিসিপাল গেজেট থেকে আমার গবেষণা সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুরাতন কিছু পত্রিকা আমি দেখেছি যেমন- বিজলী, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি। এর পাশাপাশি আমি দি ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ ও আরও বেশ কিছু বিদ্যুতশিল্প সংক্রান্ত পুরাতন খবরের কাগজ এবং পত্রিকাও দেখেছি। আমাদের রাজ্য মহাফেজখানাতে কিছু দিন কাজ করলেও সেখানে প্রাপ্ত দলিলগুলি আমার গবেষণার সময়কাল ও আঙ্গিকের সাথে সেভাবে সম্পর্কিত নয়। জাতীয় মহাফেজখানার থেকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের যেমন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রী দপ্তর (পি এম ও), পরিকল্পনা বিভাগ প্রভৃতির নথি আমি দেখেছি এবং আমার গবেষণায় সেগুলির উল্লেখ করেছি। নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি আমি দেখেছি যেমন- অশোক মিত্র পেপার, জয় প্রকাশ নারায়ণ পেপার প্রভৃতি। এছাড়াও এখান থেকে বিদ্যুৎ মন্ত্রক, পরিকল্পনা কমিশন, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি আমি দেখেছি। এছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পনি লিমিটেড এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনর অফিস থেকে প্রাপ্ত নানান তথ্য ও মৌখিক আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপরোক্ত গবেষণার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১. Bryan Bunch with Alexander Hellemans, The History of Science and Technology, (New York: Houghton Mifflin Company, 2004), P-215.

২. Ibid, P-222.

৩. Massimo Guarnieri, "Electricity in the Age of Enlightenment [Historical]", Industrial Electronics Magazine, IEEE 8(3), 19th September 2014, P-61.

৪. Ian Macneil Ed., An encyclopaedia of the History of Technology, (London and New York: Routledge, 1990), P-357.

৫. দীপন ভট্টাচার্য, "বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাস", নেওয়া হয়েছে 'যুবমানস,' সৌমিত্র লাহিড়ী সম্পাদিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংখ্যা, যুববকল্যাণ অধিকার, (মে-জুন ২০০০, কলকাতা): পৃ-১১১।

৬. J. D. Bernal, Science in History, Vol-I (New York: Cameron Associates, 1954), P-443.

৭. Macneil, An encyclopaedia of the History of Technology, P-358-65.

৮. Ibid, P-367-70.

৯. K. V. Gopalakrishnan, Inventors who revolutionised our lives (New Delhi: National Book Trust, 1999), Pp.87-92.

১০. শুভঙ্কর দে, "বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও পরিবেশের ইতিহাসঃ বিকল্প ভাবনা," নেওয়া হয়েছে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস ভবিষ্যতের সন্ধান; অতিমারি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশ,' প্রথম খণ্ড শুভঙ্কর দে সম্পাদিত (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,২০২০), পৃ-১০।

১১. Nupur Dasgupta, “A Scientist in the world of Indology; Initiation of the New Chapter on Pre Modern History of Science in India,” In ‘Essays in History of Science and Technology and Medicine’ edited by Nupur Dasgupta and Amit Bhattacharyya (Kolkata: Setu Prakashani, 2014), P-2.

১২. Deepak Kumar, “Patterns of Colonial Science in India,” IJHS, 15 (1), (May, 1980): Pp-105-6.

১৩. ‘ইঞ্জিনিয়ার’ শব্দটির উৎপত্তি জেমস ওয়াটের পরবর্তী সময়ে এবং আক্ষরিক অর্থ হল বাষ্পীয় কল প্রস্তুতকারক। বিস্তারিত- Amitabha Ghosh, “Some Eminent Indian Pioneers in the field of Technology,” Indian Journal of History of Science, Vol-29, No.1 (1994): Pp.63-75.

১৪. West Bengal State Electricity Board, “Sidrapong; Heritage Power Station,” Centenary Booklet, Corporate Public Relations Department-WBSESB, Kolkata (10th November, 1997): P-3.

১৫. Calcutta Electric Supply Corporation (India) Limited, “Story of Electricity in the city of Calcutta,” A 48 page profusely illustrated brochure, Kolkata, (December, 1989): P-5.

বিদ্যুৎ শক্তির বিবর্তন ও ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারঃ প্রাক্‌কথন

অরণ্য ও গুহাবাসী মানুষের কাছে আগুন ছিল সৃষ্টির সব থেকে বড় আশীর্বাদ। প্রথম দিকে আগুনকে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করলেও মানুষ যত বিবর্তনের পথে এগিয়েছে, তার দ্বারা আগুনের ব্যবহারেরও তারতম্য দেখা গিয়েছে। এই বিবর্তনের সঙ্গে মানুষ ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছে সমাজ যা পরিণতি পেয়েছে আধুনিক সভ্যতায়। ক্রমে আলোকিতকরণের জন্য আগুনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় শতকে প্রাচীন মিশরে, পাতলা কাপড়ের টুকরো পাকিয়ে সেটিকে উচ্চতাপে গলিত পশুর চর্বির মধ্যে ডুবিয়ে এক ধরণের লম্বা বাতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সপ্তদশ শতকে আবির্ভাব হয় 'মোমবাতি'র, যা অচিরেই ঘর আলোকিতকরণের মূল সরঞ্জাম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথেই এই 'আলো'-র উৎস বদলাতে থাকে, পশুচর্বি থেকে শুরু করে মোমবাতি এবং সেখান থেকে আসে গ্যাস এর মাধমে আলোর ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে এর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'বিদ্যুৎ' বা 'ইলেক্ট্রিসিটি'।

'ইলেক্ট্রিসিটি' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম গিলবার্ট । গ্রীক ভাষায় অ্যাম্বারকে বলা হয় 'ইলেকট্রন'। দেড়শ বছর আগেও বিদ্যুৎশক্তি ছাড়াই সব কাজ করতে হত; কারণ তখন বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ তৈরি করা ছিল দুরূহ ও ব্যয়বহুল। একথা বলাই বাহুল্য বিদ্যুতের অস্তিত্বের কথা বহুকাল আগে থেকেই জানা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে এক গ্রীক দার্শনিক আবিষ্কার করেন যে, তৈল স্ফটিককে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘর্ষণ করলে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। উইলিয়াম গিলবার্ট ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক বিষয়টির সত্য উৎঘাটনের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে অ্যাম্বার ছাড়াও, গন্ধক, কাঁচ বা গালা

জাতীয় জিনিসকে সিল্ক বা রেশম, ফ্লানেল বা পশুলোম দিয়ে ঘর্ষণ করলে এরা কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সেই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়।[১] এই সকল গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন মূলতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা। বলা যায় আধুনিক পৃথিবীতে প্রযুক্তিকে কুক্ষিগত করার প্রয়াস ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রযুক্তির জ্ঞান বা প্রযুক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টার পিছনে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ থেকে ধনসম্পদ আহরণ করা এবং নিজ নিজ দেশে সেই সম্পদকে কার্যকরী করার এক সমবেত প্রয়াস ছিল। ড্যানিয়েল আর হেডরিক দেখিয়েছেন যে কিভাবে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি, বৃহৎ আঙ্গিকে, নিজেদের কুক্ষিগত করা প্রযুক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। তাঁর মতে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল শিল্পপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও তার বিস্তার। ইউরোপীয় কর্তৃক আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মানুষদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে তিনি প্রযুক্তিগত আধিপত্যকেই চিহ্নিত করেন। তিনি আরও বলেন যে প্রযুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক বুঝতে গেলে তা উভয়দিক থেকেই দেখতে হবে। ইউরোপীয়দের, ওষুধ ও সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞানের উপর আধিপত্য এবং ইস্পাত ও আগ্নেয়াস্ত্রের উপর একচেটিয়া দখল, তাদের আফ্রিকা বিজয়ের কাজকে স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে সম্ভবপর করে তুলেছিল। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত আধিপত্য ইউরোপীয়দের উপনিবেশ গঠনের চিরাচরিত ধারায় বিবর্তন এনে দিয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলি বা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিজেদের স্থানীয় প্রযুক্তি বা ইস্পাতের ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠেছিল যা প্রথম বিশ্বের দেশগুলির কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২] ঐতিহাসিক সৎপাল সাঙ্গওয়ান এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, প্রযুক্তি, মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম নির্ণায়ক উপাদান। তিনিও এই বিষয়ে একমত যে প্রযুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম উপাদান এবং ইউরোপীয়দের প্রযুক্তিগত আধিপত্যই

তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সহযোগিতা করেছিল। তিনি বলেন যে বেশীরভাগ ঐতিহাসিকই এই উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে 'প্রযুক্তি'র প্রভাবকে গৌণ করে দেখিয়েছেন।[৩] দীপক কুমার দেখিয়েছেন যে কিভাবে বিজ্ঞান, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিকাশকে প্রতিপালিত করেছে। তিনি বলেন যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ভারতবর্ষে প্রগতির এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প গৃহীত হয়, পাশাপাশি গঠিত হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রেলপথ এবং বৈজ্ঞানিক সার্ভে বা সমীক্ষা। দীপক কুমার ঔপনিবেশিক বৈজ্ঞানিকদের বিষয়ে বলেন যে, তাদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং বিজ্ঞান উভয়কেই পরিচর্যা করতে হত। ঔপনিবেশিক আমলে হওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান, আবহবিদ্যা, ঔষধ থেকে শুরু করে যেকোন প্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নয়নই, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক মুনাফার স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য ছিল বলে তিনি মনে করেন। তার মতে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা করেছিল, যার মূলমন্ত্রই ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। ভারতে ব্রিটিশরা যে সকল বিজ্ঞানচর্চা বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল তা মূলতঃ তাদের অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য বলে তিনি দাবী করেন।[৪] মাইকেল এ্যাডাস, ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গে বলেন যে বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পবিপ্লব কিভাবে ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের পরিবর্তন ঘটায়। তিনি বলেন যে ইউরোপীয়দের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকানদের নিয়ে ঘৃণ্য মনোভাব ছিল। এই মনোভাব এই অঞ্চলের উপনিবেশে বসবাসকারী মানুষদের বিজ্ঞানচর্চা বা প্রযুক্তির আলো থেকে দূরে রাখতে যথেষ্ট ছিল বলেই তিনি মনে করেন। তিনি ইউরোপীয়দের সমালোচনা করে বলেন যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ইউরোপীয়দের মনে এক শ্রেষ্ঠত্বের বীজ বপন করেছিল। ঊনবিংশ শতকে শুরু হওয়া লোহা বা ইস্পাতের ব্যবহার, বাষ্পশক্তি, টেলিগ্রাফ দূরলিখ এবং বিদ্যুতের আবিষ্কার ইউরোপীয়দের এই ধারণাকেই আরো সুদৃঢ় করে তোলে বলে তিনি

মনে করেন। তিনি আরো বলেন যে, ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলিতে স্থান সংক্রান্ত নিয়মনিষ্ঠা বা ধারাবাহিকতা এবং স্বাস্থ্যবিধি-র উন্নতির জন্য নগর পরিকল্পনার কাজে হাত দেয় এবং এরূপ যেকোন কাজকেই তিনি ইউরোপীয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিচ্ছুরণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। একইসাথে তিনি ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫] একইভাবে ইয়ান ম্যাকনেল তার লেখায় দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে পিছনের সারিতে রাখা হলেও একটি দেশের সম্রাট বা রাষ্ট্রনায়কের শক্তি তার দেশীয় প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন যে আমাদের চারপাশের যে কোন জিনিসই হয় প্রকৃতির ফসল বা মানুষের তৈরী এবং মানুষের তৈরী যে কোন ধরনের জিনিসই মানুষ তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তুত করেছে। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তফাৎ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, বিজ্ঞান হল এই মহাজগৎকে চালনাকারী বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কিত জ্ঞান এবং প্রযুক্তি হল বিজ্ঞান থেকে উপলব্ধ জ্ঞানকে কিভাবে উপযোগবাদী প্রয়োজনে, যান্ত্রিক আঙ্গিকে পুনঃনির্মান করার প্রক্রিয়া। এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে তিনি দেখান দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যিনি দেখছেন তিনি হলেন 'বিজ্ঞানী' এবং যিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র বানিয়েছেন তিনি হলেন 'প্রযুক্তিবিদ' এবং এই ক্ষেত্রে গ্যালিলিওকে তিনি 'বিজ্ঞানী' এবং 'প্রযুক্তিবিদ' হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে ঊনবিংশ শতকে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন, ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহারের উন্নতি ইউরোপীয়দের জলপথে দূর দূরান্তে যাত্রার অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এর পাশাপাশি ঔষধ ও আগ্নেয়াস্ত্র এই আগ্রাসনের পিছনে

অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। শিল্পবিপ্লব এই সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো বিস্তারের প্রয়োজনীয় নিত্যনতুন প্রযুক্তির যোগান দিয়েছিল বললে ভুল হবে না। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি বা যে কোন জিনিসের পিছনেই বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম কিন্তু তা সমানভাবে অনালোচিত। বিদ্যুতের ভূমিকা নিয়ে কারোর মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকলেও এই বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা তুলনামূলক অনেক কম, বর্তমানে ব্যবহৃত 'বিদ্যুৎ' হল 'শক্তি'-র এক বহু বিবর্তিত এবং উন্নত রূপ। বাষ্পীয় শক্তি এবং স্থির তড়িতের আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদের ঊনবিংশ শতকে প্রথম আবিষ্কৃত বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার এবং তার দ্বারা চালিত স্টীম ইঞ্জিন মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভব মানুষকে প্রযুক্তির উন্নতি করতে সাহায্য করেছে বললে ভুল হবে না। শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্যুতের দ্বারা চালিত বাল্ব (মূলতঃ যা আলোকিতকরণের কাজে ব্যবহৃত হত) শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছিল। আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যালেসান্দ্রো ভোল্টা কর্তৃক কেমিক্যাল ব্যাটারী, যা কৃত্রিম শক্তির অন্যতম উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভবত বিদ্যুতের ব্যবহারের প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে শহরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক ট্রামের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। আবার ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষ দিকে বা বিংশ শতকের গোড়ায় খনিগুলিতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক বাতি, খননের কাজকে অনেক সুরক্ষিত ও সহজ করে তোলে। অর্থাৎ খুব সহজেই বলা যায় যে প্রযুক্তি বা বৈদ্যুতিকশক্তি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। প্রাথমিক ভাবে বিদ্যুৎ বা শক্তির ব্যবহার নতুন প্রযুক্তির উন্মোচন ঘটাতে সাহায্য করে, যার ফলস্বরূপ বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিগুলিতে বিদ্যুতের বহুল ব্যবহার উৎপাদনরীতির প্রথাগত ধ্যানধারনা বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যুৎ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক চর্চাকারী উইলিয়াম গিলবার্ট তাঁর 'দে ম্যাগনেটে' নামক গ্রন্থে প্রথম স্থির তড়িৎ ও চৌম্বকত্ব নিয়ে মতামত দেন ও এদের মধ্যে পৃথকীকরণ করেন। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে বৈদ্যুতিক পরিবাহী এবং অপরিবাহী, স্থির তড়িতের ২টি প্রকার, যথা- ধনাত্মক বা পজিটিভ এবং ঋনাত্মক বা নেগেটিভ, উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য লিডেন জার আবিষ্কৃত হয়।[৭] অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মূলতঃ ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়। এরিক হবসবম, শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্যায় হিসাবে ১৭৮০ থেকে ১৮১৫-র সময়কালকে দেখিয়েছিলেন।[৮] বাষ্পশক্তির ব্যবহার শিল্প বিপ্লবের অন্যতম অনুঘটক ছিল। জেমস ওয়াট কর্তৃক আবিষ্কৃত স্টীম ইঞ্জিন প্রযুক্তির ইতিহাসের অন্যতম সেরা সংযোজন এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পে এই বিপ্লবের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। এই সময়কালে শিল্পের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ যেমন- চার্লস ফেইনস্টেন, রবার্ট লুকাস (জুনিয়র) প্রমুখদের মতে শিল্পবিপ্লব সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদিও অন্য ঐতিহাসিকদের মতে এই 'বৃদ্ধি' ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পূর্বে সুনির্দিষ্ট ছিল না। তবে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় গ্যাস লাইটের আগমন এই বিপ্লবকে সফল করে তোলার অন্যতম উপাদান। এর আগেও গ্যাসের বাতি নিয়ে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হলেও বৃহৎ আঙ্গিকে প্রথম ব্যবহার এই সময়েই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও তার পুত্র আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে একটি ঘুড়ি নিয়ে বাজ ও বৈদ্যুতিক শক্তির পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বাজ-এর মধ্যে নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পর্কে এবং বজ্র ও পরীক্ষাগারে উৎপাদিত বিদ্যুতের স্বরূপ যে একই সেই বিষয়ে নিশ্চিত হন।[৯] যদিও পরবর্তীকালে টম টাকার এই পরীক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি ফ্র্যাঙ্কলিন কর্তৃক বর্নিত ঘুড়ির ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ

করেন। অপরদিকে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ইউলিয়াম মার্ডক ম্যাঞ্চেস্টারের ফিলিপস এবং লি বাটন মিল-কে গ্যাসের আলোর দ্বারা আলোকিত করেছিলেন। প্রাথমিক ভাবে এই উদ্যোগ ৫০টি বাতি দিয়ে শুরু হলেও অচিরেই তা ৯০৪টি বাতিতে পৌছাঁয়।

মার্ডক বৃহৎ আঙ্গিকে এই কাজ শুরু করলেও তিনি বুল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। বুল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানি এই যুগান্তকারী কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারার ফলে নতুন কোন প্রযুক্তি এই ব্যবস্থাকে আর উন্নত করতে পারেনি এবং অবশেষে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের গ্যাস লাইটিং-এর ব্যবস্থাটিকে বন্ধ করে দেয়। অপরদিকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে স্যার হামফ্রে ডেভি প্রথম উচ্চচাপযুক্ত কার্বন বাতি আবিষ্কার করেন। যদিও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের যোগানের অভাবে এই বাতির বৃহৎ আঙ্গিকে ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভবপর হয়নি। ২৯শে অক্টোবর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে, স্যার মাইকেল ফ্যারাডে চৌম্বকীয় দন্ডের চারপাশে তামার চাকতির তার জড়িয়ে গ্যালভানোমিটার দিয়ে দেখান যে চাকতির অক্ষ ও প্রান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।[১০] ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের যন্ত্রপ্রস্তুতকারক হিপ্পোলাইট পিক্সি একটি চৌম্বকীয় বৈদ্যুতিক উৎপাদকযন্ত্র তৈরি করেন। তিনি দেখান যে এই যন্ত্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ একমুখী। তিনি দাবী করেন যে পদার্থবিদরা, গবেষণাগারে তাদের যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যেসব কাজে ব্যবহার করেন, তার উৎপাদিত বিদ্যুৎ-ও সেই সকল কাজের জন্য যোগ্য। এই ধরনের যন্ত্র প্রথম ব্যবহৃত হয় তার বার্তা বা টেলিগ্রাফ পাঠানোর ক্ষেত্রে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুকি এবং হুইটস্টোন প্রথম ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] ডেভি কর্তৃক আবিষ্কৃত 'বাতি' যুগান্তকারী ঘটনা হলেও এই বাতিতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল, যা উইলিয়াম পেট্রি ও উইলিয়াম স্টেইটি সংশোধন করেন এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সংশোধিত বাতি-র আত্মপ্রকাশ ঘটে। উন্নত প্রযুক্তির এই বাতি লন্ডনের জাতীয় শিল্প যাদুঘরে

আলোকিতকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি দে আই এলিয়েন্স নামক প্রথম ইঙ্গ-ফরাসী বৈদ্যুতিক প্রজ্জ্বলন কোম্পানি গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ট্রিনিটি হাউসের অনুরোধে মাইকেল ফ্যারাডের পরিদর্শনে ব্ল্যাকওয়েল-এ বৈদ্যুতিক আর্ক বাতির প্রদর্শন হয়। এই বাতির প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করেছিল এফ.এইচ.হোল্মস কর্তৃক প্রস্তুত একটি ২ টনের চৌম্বকাধার যুক্ত যন্ত্র। বৃহৎ আঙ্গিকে ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের প্রস্তুতকারক ছিলেন প্যারিসে কর্মরত বেলজিয়ান ইঞ্জিনিয়ার জেড.টি.গ্র্যামী। অপরদিকে প্রথম ব্রিটিশ বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র প্রস্তুতকারক ছিলেন আর.ই.বি.ক্রম্পটন। তিনি সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ার এমিলে বার্গিন–এর প্রস্তুত করা নকশা দিয়েই তাঁর প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনযন্ত্র তৈরী করেছিলেন। বার্গিন, গ্র্যামির তৈরী যন্ত্রেরই উন্নতিসাধন করেন।[১২] রাশিয়ান টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার পাভেল ইয়ারলোচকভ উচ্চচাপযুক্ত কার্বন বাতির আরো এক উন্নত সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি এই বাতিতে গ্র্যামি জেনারেটার ব্যবহার করেছিলেন এবং এই বাতিতে পূর্বের বাতিগুলির ন্যায় কোন যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন ছিল না। প্যারিসে শহরে প্রথম এই বাতি প্রদর্শিত হয়েছিল। বৈদ্যুতিক আর্ক বাতির ব্যবহার বা ধারণা বহু পুরাতন হলেও সঠিক বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের ব্যবহার ১৮৭০-র দশকে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহারে দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। ১৮৮০-র দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের নক্সা প্রস্তুত করা মৌলিকস্তর থেকে ক্রমশই বিজ্ঞান শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলতঃ বড় বড় বাজার এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে আর্ক বাতিগুলি আলোকিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে প্রায় ৭০০টি আর্ক বাতি পথবাতি হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং প্রায় সমসংখ্যক বাতিই গৃহস্থ বাড়িতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছিল।[১৩] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের জোসেফ সোয়ান এবং ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার থমাস এডিসন, প্রথম ব্যবহারের উপযোগী ভাস্বরবাতী আনেন। সোয়ানের লোফেল-এর বাড়িটি পৃথিবীর প্রথম বাড়ি যেখানে কার্যকারী বাল্ব

ব্যবহৃত হয়। নিউ ক্যাসেল-এর ‘দি লিট এন্ড ফিল লাইব্রেরী’ প্রথম সর্বজনীন ঘর (প্রকোষ্ঠ), বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা যেটি আলোকিত করা হয়েছিল। এই লাইব্রেরীর লেকচার থিয়েটারে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে স্যার জোসেফ সোয়ানের বক্তৃতার সময় বৈদ্যুতিক বাতি-দ্বারা আলোকিত করা হয়। লন্ডনের সেভয় থিয়েটার প্রথম সার্বজনীন ভবন যেটিকে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে আলোকিত করা হয়।[১৪] ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্রথম আর্ন্তজাতিক বৈদ্যুতিন প্রদর্শনীতে ৪টি ফিলামেন্ট বাল্ব প্রদর্শিত হয়েছিল। ব্রিটেন থেকে এডিসন এবং ম্যাক্সিম তাদের তৈরী ফিলামেন্ট বাতি প্রদর্শন করেন। এই সময়েই সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সারের গোডালমিং অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। স্যার উইলিয়াম সিমেন্স-র মতানুসারে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র গোডালমিং অঞ্চলের ৮-১০ জন এই উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহারকারী ছিলেন। ঐ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ দিয়ে ঐ সময়ে সকল গ্রাহকরা সম্মিলিতভাবে প্রায় ৫৭টি বাতি আলোকিত করতেন । এই অঞ্চলের হাউস অফ কমেন্স-এর সিলেক্ট কমিটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে একটি বিল-কে মান্যতা দেয় যা বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক আলোকিতকরণের আইন হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই আইনানুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকে যে কোন অঞ্চলের স্থানীয় বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এই বিষয়ে তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এডিসন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের হলবর্ণ ভিয়াডেক্ট-এ একটি পরীক্ষামূলক বাষ্পীয় শক্তির উৎপাদক কেন্দ্র থেকে উৎপাদন শুরু করেন। এরপর, ঐ বছরই, তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের পার্ল স্ট্রীট স্টেশন নামক একটি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। ২ বছরের মধ্যেই এই উৎপাদন কেন্দ্রের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০-তে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যেই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ক্রম্পটন গৃহস্থ বাড়িগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে নরওইচের পথ ও বাজারগুলির আলোকিতকরণের কাজ শুরু করেছিলেন। অপরদিকে রবার্ট হ্যামন্ড ১৮৮১

খ্রিস্টাব্দে ব্রাইটন অঞ্চলে ব্রাম আর্ক লাইটিং-এর প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শন অত্যন্ত সফল হয় এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি পাকাপাকিভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ঐ অঞ্চলে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] ১৮৮০-র দশকে ইংল্যান্ডে ক্রম্পটন অ্যান্ড কোং ও সোয়ান ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি, আমেরিকার থমসন-হাউসটন ইলেকট্রিক কোম্পানি ও ওয়েস্টিং হাউস এবং জার্মানির সিমেন্স প্রভৃতি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের কাজে যুক্ত ছিল। এইভাবে ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঊনবিংশ শতকে আশির দশক অবধি ব্যবহৃত বা উৎপাদিত বিদ্যুৎ ছিল মূলতঃ সমপ্রবাহ ধরনের বা ডিরেক্ট কারেন্ট। এই ধরনের তড়িৎ-কে অনেক দূরে প্রেরণ করা ছিল অসুবিধাজনক। উৎপাদিত বিদ্যুৎ দূরে প্রেরণ করতে প্রয়োজন ছিল পরিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের। এই বিবর্তিত/পরিবর্তিত বিদ্যুৎপ্রবাহ আবিষ্কারের পুরোধা হলেন নিকোলাস টেসলা। প্রাথমিকভাবে টেসলা বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন এবং তাঁর গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকা যান। ওখানে তিনি থমাস আলভা এডিসনের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য থমাস আলভা এডিসন ডিরেক্ট কারেন্ট বা সমপ্রবাহ বিদ্যুতের প্রতি দুর্বল ছিলেন এবং বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহকে মানব জাতির পক্ষে ক্ষতিকর হিসাবে দেখতেন। ১৮৮৮ সালে টেসলা পলিফেজ ইনডাকশান মোটর আবিষ্কার করেন। তিনি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারস নামক প্রতিষ্ঠানে বিবর্তিত তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে একটি লেখা পাঠান এবং এডিসনের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের সূত্রপাত হয়। এডিসন বিবর্তিত তড়িৎ প্রবাহকে মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক মনে করতেন বলে এর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করারও চেষ্টা করেছিলেন। জর্জ

ওয়াশিংটন এই সময় টেসলাকে এ.সি মোটর বা বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের মোটর তৈরির কাজে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন। অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে টেসলা বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহের বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। এই সময়ে শিকাগো-তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কলোম্বিয়ান প্রদর্শনীতে, আলোকিতকরণের উদ্দেশ্যে, বিবর্তিত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় নায়গ্রা ফলস থেকে টেসলা জেনারেটারের সাহায্যে বিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৩৫ কি.মি দূরে বাফেলো শহরের আলোকিতকরণের জন্য সরবরাহিত হয়। এই ঘটনা বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী প্রয়োগ, যা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিরাচরিত ধারণাকে বদলে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিবর্তিত বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমেই উৎপাদন স্থল থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলেও বিদ্যুৎ প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।[১৬]

বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলির আধিপত্য অনস্বীকার্য, কিন্তু সভ্যতার আদিপর্ব থেকে তাদের এরূপ আধিপত্য ছিল না। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে আরবীয় বা ভারতীয়রা বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। গনিত, জ্যোর্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয়দের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত সমকালীনদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। আয়ুর্বেদের মাধ্যমে জটিল রোগের চিকিৎসার কথাও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগের ধাতব স্তম্ভগুলি ভারতীয়দের ধাতব বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে। বিখ্যাত গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। মধ্যযুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। আকবর নিজে প্রযুক্তির বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। রাজস্থানের রাজা সোয়াই জয় সিংহ মহাকাশচর্চা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। মূলত পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞান যুগ শুরু হয় এবং বহুল পরিমাণে প্রযুক্তির আবির্ভাব

ইউরোপীদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়ক হয়ে ওঠে। এই একচেটিয়া আধিপত্যই ইউরোপীয় বিশেষতঃ ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই একই বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি। বণিকগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভাব ঘটলেও অচিরেই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। তারা অতি দ্রুত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা আধুনিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন জ্ঞান বা পুঁথিগত শিক্ষা নেই। ভারতবর্ষে, ব্রিটিশরা নিজেদের সুবিধার্থে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটায়। প্রাথমিকভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে তা ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান ঐতিহাসিক জর্জ বাসাল্লা প্রথম এক ত্রিস্তরীয় মডেলের মাধ্যমে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য জগতে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তারকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রথম স্তরে ইউরোপীয় বিভিন্ন অভিযাত্রী, অনুসন্ধানকারী এবং মিশনারীরা তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক দেশগুলি থেকে বিভিন্ন তথ্যসূত্র সংগ্রহ করেছিলেন এবং ইউরোপে গিয়ে সেই সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয় স্তরে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই গবেষণার সাথে যুক্ত হয়েছেন। ঔপনিবেশিকরা ঐ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তারা বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এই প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে ত্যাগ করেনি। তৃতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে এবং তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক দেশগুলিতেও আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য মানদণ্ডের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিস্তার ঘটেছিল। বাসাল্লা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জগতে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে এক বিশ্বব্যাপী চরিত্র দান করেছেন যেখানে মূলত ইউরোপীয় অঞ্চলগুলি থেকে সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা সম্প্রসারিত হয়েছিল।[১৭]

ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য নিযুক্ত করতে থাকে। ক্রমশ এই বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে ভারতীয়রা নিজেদের মত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের মধ্যে বাংলা-র ভূমিকা এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় এবং পশ্চিমের ঐতিহাসিকদের মতে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় বিজ্ঞান চেতনার জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সময়ে একশ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যানধারণার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এই জ্ঞান আহরণই ঔপনিবেশিক বাংলায় এক আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম দেয়, যাদের মধ্যে এক আত্মনির্ভরতার তাগিদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই শ্রেণীর মূল লক্ষ্যই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। ক্রমে ভারতে বিজ্ঞান জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে বিজ্ঞান নির্ভর পাঠ্যক্রম চালু করে। অচিরেই ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। ডঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বিজ্ঞান সাধনায় নিজেদের নিযুক্ত করেন।[১৮] এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্রিটিশরা কিন্তু আপামর ভারতবাসীর বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষে ব্রতী হয়নি। ভারতীয়দের বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার কাজে খুব একটা উৎসাহ দেওয়া হত না এবং বিংশ শতকের গোড়া অবধি ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের থেকে দূরে রাখার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক দীপক কুমার বিজ্ঞানকে সামাজিক কার্যকলাপ হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে শিল্প এবং বাণিজ্যের অনুপস্থিতিতে বিজ্ঞানের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন । তিনি ভারতীয়দের বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হওয়ার এই সময়কালকে, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগকে ‘The phase of colonial science’ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত করেন।[১৯] অপরদিকে মুন্সি জাকাউল্লাহ ঊনবিংশ শতকে দিল্লীর ‘নতুন ধারার অধ্যয়ন’-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি

মনে করতেন যে শিক্ষা কোন নির্দিষ্ট বর্ণ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তা সর্বদাই সার্বজনীন। তিনি মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতককে এক বিশেষ অধ্যায় হিসাবে গণ্য করেন। তিনি আরও বলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ না করলে শিক্ষার আধার কখনই পূর্ণতা লাভ করবে না এবং ফলস্বরূপ পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়তে হবে।[২০] তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মুষ্টিমেয়, বাছাই করা এক শ্রেণীর ভারতীয়দেরই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য চিহ্নিত করেছিল। এর ফলে বিশেষত প্রযুক্তি বিজ্ঞান বা এরূপ কাজকর্মে ভারতীয়দের মধ্যেই অঘোষিত ২টি শ্রেণী তৈরী হয় যথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত 'বাবু' প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ার) এবং অপর শ্রেণীটি হল অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মিস্ত্রি বা কর্মী। এই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর 'মিস্ত্রী' বা কর্মীরাও প্রযুক্তিবিদ্যায় ছাপ রেখে গিয়েছিল তথাকথিত পুঁথিগত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও। এরূপ একজন ছিলেন টিটাগড় নিবাসী গোলকচন্দ্র। তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম 'ইঞ্জিনিয়ার' ছিলেন।[২১] ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি বাষ্পীয় কল বা স্টীম ইঞ্জিন প্রস্তুত করেন। ঐ বছর কলকাতার টাউন হলে, অ্যাগ্রী হর্টিকালচারাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি এই ইঞ্জিনটির প্রদর্শনী করেছিলেন এবং ৫০ টাকার আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার নামক এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন শিবচন্দ্র নন্দি। তিনিই প্রথম টরেটক্কায় ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় বার্তা পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য বার্তা প্রেরকদের প্রশিক্ষণের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই উপনিবেশবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১শে জুন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার সি.ই.ট্রেভেলিয়ান, হাউস অফ লর্ডস-এর সিলেক্ট কমিটির সামনে দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তাঁর মতে ভারতীয়দের সিভিল সার্ভেয়িং ও আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ শিক্ষিত করা প্রয়োজন ছিল। তবে ভারতীয়দের প্রতি এই অনুকম্পা যে

ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ছিল সে কথা বলাই যায়। যদিও এর তিন বছর পরে বাংলায় একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা বর্তমানে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে পরিচিত। আশির দশকের শেষের দিকে এবং নব্বইয়ের দশকে বঙ্গে, দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তির ছাপ রেখেছিল। এই কোম্পানির কর্ণধার ছিলেন শ্রী কালিদাস শীল। দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া খবর অনুযায়ী এই সংস্থা বিয়ে উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রায় বৈদ্যুতিক আলোর আলোকসজ্জা করে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, ইন্ডিয়ান ক্লাব, দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভ্যদের জন্য এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছিল। এই সভাগৃহে আলোকসজ্জা করেছিল দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কলকাতায় আসেন, সেই সময়ে, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই দেশীয় সংস্থাই দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাসগৃহ বিদ্যুতের আলো দিয়ে আলোকিত করে।[২২]

প্রযুক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চার মতই ভারতে বিদ্যুতের আগমন ঔপনিবেশিক সময়ে ব্রিটিশদের হাত ধরেই। রিচার্ড বি. ডু. বফ বিদ্যুতায়নের প্রকৃতি নির্বাচন কালে ব্যাখ্যা করেছেন যে বিদ্যুতায়ন হল অত্যন্ত জটিল এক প্রক্রিয়া যা বিংশ শতকের গোড়ায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক প্রযুক্তিগত বিবর্তন এনেছিল। ডেভিড এ. নাই, এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে প্রযুক্তির ইতিহাস কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। তিনি মূলত আমেরিকার বিদ্যুতায়ন নিয়ে কাজ করেছেন এবং তিনি তার কাজের মধ্যে দিয়ে খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন যে বিদ্যুতায়ন কিন্তু শুধুমাত্র 'আবিস্কার'-র ইতিহাসের হিসাবেই সীমিত নয়, তা অবশ্যই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্ভবনাময় এক জনপ্রিয় অন্তর্ভুক্তির অভিযোজন।[২৩] ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের প্রধান শহরগুলির, গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং

বন্দরগুলির বিদ্যুতায়ন করেছিল। ইউরোপে বিদ্যুৎ আসার দুই দশকের মধ্যেই ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুতের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে পাশ হওয়া 'দি ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট অফ ইন্ডিয়া' নামক বিদ্যুৎ আইনের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। একদম প্রথমের দিকে ভারতীয়দের কাছে বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, অফিসগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অচিরেই ঘোড়ায় টানা ট্রামের জায়গায় বৈদ্যুতিক ট্রাম, হাত পাখার বদলে ফ্যান বা বৈদ্যুতিক পাখা এবং গ্যাস-এর আলোর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বাংলার প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠে দার্জিলিং জেলার সিদ্রাপং অঞ্চলে। সূচনাকালে এই উৎপাদনকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩০ কিলোওয়াট। মূলতঃ দার্জিলিং অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যই ১৮৯৬ খ্রী এই উৎপাদনকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এর ঠিক একবছর পরে ১৮৯৭ সালে কলকাতার ইমামবাগ লেন-এ বাংলার প্রথম তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এই উৎপাদন কেন্দ্রটি ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের অধীনে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল এই উৎপাদনকেন্দ্র বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছিল। এই উৎপাদনকেন্দ্রে ক্রম্পটন ডায়নামো, উইলিয়াম্স বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং ব্যাবকক্স অ্যান্ড উইলকক্স বয়লার ব্যবহৃত হয়েছিল।[২৪] ক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ১৯০২ সালে মহীশূর সরকারের কাভেরী পাওয়ার স্কীমের অধীনে শিবসমুদ্রম পাওয়ার স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এছাড়া ব্যাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলেও এই উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। প্রাথমিক পর্যায় এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ৪৫০০ কিলোওয়াট। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে

জম্মু-কাশ্মীরে দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। চেনাব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল জম্মু জলবিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ঝিলাম নদীর মোহরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। মূলতঃ শ্রীনগর অঞ্চলের সরবরাহের জন্য এই ২টি উৎপাদনকেন্দ্রকে ব্যবহার করা হত।[২৫] অপরদিকে বোম্বে ও পুনে অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল ভোরঘাট। ভোরঘাট-এর বৃষ্টির জলকে ধরে তা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি। খোপোলী অঞ্চলে গড়ে ওঠা এই কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৮০০০ কিলোওয়াট। কিছুদিন পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভিবপুরী অঞ্চলে গঠিত হয় অন্ধ্র ভ্যালী পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি। এই উৎপাদনকেন্দ্রের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৮০০০ কিলোওয়াট। শিবসমুদ্রম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ মেট্টুর রিসিভিং স্টেশনে এসে তারপর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে সরবরাহিত হত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মেট্টুর বাঁধ-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে গঠিত হয়েছিল মেট্টুর পাওয়ার স্টেশন। মূলত মাদ্রাজ, ইরোদ এবং মোয়ার অঞ্চলে এই উৎপাদনকেন্দ্রটি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহিত হত এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ২৫০০ কিলোওয়াট। এযাবৎ সর্ববৃহৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল নিলা-মূলা রিভার প্রোজেক্ট, যা টাটা পাওয়ার কোম্পানি নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ভিরা অঞ্চলে প্রায় ৮৭,৫০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই উৎপাদনকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল। খোপোলী এবং ভিবপুরী উৎপাদনকেন্দ্র একে অপরের সাথে উৎপাদক ও গ্রহীতার সম্পর্কে সংযুক্ত ছিল । আবার ভিরা অঞ্চলের উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে খোপোলী উৎপাদন কেন্দ্রও ছিল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই ৩টি উৎপাদন কেন্দ্র মিলিত ভাবে বম্বে-র বিদ্যুতের চাহিদা বন্টন করেনিত। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নীলগিরি অঞ্চলে স্থাপিত হয় পাইকাড়া পাওয়ার স্টেশন। প্রাথমিকভাবে ৬.৬৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই উৎপাদন কেন্দ্রটি উটি, কুন্নুর, কোয়েম্বাটুর শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে

গড়ে ওঠা এইসকল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছিল মূলত বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তবে নীলগিরি অঞ্চলের আরুভাঙ্কারু সরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[২৬]

স্বাধীনোত্তর ভারতে নব প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, 'বিদ্যুত'কে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করে এবং পূর্বের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির রাষ্ট্রায়াত্ত্বকরনের পরিকল্পনা নেয়। ১৯৪৮ সালের 'ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই অ্যাক্ট' চালু করার মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি ও বিভিন্ন রাজ্যে স্টেট বোর্ড বা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির মাধ্যমে প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতেও বিদ্যুৎ প্রেরণ করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির কার্যনির্বাহ করার বিষয়টি ছিল কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের সমন্বয়ের ফল। এই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উপর সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কার্যকারিতা নির্ভরশীল ছিল যার ফলস্বরূপ অচিরেই কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সফলতার মাপকাঠি হয়ে উঠেছিল। ক্রমে যখন সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির কর্মক্ষমতা প্রশ্নের মুখে এসে পড়ে, তখন এক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গঠিত হয়েছিল যথাক্রমে- ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন এবং ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন। উল্লেখ্য সময়কালে ভারতবর্ষের বিদ্যুতশিল্পের উৎকর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন ছিল ভুটানের চুখা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯৭৪ সালে ভুটানের ওয়াং চু বা পশ্চিমবঙ্গের রায়ডাক নদীপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তি ও বিনিয়োগে চুখা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছিল এবং ১৯৮৬ সালে ২টি ইউনিট নিয়ে চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় স্তরে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার

১৯৮১ সালে 'কমিশন ফর অ্যাডিশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি' প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৩ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল 'দি ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট,২০০৩' এবং এই আইনের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নতুন যেকোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বেগ পেতে হয়, ভারতবর্ষও এই ক্ষেত্রে আলাদা কিছু ছিল না। পরবর্তীকালে সরকারি উদ্যোগে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শুধুমাত্র তাই নয় বিংশ শতকের শেষভাগে সরকারি উদ্যোগে বিদ্যুতায়নের উপর যে জোর দেওয়া হয় তা কিন্তু মূলত গ্রাম নির্ভর, বাড়ি নির্ভর নয়। অর্থাৎ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করাই মূল লক্ষ্য ছিল, প্রতিটা গৃহে বা বাড়িতে তা পৌঁছানোর তাগিদ লক্ষ্য করা যায়নি।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের বৈভবসমৃদ্ধ রাজধানী ছিল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা। মনে করা হয় যে কলকাতার নাগরিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরেই। এই নগরায়ণ পূর্ণতা পেয়েছিল বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান দিনে কোন অঞ্চলের নগরায়ণ বিদ্যুতায়ন ছাড়া অসম্পূর্ণ এবং শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, বিদ্যুতশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৪২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী চল্লিশ বছরেরও কম সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে, বিভিন্ন প্রযুক্তির তিরিশটিরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[২৭] আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যুতায়নের গতি বা হার আশানুরূপ হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল একটু অন্যরকম। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলি মিলিয়ে বিদ্যুতের সর্বাধিক চাহিদা দেখা যেত সন্ধ্যাবেলায়। এরপরই দ্রুত এই চাহিদা নামতে থাকে যা

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধার ছিল। বড় বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন নামিয়ে আনা কর্তৃপক্ষের কাছে অন্যতম চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২৮] পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্প স্বাধীনোত্তর পর্বে ভৌগোলিক ভাবে বিস্তৃতি লাভ করলেও ঔপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা ব্যক্তিগত ও বেসরকারিভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন বা ব্যবহারের যে ইতিহাস তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিকভাবে কলকাতায়, আলো জ্বালানোর কাজেই বিদ্যুতের ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে এই জ্বালানোর কাজে আগে ব্যবহৃত হত গ্যাস এবং তারও আগে ছিল তেলের ব্যবহার। ডাক্তার টোলিসন, ১৮২২ সালে, কলকাতার ধর্মতলায় তাঁর দোকানে গ্যাসের আলো জ্বেলেছিলেন। এর ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৮২৩ সালে বিখ্যাত রসায়নবিদ ও ঔষধ প্রস্তুতকারক মিঃ বাথগেট, তাঁর বাড়িতে কোল গ্যাসের আলো জ্বেলে উপস্থিত কলকাতাবাসীকে আশ্চার্যন্বিত করে দিয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে, ইংল্যান্ডের দি ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি, প্রথম, কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কের কাছে হ্যালিডে স্ট্রিটে কোল গ্যাস তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা কর্পোরেশন এবং ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির মধ্যেকার চুক্তির মাধ্যমে রাস্তায় গ্যাসের আলোর প্রবর্তন হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ৬ই জুলাই, কলকাতার অভিজাত সাহেব পাড়ার রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো বা বাতি জ্বলতে শুরু করেছিল। তৎকালীন সময়ে গ্যাসের আলো শুধুমাত্র কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর আকর্ষণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ কলকাতা ভ্রমণে আসতেন। পাশাপাশি বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতা ছাড়াও বঙ্গের অন্যান্য গ্রাম ও শহরে সহজ পদ্ধতির অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোর চল ছিল।[২৯] ১৮৭৯ সালের ২৪ জুলাই – পিঃ ডব্লিউ ফ্লেউরি অ্যান্ড কোম্পানি, ছোট একটি ডায়নামো চালিয়ে চলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে কার্বন আর্কল্যাম্প জ্বালায়।[৩০] ১৮৮০ সালের ৩১শে মে,

রেলওয়ে বিভাগের অনুরোধে সাড়া দিয়ে, ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের পূর্ব শাখার সুপারিনটেনডেন্ট লুই শ্যোয়েন্ডলার, ২৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট একটি সেকেন্ডহ্যান্ড স্টিম ইঞ্জিনের শক্তি দিয়ে ডায়নামোর সাহায্যে হাওড়া স্টেশনের দুটি গুডস শেডে পরীক্ষামূলক ভাবে চারটি কার্বন আর্কল্যাম্প জ্বালিয়েছিলেন। ১০ই জুন পুনরায় তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে হাওড়া স্টেশনের ২টি প্ল্যাটফর্মে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে উপস্থিত দর্শকদের হতচকিত করে দেন। অপরদিকে এই নতুন উদ্ভাবিত বিষয় নিয়ে এক দেশীয় সংস্থা আলোড়ন ফেলে দেয়। বাঙালী ব্যবসায়ী শিবদাস শীল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি বিদ্যুতশিল্পের দেশীয় আত্মীকরণের ধ্বজা বহন করে চলেছিল। তাদের প্রথম অফিস ছিল ৩৮, ওয়েলিংটন স্ট্রীটে এবং যা পরবর্তী কালে স্থানান্তরিত হয়ে চলে যায় ২০ নং লাল বাজার স্ট্রীটে। এই কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত মোটর চালিত সেলাইকল ও টেবিল ফ্যান এবং পরবর্তীকালে, 'ব্যালান্সড পাখা' ও সেটিকে চালাবার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দেশীয় কারিগরীর এক উন্নত নিদর্শন। তবে দে শীল অ্যান্ড কোম্পানির সফলতা ছিল মূলত বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক আলোর সাজসরঞ্জামের জন্য।[৩১] এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার। ১৮৮৩ সালে গ্রেট ইস্টার্ন (বর্তমান দি ললিত গ্রেট ইস্টার্ন) কর্তৃপক্ষ তাদের পুরো হোটেল প্রাঙ্গণটি বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা আলোকিত করে। হোটেল কর্তৃপক্ষ আশা করেছিল যে এই অভিনবত্ব সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করে তাদের ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে।[৩২]

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলকাতার গর্ব হিসাবে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান অনস্বীকার্য। ১৮৮৮ সালের ১৭ই আগস্ট, মোহিনীমোহন বসুর বাড়িতে বঙ্গমহিলা সমিতির নবম সাংবৎসরিক অধিবেশন বসেছিল। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু, এই সভায় বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তি দ্বারা কাপড় সেলাই ও অন্যান্য বেশ কিছু যান্ত্রিক

প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় ছিল তিনি এক যন্ত্রের প্রদর্শন করেন যার অপরদিকে হাত রেখে বিদ্যুতের আলোয় দেখলে হাত দেখা যায় না, হাত বাতাসের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং তার ভিতর দিয়ে অপর দিকের বস্তু সকল দেখা যায়।[৩৩] ইতিমধ্যে ১৮৮৭ সালে প্রথম বিদ্যুৎ বা বিদ্যুতশিল্পজনিত আইন প্রনয়ণ করা হয় বলে জানা গেলেও তা নিয়েও মতান্তর এবং তথ্যের অভাব বর্তমান। কলকাতার বিদ্যুতায়নের পিছনে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশদের দ্বারাই 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং অ্যাক্ট' নামক আইন প্রবর্তিত হয় এবং এই আইনের মাধ্যমেই স্থানীয় প্রশাসন শহর কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি পায়। এই আইনানুসারে স্থানীয় প্রশাসন কোনো সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষকে কলকাতায় বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করার অনুমতি দিতে পারে। কলকাতায় প্রথম এই লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছিল মেসার্স কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানিকে। ৭ই জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে দি ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড এর প্রতিনিধি হিসাবে মেসার্স কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি এই লাইসেন্স পায়। এক মাস পরে ফেব্রুয়ারী মাসে এই কোম্পানির নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড' হয়েছিল। মেসার্স কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানির অফিস থেকে পুরো বিষয়টি পরিচালনা হত। তবে এর পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল সরাসরি লন্ডনের বোর্ড অফ ডিরেক্টার্স এর হাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাপ্ত অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স অনুযায়ী কোম্পানিকে কলকাতা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী মোট ৫.৬৪ বর্গমাইল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হত। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, প্রিন্সেপ স্ট্রীটের নিকট ইমামবাগ লেন-এ তাদের প্রথম তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করেছিল। ১৮৯৭ সালের ১৭ই এপ্রিল এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যাত্রা শুরু করেছিল।[৩৪] এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে ৫০০ অশ্বশক্তির ৩টি বয়লার ছিল এবং পরবর্তীকালে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে এই উৎপাদন কেন্দ্রে ৮টি ডায়নামো এবং ১টি তড়িৎ ভান্ডার(ব্যাটারী) এর

সাহায্যে এর ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৮০০ অশ্বশক্তি অবধি বাড়ানো যেতে পারে বলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এর চিমনি, যা এর নিকটস্থ ওয়াটার ওয়াকর্সের চিমনি-র থেকে প্রায় ৪০ ফুট বেশী ছিল। এই সময়ে কলকাতার বিদ্যুতের মূল্য ছিল এক টাকা প্রতি ইউনিট যা তৎকালীন লন্ডনের ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্যের সমান। সমকালীন এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ১৮৯৮ সালের ৩-রা ডিসেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল (বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) চৌরঙ্গীর দি বেঙ্গল ক্লাব এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আবাসনে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল। প্রাথমিকভাবে ৬০০০ বিদ্যুৎ স্তম্ভে বৈদ্যুতিক সংযোগ তথা বাতি সরবরাহের জন্য 'মেইন' স্থাপন করা হলেও তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৯৯ সালের ১৯শে আগস্ট, কলকাতা হাইকোর্ট বৈদ্যুতিক পাখা লাগানোর বরাত দেয় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে। ১৯০২ সালের ২৫শে মে ফোর্ট ইউলিয়ামের পুরানো পাখাগুলির বদলে নতুন পাখা লাগানোর জন্য ১৫০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সমসাময়িক সময়ে কলকাতার আলিপুর অঞ্চলে অবস্থিত সেনাবাহিনীর বস্ত্র প্রস্তুতকারী এক সরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ১৯০০০ টাকা ব্যয় করে।[৩৫]

ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা যখন ভারতে এসেছিল তখন এই দেশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারার দরুন বছরের প্রায় অর্ধেক সময় কষ্ট ভোগ করতে হত। ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে থেকেই ভারতবর্ষে হাতপাখার প্রচলন ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে এই হাত পাখারই এক বিবর্তিত রূপ হয়ে উঠেছিল একটি নিষ্ঠুর শ্রমসাধ্য কাজ। গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্রিটিশরা ভারতীয় ভৃত্য রাখতেন। এদেরকে 'পাঙ্খাওয়ালা' বা 'পাখাওয়ালা' বলা হত। এই পাখাওয়ালাদের কাজ

ছিল সারা দিনরাত তাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবদের বাতাস করে যাওয়া। বড় বড় পাখার সঙ্গে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকত, তারা সেই দড়ি ধরে টেনে টেনে পাখার বাতাস করতেন। এই কাজে তারা বিশ্রামের সময় একেবারেই কম পেতেন। এই প্রকাণ্ড পাখাগুলো লাগানো হত কোর্ট-কাছারি, ব্যারাক, ব্রিটিশ দপ্তর, স্কুল, ইউরোপীয় ও বনেদি ভারতীয়দের ঘর ইত্যাদি স্থানে।[৩৬] বিদ্যুৎ আসার ফলে এই চিরাচরিত পন্থায় ছেদ পড়েছিল। আলো জ্বালানো বা যন্ত্রের চাকা ঘোরানোর জন্য মোটরও নয়, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রথম ব্যবসায়িক সাফল্য এসেছিল সাধারণ মানুষের ঘরে ইলেকট্রিক পাখা পৌঁছে দেওয়ার সুবাদে।

সাধারণ মানুষ যাতে বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ নেয় তার জন্য সংস্থার তরফ থেকে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় ইলেকট্রিক ফ্যান ভাড়া দেওয়া হত। বিদ্যুৎ-কে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য সেইসময় বিক্রয়িক বা সেলসম্যান নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই বিক্রয়িকদের মূল কাজ ছিল, সাধারণ মানুষকে আলো ও তাপের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো। বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্লটিং পেপার-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। ধীরে ধীরে ছোট বা মাঝারি আকারের কলকারখানা, মূদ্রণযন্ত্র, পাম্প, বিজলি মোটর, বাষ্পীয় যন্ত্রালয় ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যুৎ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এগুলোর পাশাপাশি রেলের কারখানায় বেল্ট-পুলির বদলে বৈদ্যুতিক মোটর, চায়ের গুদামঘরে চা তোলার এবং ভরার কাজে, সেলাইকল চালাবার জন্যও বিজলি মোটর ব্যবহারের কথা জানা যায়।[৩৭] অর্থাৎ একদম প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যুতকে কায়িকশ্রমের বিকল্প হিসাবে দেখার একরকম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যখন প্রথম কলকাতায় বিদ্যুৎ আসে স্থানীয় মানুষরা বিদ্যুৎকে ‘জিন’ হিসাবে বিবেচনা করত। গোড়ার দিকে কলকাতার মানুষ বা বলা ভাল কলকাতার উচ্চবিত্ত

মানুষদের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া ছিল এক ঝক্কির কাজ। তারা ভাবত বাড়িতে 'ছেঁদা' করে বিদ্যুৎ আনতে হবে। ১৯০১ সাল অবধি মাত্র ৭০৮টি বাসগৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো) কন্যা পূর্নিমা দেবী তাঁর পিতার প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে তাদের এলাকায় তাঁর পিতাই প্রথম বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেন এবং ক্রমে তাঁকে দেখে বহু মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন জানানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি আরো জানান যে এই ঘটনায় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যারপরনাই খুশি হয় এবং তাদের বিদ্যুৎ সংযোগের যে পারিশ্রমিক তা মকুব করে দিয়েছিল।[৩৮] কালের নিয়মেই কলকাতায় বিদ্যুৎ ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় শুরুর দিকে বিদ্যুৎ মূলত আলোকিতকরণের কাজেই ব্যবহৃত করা হয়েছিল। কলকাতায় প্রথম হ্যারিসন রোডে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯১ সালে ঐ রাস্তার কাজ শেষ হলে ৯৭৫০ টাকার বিনিময়ে মেসার্স কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানিকে, কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে এই রাস্তায় বৈদ্যুতিক পথবাতির দ্বারা আলোকিতকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯০৪ সালে হরিশচন্দ্র মুখার্জী রোড, ১৯০৫ সালে ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, হাজরা রোড, মট লেন, ক্লাইভ স্ট্রীট, আর্মহার্স্ট স্ট্রীট, রায় বাগান স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং ১৯০৭ সালে দুর্মাহাটা স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্কোয়ার এবং পরের বছর নতুন চায়না বাজার স্ট্রীট বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা আলোকিত করা হয়েছিল। ১৯১২ এর শেষ অবধি, সি.ই.এস.সি, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রায় ১২৪ মাইল ওভারহেড এবং প্রায় ২৫০ মাইল আন্ডারগ্রাউন্ড তার (কেবল) ব্যবহার করেছিল।[৩৯]

১৮৭৩ সালে কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি যাত্রা শুরু করেছিল। মালপত্র নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হলেও প্রথমদিন থেকেই এই ট্রাম যাত্রী

বহন করেছিল। ১৮৮০ থেকে কলকাতায় নিয়মিতভাবে ট্রাম চলাচল শুরু হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে কিলবার্ন এন্ড মেসার্স কোম্পানি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ট্রামগাড়ি চালাবার দরখাস্ত করেছিল। এই মর্মে তৎকালীন কর্পোরেশন এক বিশেষ কমিটি গঠন করেছিল। এই বিশেষ কমিটি বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালানোর বিষয়টি পর্যালোচনা করে ১৮৯৭ সালের ২৮শে জানুয়ারি একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করেছিল। বেশ কিছুদিন টালবাহানার পর অবশেষে ১৮৯৯ সালে প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে কোম্পানি ঐ চুক্তির মান্যতা দিয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি লাইনের প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন করে ১৯০২ সালের ২৯ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঘোড়ার বদলে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চালানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিল। ১৯০২ সালের ২৭শে মার্চ খিদিরপুর লাইনে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলেছিল। এর তিন মাস পরে ১৪ই জুন কালীঘাট লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে এবং এরপর ক্রমে ওয়েলিংটন স্ট্রীট লাইনে এবং ধর্মতলা লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রাম যাত্রা শুরু করেছিল। অবশেষে ১৯০২ সালের ১৯শে নভেম্বর মধ্যে কলকাতার সবকটি পুরনো লাইনেই ঘোড়ার পরিবর্তে বিদ্যুৎ শক্তি চালিত ট্রাম এর প্রচলন ঘটে ছিল। পরবর্তী সময়ে ৭ই জুলাই ১৯০৫ সালে শিয়ালদহ থেকে হ্যারিসন রোড দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলেছিল হাইকোর্ট পর্যন্ত।[৪০] তবে এই ট্রাম চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি নিজেই উৎপাদন করত। ট্রাম কোম্পানি নিজ উদ্যোগে নোনাপুকুর অঞ্চলে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিল।[৪১] পরবর্তীকালে ১৯০৭ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে হাওড়ায় ট্রামলাইন পাতার অনুমতি দিলে কোম্পানি ডবসন রোড ও গোলাবাড়ি রোডের মোড়ে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিল।[৪২] ১৯২৭ অবধি ট্রাম কোম্পানি নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের যোগান দিলেও পরবর্তীকালে সি.ই.এস.সি থেকেই বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিল।[৪৩]

ক্রমে কলকাতায় বিদ্যুতের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং এই বর্ধিত চাহিদার সাথে পাল্লা দিতে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, বেশ কিছু ডি.সি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলে। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে ৭৫০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আলিপুরে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এরপর ১৯০৬ সালের মে মাসে ১৬৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র হাওড়াতে এবং উল্টোডাঙাতে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ১৯১০ সালে হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে কাশীপুর জেনারেটিং স্টেশন। প্রাথমিকভাবে এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৫ কিলোওয়াট এবং এই উৎপাদনকেন্দ্র প্রায় ৬০০০ ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বিবর্তিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ছিল। ১৯১২ সালের ২০শে জুলাই এই উৎপাদন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। ঐ বছরই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ৬ মেগাওয়াট ও পরবর্তীকালে ১৯২৫ সালে আরো ১৫ মেগাওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩২ সালে কাশীপুর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের ক্ষমতা দাঁড়িয়েছিল ৯৬ মেগাওয়াটে। ইতিমধ্যেই সি.ই.এস.সি তাদের সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রেখে ১৯২৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে সাউদার্ন জেনারেটিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ৩টি ৭.৫ মেগাওয়াটের টার্বোর ক্ষমতা বিশিষ্ট এই উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাথমিক ক্ষমতা ছিল ২২.৫ মেগাওয়াট। এই উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পিছনে মূল লক্ষ্য ছিল কলকাতার খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। ডক কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থার জন্য তাদের নিজস্ব জেনারেটার ছিল কিন্তু অচিরেই তারা অনুধাবন করতে পারে যে বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজটা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই সঙ্গত হবে। এর পাশাপাশি শহরের দক্ষিণ অংশের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদাও এই উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পিছনে অনুঘটকের কাজ করে।[৪৪]

সি.ই.এস.সি-র এই সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখলে বোঝা যায় যে কর্পোরেশন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদাকে জরিপ করে সমগ্র অঞ্চলকে ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে আগ্রহী ছিল। ইতিমধ্যেই রিষড়া অঞ্চলের শিল্পজনিত চাহিদা এবং হাওড়ার গৃহস্থ ও শিল্পজনিত চাহিদা কর্পোরেশনের অন্যতম চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর এই প্রয়োজন মেটাতে কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নেয় হুগলী নদীর নীচ থেকে একটি সুড়ঙ্গ গঠন করে তার মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক তার (কেবল) প্রেরণের মাধ্যমে নদীর অপরপ্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার। সি.ই.এস.সি, ১৯৩১ সালে, প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এই সুড়ঙ্গটি স্থাপন করেছিল। এটি প্রায় ১৭৩৭ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট ডায়ামিটার যুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে বিশেষত বিংশ শতকের ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সময়ে এই সুড়ঙ্গটি অত্যন্ত কার্যকারী হয়েছিল।[৪৫] ১৯২৮ সালে শুরু হয়ে প্রায় ৯৩ সপ্তাহ পরে ১৯৩১ সালে শেষ হওয়া এই সুড়ঙ্গের দায়িত্বে ছিলেন স্যার ডালরিম্পিল-হে।[৪৬]

বিদ্যুৎ এমন এক পণ্য যা বহুভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। তবে বিদ্যুতশিল্পের সাথে অনুসারী শিল্প হিসাবে পাখা বা বৈদ্যুতিক বাতি সামগ্রিকভাবে এই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। কলকাতার গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের স্থান পাওয়া ছিল দুষ্কর, বিদ্যুতকে গ্যাস লাইটের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে বিদ্যুতের সহযোদ্ধা হিসাবে দেখা দিয়েছিল বৈদ্যুতিক বাতি। বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যুৎ বাতি প্রস্তুতকারক সংস্থা ফিলিপ্স, ১৯৩১ সালে 'ফিলিপ্স ইলেকট্রিক কোম্পানি (ইন্ডিয়া)' নামে এদেশে ব্যবসা শুর করেছিল। কলকাতার ৩২ চৌরঙ্গী রোডে তাদের তৎকালীন অফিস ছিল। বলা বাহুল্য অচিরেই এই ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই কোম্পানি ১৯৩২ সালে, কলকাতায়, লো-প্রেসার সোডিয়াম ল্যাম্প এবং ১৯৩৪ সালে হাই-প্রেসার মার্কারি ল্যাম্প

আমদানি করে বিদ্যুৎ শিল্পে জোয়ার আনে। চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ফিলিপ্স প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সম্প্রসারণের পথে এগোলেও তারা এই বিষয়ে সরাসরি নিজেদের নাম ব্যবহার করেনি। ১৯৩৮ সালে ইলেকট্রিক ল্যাম্প ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড স্থাপিত হয়। এই নবনির্মিত সংস্থাটির সকল বিনিয়োগকারীই ছিল ব্রিটেনের এবং সংস্থাটি ফিলিপ্সের ব্রিটেনের অফিস থেকে পরিচালিত হত। ফিলিপ্সের হাতে ছিল এই নতুন কোম্পানির কোম্পানির ৩৫.৩৫% শেয়ার এবং বাকি শেয়ার ছিল জেনারেল ইলেকট্রিক লিমিটেড, ক্রম্পটন পার্কিসন লিমিটেড, মাজদা ল্যাম্পস এবং অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিকাল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানির হাতে।[৪৭] এই সময়ে বৈদ্যুতিক বাতিশিল্পে বিদেশী কোম্পানির পাশাপাশি আমাদের দেশীয় প্রযুক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ দেশীয় সংস্থাও গড়ে ওঠে। ঢাকা জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) নরসিন্দার জমিদার পরিবারের সন্তান শ্রী সুরেন রায় এবং তার সেজ ভাই কিরণ রায়, জার্মানি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এসে কলকাতার কসবা অঞ্চলে ১৯৩২ সালে বেঙ্গল ইলেকট্রিক্যাল ল্যাম্পস ওয়াকর্স নামক এক বৈদ্যুতিক বাতি উৎপাদনকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরুর কয়েক বছর এই সংস্থা টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্প উৎপাদন করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংস্থার দৈনিক ২০০ বাতি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল এবং পরবর্তীকালে নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে এই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দৈনিক ১০০০ বাতি হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাস থেকে এই সংস্থা গ্যাস ভর্তি বাতির উৎপাদন শুরু করেছিল। উচ্চমানের বাতি প্রস্তুতের জন্য অচিরেই এই সংস্থা বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা ও সাফল্য লাভ করেছিল। প্রচুর মান সংক্রান্ত পরীক্ষা পাস করার ফলে এই সংস্থা বহু মেডেল ও শংসাপত্র লাভ করেছিল। এই সংস্থা বাংলার মানুষের কাছে 'বেঙ্গল ল্যাম্প' নামেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন সরকার এই সংস্থার অন্যতম গ্রাহক ছিল। ১৯৩৫-৩৬ অর্থনৈতিক বর্ষে এই সংস্থা প্রায় ২৮০০০ বাতির

সরবরাহের বরাত পেয়েছিল এবং ১৯৩৬-৩৭ অর্থনৈতিক বর্ষে গিয়ে এই সংস্থাই পুনরায় গতবারের তিন গুন প্রায় ৮০০০০ বাতি সরবরাহের বরাত পেয়েছিল।[৪৮] বলা বাহুল্য এই সময় সারা দেশে স্বদেশি আন্দোলনের ফলে বিদেশি পণ্য বয়কটের যে পন্থা, তা বেঙ্গল ল্যাম্পের ব্যবসায়িক সাফল্যের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবেও দেখা দেয়। পাশাপাশি সুরেন রায়ের মেজভাই শ্রী হেমেন রায়ের কড়া প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সঠিক মানের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য খুব অল্প সময়েই এই সংস্থা বাংলার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেনিয়েছিল। বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার যাদবপুর অঞ্চলে, বিশাল এলাকা জুড়ে 'বেঙ্গল ল্যাম্প' নামক তাদের নতুন কারখানা গড়ে ওঠে। ক্রমশ বাংলার বাইরেও এই সংস্থা তাদের কার্যকলাপ প্রসারিত করে।[৪৯]

বিদ্যুতশিল্পের এইরূপ প্রসারের সময়ে কলকাতার বুকে বেশ কিছু প্রযুক্তিগত বিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমমুখী বা একমুখী (ডাইরেক্ট কারেন্ট) প্রযুক্তির ব্যবহার হত কিন্তু সময়ের সাথে আধুনিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল্লিশের দশক থেকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন পরিবর্ত প্রবাহ (অল্টারনেটিং কারেন্ট)-র বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে শুরু করেছিল।[৫০] ধীরে ধীরে শহর কলকাতায় গৃহস্থ ও পথবাতির ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বিদ্যুতের গ্রাহক বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে গ্রাহকের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক তারের (কেবল) ব্যবহারও সমান্তরাল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একথা ভুললে চলবে না বর্তমান দিনে বিদ্যুতের ব্যবহার আমাদের কাছে যতটা সহজবোধ্য এক বিষয়, বিংশ শতকের শুরুর দিকে তা একেবারেই ছিল না। যার ফলস্বরূপ গৃহস্থ বাড়িতে বা রাস্তায় মানুষ বিদ্যুৎ সম্পর্কিত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলিতে থেকে জানা যায় যে বিদ্যুতের বর্ধিত ব্যবহার

ক্রমশ বিদ্যুৎ সম্পর্কিত নানা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করেছিল। এই দুর্ঘটনাগুলি কিন্তু বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল এবং বলা বাহুল্য এই সমস্যা কর্পোরেশনের আধিকারিকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৎকালীন সময়ে 'দি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান ফর উইমেন'-এর অধিকর্ত্রী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ কেরোলাইন হ্যাসলেট, এই বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাবলীর সুরক্ষার বিষয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তার সুনিশ্চিত মতামত রাখেন। তিনি বেশ কিছু সুরক্ষা পদ্ধতি ও সেই সংক্রান্ত পাঠ-এর উপযোগিতা সকলের সামনে তুলে ধরেন।[৫১] শুধুমাত্র গৃহস্থ বাড়িতেই নয়, রাস্তাঘাটেও মানুষ বিদ্যুৎজনিত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল বলে জানা যায়, যেমন ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল লোয়ার সার্কুলার রোডের নিকট চৌরঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। প্রবল ঝড় বৃষ্টির জন্য মাথার উপরে থাকা ট্রামের বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে এই বিপত্তি ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।[৫২] অর্থাৎ বিদ্যুতশিল্প যে সাধারণ মানুষকে নিরঙ্কুশ সুবিধা দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও, বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানা না থাকলে সেটি যে প্রাণঘাতী হতে পারে তা প্রতি মুহূর্তে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এই সকল প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে গিয়ে ১৯৪৬ সালের জুন মাসে স্থপতি স্যার ওয়েন উইলিয়ামস, লন্ডন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় বার্তা দেন যে কলকাতায় এক সুবৃহৎ অট্টালিকা তৈরি করা হবে, যার সমস্ত জানালা স্বয়ংক্রিয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত হবে। এই ঘটনা ভারতীয় বিদ্যুতশিল্পের জন্য এক নিদারুণ খুশির ও অগ্রগতির পরিচায়ক ছিল।[৫৩] অপরদিকে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চুক্তি পরবর্তী ২০ বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে কর্পোরেশন আগের মতই কলকাতা ও পূর্ব নির্ধারিত সীমানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা নিজেদের অধীনস্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই নতুন চুক্তি নিয়ে তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে

থেকে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, এই দুইটি বড় ব্রিটিশ কোম্পানির জাতীয়করণের দাবি উঠতে থাকে। সাধারণ মানুষের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্পোরেশনও চেয়েছিল এই সংস্থাগুলিকে নিজের অধীনস্ত করতে, কিন্তু কিছু অজ্ঞাত কারণবশতঃ তা সম্ভবপর হয় ওঠেনি।[৫৪] অনতিবিলম্বে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের জাতীয়করণের প্রশ্নকে সামনে রেখে পাবলিক ইউটিলিটিস অ্যান্ড মার্কেটস স্টান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সি.ই.এস.সি এই কমিটির সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। এই কমিটির প্রধান মনোনীত হয়েছিলেন স্যার অশোক রায় এবং তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন শ্রী কল্যাণ কুমার বসু। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশনের আইনত কি কি অবকাশ এবং প্রতিবন্ধকতা ছিল, তার বাস্তবিক গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে রিপোর্ট দেওয়া।[৫৫] ১৯৪৭ সালের শুরুতেই তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ সালে তৎকালীন বাংলার বাণিজ্যমন্ত্রী সামসুদ্দিন আহমেদ নিজে এই সংবাদ দিয়েছিলেন। এই পুরো প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য ভারত সরকারের ইলেকট্রিক্যাল কমিশনার শ্রী এইচ.এম. ম্যাথিউস এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এই বোর্ড উপভোক্তাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে, বেশ কিছু বিষয় সুপারিশ করে এবং পরবর্তীকালে যে কোনো ধরণের চুক্তির সাথে এই সকল বিষয়গুলি বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দিয়েছিল।[৫৬] এইরূপ সিদ্ধান্তের পিছনে ভারত সরকারের বিদ্যুতশিল্পের সাথে জড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির জাতীয়করণের উদ্যোগের প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। যেমন- ৫ই অক্টোবর ১৯৪৬ সালে, পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (বর্তমানে পাকিস্তান) অধিগ্রহণ,[৫৭] ১৯৪৮ সালের মধ্যে সিন্ধ সরকার কর্তৃক লারকানা ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশন

অধিগ্রহণ,[৫৮] মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মাদ্রাজ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন অধিগ্রহণ[৫৯] এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার কৌনপুর (কানপুর) ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন অধিগ্রহণ করে।[৬০] অর্থাৎ এই কথাটা একেবারেই স্পষ্ট যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুতশিল্পগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে এইরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ১৯৪৭ এর শুরুর দিকে তাদের ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করে। পারিষদ শ্রী পি.এস.বসু এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন ও এই মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা করেছিলেন।[৬১] ১৯৪৭ এর অক্টোবর মাসেও সি.ই.এস.সি পুনরায় সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যুতের বর্ধিত বিল চাপিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের ১৯শে নভেম্বর, কর্পোরেশন মিটিংয়ে পারিষদ এইচ. কে. গাঙ্গুলি বিষয়টি উল্লেখ করে তৎকালীন মেয়র শ্রী সুধীর চন্দ্র রায় চৌধুরীকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পারিষদ শ্রী আনন্দ লাল পোদ্দার, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বদল করতে সুপারিশ করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করার আগে কলকাতা কর্পোরেশনের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অনুমতি নিতে বাধ্য থাকে।[৬২] অপরদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, দেশজুড়ে বিদ্যুতশিল্পগুলির জাতীয়করণের এই হাওয়া বিদ্যুতশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। সরকার অনুধাবন করেছিল যে, বিদ্যুতায়ন শুধুমাত্র গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নয়, পাশাপাশি এটি শিল্প বিস্তারে সহায়ক, নাগরিক স্বাছন্দ্যের এবং পথচারীদের নিরাপত্তার সাথেও এটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। নাগরিক স্বাছন্দ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য পরিকল্পিত শহরের মতই কলকাতাতেও পথবাতি-র উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় পথবাতির সংখ্যা ছিল সীমিত যা তৎকালীন কলকাতা

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কলকাতার রাস্তাগুলিকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্বের নিরিখে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে এবং উন্নত মান ও প্রযুক্তির আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করেছিল। কলকাতা কর্পোরেশনের বৈদ্যুতিক বিভাগের পরিদর্শক শ্রী শচীন্দ্র কুমার দাসের উপস্থিতিতে রাস্তায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গ্যাসের বাতি ও বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে এক প্রতিযোগিতা হয় যাতে বৈদ্যুতিক বাতি সহজেই জয় লাভ করে এবং এককালীন খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রস্থিত বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক খরচা বেশি হলেও একটি হিসাব প্রকাশিত হয় যে এই নতুন আলোকব্যবস্থায় শুধুমাত্র একটি জেলা থেকেই বছরে প্রায় ৭২,৫০০ টাকা সাশ্রয় হবে এবং আলোকসজ্জাও পূর্বের তুলনাই পর্যাপ্ত পরিমাণে হবে। নতুন বিবেচিত আলোকসজ্জায় প্রথম বা 'এ' শ্রেণীর রাস্তাগুলি (যেমন- কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, সার্কুলার রোড, চিৎপুর রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ এবং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড) এবং দ্বিতীয় বা 'বি' শ্রেণির রাস্তা গুলিতে (যেমন – গ্রে স্ট্রীট, বাগবাজার স্ট্রীট প্রমুখ) ৩০০ ওয়াটের বাতি বিশিষ্ট আলোক স্তম্ভ এবং তৃতীয় বা 'সি' শ্রেণির রাস্তা গুলিতে ১০০ ওয়াটের বাতি ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।[৬৩]

ইতিমধ্যেই বাংলায় বিদ্যুতশিল্পে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশান যুক্ত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলার বিদ্যুতশিল্পের প্রায় পুরোটাই ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে নির্ভর করে। স্বাধীনতার কিছু পূর্বে কেন্দ্রীয় সহায়তায় ১৯৪৭ সালের ৭ই জুলাই দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের যেসকল নদীকেন্দ্রিক প্রকল্প গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ছাড়া প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পরিচালনার অন্তর্গত ছিল। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি স্বশাসিত পরিচালন সমিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

এটিই ভারতের একমাত্র বহুমুখী নদীপরিকল্পনা যা আমেরিকার টেনেসী ভ্যালি অথরিটিকে আদর্শ করে স্থাপন করা হয়। ১৯৪৩ সালে একটি কমিটি এই প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। ওয়ার্কস, মাইনস অ্যান্ড পাওয়ার মন্ত্রকের শ্রী এন. ডি গাড়গিল এর মন্ত্রীত্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ত্রিমুখী লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বিল পাস হয়েছিল। এই সংস্থার নীতি নির্ধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেও, প্রাত্যহিক প্রশাসনিক কাজ নির্বাহের দায়িত্ব কর্পোরেশনের নিজের হাতেই ছিল। সরকার যেহেতু কর্পোরেশনের কাজে হস্তক্ষেপ করত না তাই এই কর্পোরেশনের কাজে গতি ছিল। এই ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল যেহেতু দামোদর নদ ২টি ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তাই একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, স্বশাসিত পরিচালন সমিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, যাতে দুটি রাজ্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বা আভ্যন্তরীণ চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠে প্রকল্পটি সঠিকভাবে চালনা করা সম্ভব। বাংলা ও বিহারের এক অন্যান্য সম্প্রীতির নজির হল দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন।[৬৪] ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর প্রবর্তিত হয় ‘ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই অ্যাক্ট’ ১৯৪৮ নামক স্বাধীন ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ আইন। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত অন্য সব জায়গায় এই আইন কার্যকরী ছিল এবং এর মাধ্যমেই বিদ্যুতশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের পথ প্রশস্ত হয়, যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল রাজ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।[৬৫] এই আইনের উপর ভিত্তি করেই ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ স্থাপিত হয়েছিল।

ঔপনিবেশিকদের হাত ধরে ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষদিকে বাংলায় বিদ্যুৎ শক্তির আগমন। শুরুর দিকে কলকারখানাগুলিতে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় বড় প্রতিষ্ঠান (যেমন- ফোর্ট উইলিয়াম, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রমুখ) ও গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের

সংযোগ দেওয়াই তুলনামূলক সহজ পথ ছিল। শুরুর দিকে বিদ্যুতের প্রতি ভয়মিশ্রিত বিস্ময় থাকলেও ধীরে ধীরে মানুষ বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্রমে বিদ্যুতের আগমনের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে আধুনিকতার স্পর্শ লাগে। এই আধুনিকতা কিছুটা পাশ্চাত্যের অনুকরণে হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে তা যে শুধু স্বেচ্ছায় ছিল তা নয়, খানিকটা বলপূর্বকও ছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়েছিল ঔপনিবেশিকদের রাষ্ট্রযন্ত্র। ঔপনিবেশিক আমলের বেশীরভাগ সময়েই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল। বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলি মূলত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পরিচালিত হত। মুনাফা অর্জন করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই সংস্থাগুলি কোনভাবেই সাধারণ মানুষকে ‘সেবা’-র উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল না। বাংলার বুকে সি.ই.এস.সি-র ক্ষেত্রেও এই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল (দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশান কাজ শুরু করেছিল ঔপনিবেশিক আমলের একেবারে শেষের দিকে)। নির্দ্বিধায় বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করতে না পারলে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা বা পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের পরিকল্পনা করেছিল। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালের ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট-র মাধ্যমে এই পরিকল্পনা আইনি সম্মতি

লাভ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের বিস্তারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল এই সংস্থার উপর কারণ বেসরকারি মালিকানাধীন সি.ই.এস.সি শুধুমাত্র কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারত। একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখা দরকার একটি বেসরকারি সংস্থা ও একটি সরকারি সংস্থা চরিত্রগত দিক থেকে কোনভাবেই এক হতে পারে না এবং এক্ষেত্রেও বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত সি.ই.এস.সি এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চরিত্র এক ছিল না। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত হওয়া রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মূল লক্ষ্যই ছিল যত বেশী সংখ্যক মানুষকে সুলভ মুল্যে বিদ্যুতের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখব যে কিভাবে সরকারি উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ

১. মীর নজাবৎ আলি, সুনীল কান্তি ধর অনুবাদিত; যেসব আবিষ্কারে দুনিয়া পাল্টে গেছে, (দ্বিতীয় ভাগ) ,(নিউ দিল্লী: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৯) পৃ-৩।

২. Daniel R. Headrick, The tools of empire, technology and European imperialism in the nineteenth century (New York: Oxford University Press, 1981), p-8.

৩. Satpal Sangwan, “Technology and Imperialism in the Indian context-The case of Steamboat 1819-39”, In ‘Science, Medicine and Cultural Imperialism,’ edited by Teresa Meade and Mark Walker (London: Macmillan, 1991), Pp. 60-74.

৪. Deepak Kumar, Science and the Raj-A study of British India, 2nd ed. (New Delhi: Oxford University Press, 2006), P-11.

৫. Michaeil Adas, Scientific Standards and Colonial Education in British India and French Senegal (London: Palgrave Macmillan), Pp. 4-35.

৬. Ian Macneil, An encyclopaedia of the History of Technology, ed. (London and New York: Routledge, 1990), Pp.1-5.

৭. Adam Allerhand, “Who Invented the Earliest Capacitor Bank (“Battery” of Leyden Jars)? It’s Complicated”, Proceedings of the IEEE, Vol. 106, No.3, (March, 2018): P-1, D.O.I. 10.1109/JPROC.2018.2795846.

৮. Eric J Hobsbawm, Industry and Empire-The Making of Modern English Society-1750 to present day, Vol.II (New York: Pantheon Books, 1968), p-56.

৯. নাগর্জ্জুন, “বেতারের ইতিহাস,” বিদ্যুৎ, প্রথম বর্ষ, (কার্তিক, ১৩৩৮): পৃ. ৪৬।

১০. Mcneil, An encyclopaedia of the History of Technology, p.356.

১১. Mcneil, An encyclopaedia of the History of Technology, p.357.

১২. Mcneil, An encyclopaedia of the History of Technology, Pp.358-60.

১৩. Mcneil, An encyclopaedia of the History of Technology, p.365.

১৪. BBC in Pictures: The Lit& Phil; retrieved news.bbc.co.uk/local/tyne/hi/people-and-places/history/newsid_8180000/8180513.stm.

১৫. Mcneil, An encyclopaedia of the History of Technology, pp. 365-70.

১৬. K. V. Gopalakrishnan, Inventors who revolutionised our lives (New Delhi: National Book Trust, 1999), Pp. 87-92.

১৭. George Basalla, “The Spread of Western Science,” Science, Vol.156, No. 3775,1967, Pp. 611–620.

১৮. Nupur Dasgupta, “A Scientist in the world of Indology- Initiation of the New Chapter on Pre Modern History of Science in India,” In ‘Essays in History of Science and Technology and Medicine,’ edited by Nupur Dasgupta and Amit Bhattacharyya (Kolkata: Setu Prakashani, 2014), p-2.

১৯. Deepak Kumar, Patterns of Colonial Science in India, IJHS, 15 (1), (May, 1980): Pp.105-6.

২০. S Irfan Habib, “Engaging with Modern Science and religious orthodoxy in contemporary Islam,” In ‘Essays in History of Science and Technology and Medicine,’ edited by Nupur Dasgupta and Amit Bhattacharyya (Kolkata: Setu Prakashani, 2014), Pp.105-107.

২১. ‘ইঞ্জিনিয়ার’ শব্দটির উৎপত্তি জেমস ওয়াটের পরবর্তী সময়ে এবং আক্ষরিক অর্থ হল বাষ্পীয় কল প্রস্তুতকারক। বিস্তারিত- Amitabha Ghosh, Some Eminent Indian Pioneers in the field of Technology, Indian Journal of History of Science, Vol-29, No.1 (1994), Pp. 63-75.

২২. তদেব, Pp. 63-75.

২৩. Suvobrata Sarkar, “Domesticating Electricity: Growth of Industry, Utilities and Research in Colonial Calcutta,” The Indian Economic and Social History Review 52, No.3 (2015): P-359.

২৪. Suvobrata Sarkar, Let there be Light: Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1945 (India: Cambridge University Press, 2020), P-125.

২৫. Sandhya Madan, Sweta Manimuthu, Dr. S Thiruvengadam, “History of Electric Power in India, 1890-1990,” IEEE (2007): Pp-154-158.

২৬. তদেব, Pp-154-158.

২৭. অমিতাভ রায়, বাংলার বিদ্যুতশিল্প-ব্যবস্থার বিবর্তন (কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশান লিমিটেড, মে ১৯৯৩), পৃ- ১৬-২২।

২৮. তদেব, পৃ-৩৩।

২৯. জিতেন্দ্রনাথ রায়, বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫), পৃ-১৫০-১৫৭।

৩০. Soumitra Das, "Let there be light," The Telegraph, 26th April, 2009. Available at:- http://www.telegraph.com/1090426/jsp/Calcutta/story_10866828.jsp.

৩১. সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলের শহর কলকাতা, (কলিকাতা: বোধি প্রেস, রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১৪-১১৭।

৩২. Suhrid Sankar Chattopadhyay, "Hotel with a history," Frontline, Vol-22, Issue-17, Kolkata, (26 August, 2005).

৩৩. ঘোষ, কলের শহর কলকাতা, পৃ-১১৪-১১৭।

৩৪. 'Story of Electricity in the city of Calcutta', A 48 page profusely illustrated brochure published by Calcutta Electric Supply Corporation (India) Limited, Kolkata, December 1989, P-5.

৩৫. শুভদীপ দাস, "কলকাতার বিদ্যুতায়ন ও পরিবেশ দূষণ : ইতিহাসের আলো আঁধারি," নেওয়া হয়েছে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস ভবিষ্যতের সন্ধান: অতিমারি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশ,' শুভঙ্কর দে সম্পাদিত, (বারুইপুর: পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০২০), পৃ-৯১।

৩৬. Arun Kumar, "Amidst UK heatwave, a reminder of how British colonials exploited 'punkah-walas' in India's summers," Scroll. In, Online Published: 21st July 2022, available at:

https://scroll.in/article/1028513/amidst-uk-heatwave-a-reminder-of-how-british-colonials-exploited-punkah-walas-in-indias-summers

৩৭. ঘোষ, কলের শহর কলকাতা, পৃ- ১২২।

৩৮. পূর্ণিমা দেবী, শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলকাতা: সাহিত্য ভারতী,২০১২), পৃ-১২।

৩৯. Suvobrata Sarkar, "Domesticating Electricity; Growth of Industry, Utilities and Research in Colonial Calcutta," The Indian Economic and Social History Review, 52 (3), P-361.

৪০. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, (কলিকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৮০), পৃ- ১৮৪।

৪১. প্রাঞ্জল নন্দী, "শহর কলকাতার সমাজে ট্রাম," নেওয়া হয়েছে 'ভারতের সামাজিক ইতিহাসঃ অনূর্ধ্ব ৩০-র কলমে,' শুভঙ্কর দে সম্পাদিত (কলকাতা: আবিষ্কার, ২০১৬), পৃ-৮৪।

৪২. মিত্র, কলিকাতা দর্পণ,পৃ- ১৮৫।

৪৩. নন্দী, শহর কলকাতার সমাজে ট্রাম, পৃ-৮৪।

88. 'Story of Electricity in the city of Calcutta,' পৃ- ১৩।

৪৫. K. K. Bose, "History & growth of power supply in Calcutta area," IEEE-IERE Proceedings- India, Volume-12, Issue: 4 (July-August, 1974), P-148.

৪৬. Journal of the Institution of Civil Engineers, Volume 15, Issue 4 (February, 1941): Online Published: 5th June, 2015, https://doi.org/10.1680/ijoti.1941.14251.

৪৭. B. Rajender and G. K. Lieten, 'The Sovereign Power of Philips in India,' Social Scientist, Vol-13, No-3 (March, 1895): Pp-50-55.

৪৮. Sarkar, "Domesticating Electricity", P-371-72.

৪৯. রায়, বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস, পৃ-১৫৮-৫৯।

৫০. Gautam Gupta, "Calcutta's Power Supply," In 'Calcutta The Living City, Vol-1: The Present and Future,' edited by Sukanta Chaudhuri (Calcutta: Oxford University Press, 1990), P-128.

৫১. The Safety Minded, "Safety in Fires, Gas and Electricity," The Calcutta Municipal Gazette, Safety First Supplement, Vol No. XLVIII, No.-12, Calcutta (23rd February, 1946): Pp-22-24.

৫২. Anonymous, "Death by electrocution," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No- XLVIII, No-19, Calcutta (13th April, 1946): P-516.

৫৩. Anonymous, "A Mammoth Mansion for Calcutta," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLIV, No-1, Calcutta (1st June, 1946): P-11.

৫৪. Anonymous, "Calcutta Electric Supply Corporation; to continue for another 20 years," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLIV, No-6, Calcutta (6th July, 1946): P-158.

৫৫. Anonymous, "Calcutta Electric Supply Corporation," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLIV, No-9, Calcutta (27th July, 1946): P-252.

৫৬. Anonymous, "Calcutta Electric Supply Corporation, Bengal Government Decision For Purchases," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLV, No-7, Calcutta (18th January,1947): P-174.

৫৭. Anonymous, "Lahore Electric Supply Company," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLIV, No-13-16, Calcutta (24th August-19th Sep, 1946): P-389.

৫৮. Anonymous, "Nationalization of Electrical Service; A Worldwide Move," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLV, No-7, Calcutta (18th January, 1946): P-174.

৫৯. Anonymous, "Madras Electric Supply Corporation," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLV, No-9, Calcutta (1st February, 1947): P-249.

৬০. Anonymous, "Cownpore Electric Supply Corporation taken over by Uttar Pradesh Government," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLVI, Nos-16-19, Calcutta (6th-27th September,1947): P-175.

৬১. Anonymous, "Enhancement of Electricity Rate," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLV, Nos-9, Calcutta (1st February, 1947): P-238.

৬২. Anonymous, "Increase in Electricity Bills," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLVI & XLVII, Nos-24 & 1-2, Calcutta (19th November, 1947): P-176 (e).

৬৩. Sachindra Kumar Das, "Better Street Lighting for Calcutta," The Calcutta Municipal Gazette, Calcutta (1947): Pp-77-79.

৬৪. Devi Sarkar Ganguly, Public corporations in a National Economy (With special reference To India) (Bookland Private Ltd, 1963), Pp-12-18.

৬৫. The Electric (Supply) Act, 1948 as amended by THE ELECTRICITY LAWS (AMENDMENT) ACT, 1998, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., Delhi, P-1.

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার

লন্ডনে বিদ্যুতের আবির্ভাবের এক যুগের মধ্যেই ভারতে বিদ্যুতের ব্যবহারের সূত্রপাত হলেও বাস্তবিকভাবে ভারতে বিদ্যুতশিল্পের বিকাশ স্বাধীনোত্তর পর্বে গতি পেয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ১৩৬৩ মেগাওয়াট এবং মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩২৮৭ মেগাওয়াট। উৎপাদন ক্ষমতা ৪.১ বিলিয়ন ইউনিট থেকে ৩৭৯.৭ বিলিয়ন ইউনিটে পৌছেছিল। স্বাধীনতার পূর্বে বিদ্যুতশিল্পে সরকারি প্রচেষ্টা একেবারেই নগণ্য ছিল। স্বাধীনতার কিছু আগে থেকেই সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু জায়গায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে থাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে অধিগ্রহণ করার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাব সরকার ১ কোটি টাকা নগদের বিনিময়ে, স্বর্গীয় হারকিষণ লাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করেছিল (বর্তমানে পাকিস্তানে)।[১] মাদ্রাজ সরকারের প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ে, ১৯০৬ সালে অবস্থিত ১০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড মূলধনসম্পন্ন ব্রিটিশ মালিকানাধীন মাদ্রাজ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চুক্তি ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে শেষ হয়ে গেলে, সেটি পুনঃনবীকরণ না করে এই সংস্থা অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[২] এই সময়ে সিন্ধ সরকারও, লারকানা ইলেকট্রিক কর্পোরেশন অধিগ্রহণের সিধান্ত নিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলির ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়।[৩]

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম স্বাধীন সরকার গঠন করে। এর এক বছরের মধ্যেই ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সালে প্রবর্তিত হয় ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই অ্যাক্ট, ১৯৪৮। জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া

ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের এই আইন কার্যকরী ছিল। বিদ্যুতশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের কথা এই আইনের মাধ্যমে বলবৎ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্য ভিত্তিক বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানিগুলির নতুন করে কোন বিস্তার না ঘটানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যগুলির মধ্যেকার সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং 'গ্রীড' ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন।[৪] বিদ্যুতায়নের বিষয়টি কোনোভাবেই শুধুমাত্র রাজ্যের বিষয় নয়, সেটি অনেক বেশি রাজ্য এবং কেন্দ্রের সহগামী একটি বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়।[৫] এই আইন প্রণয়নের পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১লা মার্চ, সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। ইলেকট্রিক্যাল কমিশন, ভারত সরকার এবং সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ডের একত্রীকরণ হয়ে এই সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি কমিশন গঠন হয়েছিল। এই কমিশনের মূল দায়িত্ব ছিল রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্ক রেখে দেশের যাবতীয় বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনা ও বিদ্যুতশিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা। মূলত চারটি বিভাগ নিয়ে এই কমিশন গঠিত ছিল, যথা- পরিকল্পনা, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক বিভাগ। পরিকল্পনা বিভাগের কাজ ছিল যাবতীয় ধরনের পরিকল্পনা রূপায়ণ। পরিকল্পনা বিভাগের মধ্যে দুটি বিশেষ ভাগ ছিল একটি হল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কিত এবং অপরটি হল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কিত। ব্যবহারিক বিভাগের অধীনে ছিল গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন বিষয়টি। বাণিজ্যিক বিভাগের অধীনে ছিল যাবতীয় আর্থিক তথ্য এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় অবগত করার বিষয়টি। ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট এবং তার অধীনস্থ আইনগুলি যথাযথ বাস্তবিক প্রয়োগের বিষয়টিও এই বিভাগে অধীনস্থ ছিল। প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে কমিশনের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখভাল করা হত।[৬] সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি কমিশন গঠিত হওয়ার

পরে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ থেকে সমস্ত গ্রেডের যাবতীয় প্রযুক্তিগত সহায়ক (টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) পদগুলিকে সহকারি ইঞ্জিনিয়ার পদে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।[৭]

ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় বাংলার ক্ষেত্রে বিদ্যুতশিল্পের অবস্থা অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় স্থিতিশীল ছিল। ১৯৩৫ সালের বাংলা দশম আইনের সংশোধনীতে বিদ্যুতশুল্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। এই সংশোধনীতে বলা হয় যে, যদি আলো ও পাখা অথবা দুটি চালানোর উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ লাইসেন্সের নেটচার্জ প্রতি ইউনিট শক্তির জন্য তিন আনার বেশি না হয়, তবে প্রতি মাসে ১৫ ইউনিট ব্যবহার হলে কোন অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে না। ১৫ থেকে ৫০ ইউনিটের বেশি না হলে প্রতি ইউনিটের জন্য ৭ পয়সা করে এবং ৫০ ইউনিটের বেশি ব্যবহার হলে প্রতি ইউনিটে এক আনা করে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে।[৭] ক্রমশ বিদ্যুতশিল্পের বিকাশের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। দেখা যায় যে ১৯৪৮-৪৯ সালে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন শিল্পে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছিল।[৮] ১৯৪৭-৪৮ সালের মার্চ মাস অবধি উত্তর কলকাতা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ৪ লক্ষ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ২১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য, শ্রমিক ও শিল্প দপ্তর কর্তৃক স্কীম নম্বর-৫৫ডি (নিউ) ডিজেল ইলেকট্রিক পুল নামক একটি নতুন প্রকল্প গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশকিছু নতুন উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করে যার মধ্যে ডিজেল ইলেকট্রিক পুলের ধারণা এক অভিনব পদক্ষেপ। এই নীতিগুলি রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে সুপারিশের জন্য পাঠানো হয়। উত্তর কলকাতা বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল গৃহস্থ ও শিল্পক্ষেত্রের ক্রেতাদের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা এবং তা করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে

পারে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এই মধ্যবর্তী সময়ে প্রকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে কিছু সংখ্যক গৃহস্থ ও শিল্প ক্ষেত্রে ডিজেল জেনারেটর সেটের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদাপূরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বিদ্যুতের চাহিদা কিছুটা বাড়ার সাথে সাথে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। ট্রান্সমিশন সিস্টেম চালু হওয়ার পরে এই জেনারেটিং সেটগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। রানাঘাট, কালনা, শান্তিপুর এলাকার শহরগুলিতে প্রাথমিকভাবে এর সূত্রপাত করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করা এবং যতদিন দরকার ততদিনই চালু রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কর্মচারী হিসেবে পরিদর্শক, ফোরম্যান, সংরক্ষক, মিস্ত্রি ,দারোয়ান এবং ইঞ্জিন চালকের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। মনে করা হয়, প্রকল্পের বার্ষিক প্রাপ্তি থেকে তৃতীয় বছরে এই প্রকল্পের রূপায়ণের সমতা রক্ষা করা এবং ষষ্ঠ বছরে প্রকল্পের প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ মেটানো সম্ভব হবে। এই প্রকল্প পরোক্ষভাবে বেশ লাভজনক হবে বলেই মনে করা হয় এবং এই জন্য পরবর্তীকালে বিদ্যুতের বৃহৎ ও ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ কিছুটা সাশ্রয় পাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ও প্লান্ট তৈরির জন্য বিদেশী সাহায্য ছাড়াও কৃষি দপ্তর, জনস্বাস্থ্য দপ্তরের অংশগ্রহণ করার কথা বলা হয়। কোন বৃহৎ পরিসরে শ্রমিকদের অধিগ্রহণের কথা এই প্রকল্পে বলা হয়নি। প্রকল্পের উপাদান, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে কোনও সাহায্য নেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে বৃহৎ পরিসরে প্রকল্পটি কিভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়েও রিপোর্টে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। অতিরিক্ত জেনারেটর সেট উপলব্ধ হলে, অন্যান্য দপ্তরের উন্নয়নশীল নির্মাণ কাজের জন্য ডিজেল ইলেকট্রিক পুলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ যোগানের কথা বলা হয়েছিল।[৯] এই প্রকল্পটি

কিন্তু কোন বৃহৎ প্রকল্প ছিল না, বরং এটি অনেক বেশী বাস্তবসম্মত অভিযোজিত এক ব্যবস্থা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জল, সেচ ও খাল বিভাগের চেয়ারম্যানকে পত্র মারফত জানান যে, ভারতবর্ষে বৃহৎ নদী পরিকল্পনা গুলিতে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করা ইত্যাদিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলেও এই প্রকল্পগুলি নির্মাণ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। ভারতের খাদ্য উৎপাদনের সাফল্যের দিকে একান্তই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য ছোট ছোট প্রকল্প রূপায়ণের দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত যা থেকে খুব সহজে ও কম সময়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। তাঁর মতে এই ছোট প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের ফলে সামাজিক দিক দিয়ে বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন করা সম্ভবপর হবে।[১০] অপরদিকে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি কমিশন গঠিত হওয়ার পরে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ থেকে সমস্ত গ্রেডের যাবতীয় প্রযুক্তিগত সহায়ক (টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) পদগুলিকে সহকারি ইঞ্জিনিয়ার পদে রূপান্তরিত করে।[১১] পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের ৩০৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোন রাজ্যের বিদ্যুৎ আইনের পরিবর্তন বা যে কোন উন্নতি সাধনের জন্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির অনুমতি প্রয়োজন। যেমন মধ্যপ্রদেশের প্রচলিত বিদ্যুৎ বিল ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাতিল হয়ে যাওয়ার দরুণ মধ্যপ্রদেশ সরকার পুনরায় নতুন বিদ্যুৎ আইনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করে।[১২]

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্প এই সময় প্রায় পুরোটাই ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে নির্ভর করে। স্বাধীনতার কিছু পূর্বে কেন্দ্রীয় সহায়তায় ১৯৪৭ সালের ৭ই জুলাই দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে যেসকল নদীকেন্দ্রিক প্রকল্প গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ছাড়া প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পরিচালনার অন্তর্গত ছিল। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি স্বশাসিত পরিচালন সমিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটিই ভারতবর্ষের একমাত্র বহুমুখী নদীপরিকল্পনা যা আমেরিকার টেনেসী ভ্যালি অথরিটিকে আদর্শ করে স্থাপন করা হয়। ১৯৪৩ সালে একটি কমিটি এই প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য স্থাপিত হয়। ওয়ার্কস, মাইনস অ্যান্ড পাওয়ার মন্ত্রকের শ্রী এন.ডি গাড়গিল এর মন্ত্রীত্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ত্রিমুখী লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বিল পাস হয়। নীতি নির্ধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেও, প্রাত্যহিক প্রশাসনিক কাজ নির্বাহের দায়িত্ব কর্পোরেশনের নিজের, সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। সরকার যেহেতু কর্পোরেশনের কাজে হস্তক্ষেপ করত না তাই এই কর্পোরেশনের কাজ দ্রুতগতিতে হত। এই ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যেহেতু দামোদর নদ ২টি ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তাই একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, স্বশাসিত পরিচালন সমিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, যাতে ভিন্ন রাজ্যের দ্বন্দ্ব বা আভ্যন্তরীণ চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠে প্রকল্পটি সঠিকভাবে চালনা করা সম্ভবপর হয়। বাংলা ও বিহারের এক অন্যন্য সম্প্রীতির নজির হল দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন।[১৩] এই কর্পোরেশন, দামোদর উপত্যকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভারী শিল্পের কারখানাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করত। ইস্টার্ন কোলফিল্ড, ভারত কুকিং কোল লিমিটেড, সেন্ট্রাল কোল ফিল্ডস লিমিটেড এর মতন কয়লাখনি, বোকারো ষ্টীল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর অ্যালয় ষ্টীল প্ল্যান্ট, টাটা আয়রন ও ষ্টীল প্ল্যান্ট, বিহার অ্যালয় ষ্টীল, পাত্রাতু ইস্পাত কারখানা এছাড়াও রেল, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটীভ ওয়ার্কস, হিন্দুস্তান কেবল, টেলকো প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারখানায় কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ১৯৪৯ সালে দামোদর পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজের বর্ণনা করতে গিয়ে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের সদস্য শ্রী ফুলনপ্রসাদ বর্মা এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯৫৩ সালের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণের কাজে

সময়মত শেষ করতে না পারার ফলে সামগ্রিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও সময়ের প্রয়োজন বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিলম্ব, দেশের অতিরিক্ত সম্পদ বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি হবে বলেও তিনি জানান। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বোকারোতে ২০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সক্ষম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় মার্কিন কোম্পানির সাথে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন চুক্তিবদ্ধ হয়। এই কোম্পানি, ১৯৫২ সালের মধ্যে, ৪২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কর্পোরেশনকে সরবরাহ করবে বলে জানা যায়। এর পাশাপাশি জনসাধারণের কাছে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি বন্টনের লাইন ও বন্টন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তিলাইয়া ও কোনার বাঁধ নির্মাণের জন্যও এক বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে। তিনি আরও জানান যে, নির্মাণকার্যের গতি হ্রাস করলে মোট খরচ প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকবে।[১৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিকাশের জন্য ১৯৪৮ সালে ইলেকট্রিসিটি ডেভেলাপমেন্ট ডাইরেক্টরেট নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সংস্থার অধীনে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ পরিবহন এবং বিদ্যুৎ বণ্টনের দায়িত্ব ছিল। এই সংস্থা ৯০% অস্থায়ী কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল।[১৫] অপরদিকে স্বাধীনতার পূর্বেই নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিরেক্টররা তাদের অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিকাশের সম্ভাবনা জরিপ করিয়েছিল। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, কর্পোরেশনের মোট বিদ্যুৎ চাহিদাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল, যথা-

মূলাজোড়, কাশীপুর ও বজবজ। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ অনুসারে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যুতের ক্রমবর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য নতুন উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের বাড়তি ঝামেলার বদলে কাশিপুরের পুরানো উৎপাদনকেন্দ্রটির আধুনিকীকরণ করা অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত ছিল। অবশেষে স্বাধীনতার পর আট কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৫০ সালে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নিউ কাশীপুর জেনারেটিং স্টেশনের কাজ শেষ হয়।[১৬] ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রদেশপাল শ্রী কৈলাস নাথ কাটজু ঐ উৎপাদনকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন। কাশীপুরে নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, কলকাতার জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলে রাজ্য সরকার ছোট ছোট শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন যে, উন্নয়নের পর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিন আর নেই, বর্তমানে এটাই সত্যি যে যেখানে শক্তি বা বিদ্যুৎ থাকবে সেখানেই আলোক ও প্রগতি তাকে অনুসরণ করবে। তিনি আরও বলেন যে, হাওড়া থেকে আমতা লাইনের দিকে প্রায় দশ মাইল গ্রামীণ অঞ্চলে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে, ঐ অঞ্চলের নগরায়নে বিশেষ সুবিধা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির তৎকালীন সভাপতি স্যার জেমস ডোনাল্ড, বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টিকে নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত বিষয় বলে মন্তব্য করেন। তার কথা থেকে জানা যায়, এই উৎপাদন কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে মোট ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই কেন্দ্রের সরবরাহ শক্তি বর্তমানে ২ লক্ষ ১০ হাজার কিলোওয়াট যা প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তীকালে বাড়ানো সম্ভব।[১৭] আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান ১৯১২ সালে কলকাতায় মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছিল যা ১৯৪৭ সালে ৬০ কোটি এবং এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে এই ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে প্রায় ৭২ কোটি ইউনিটে পরিণত হয়েছে।[১৮]

দেশভাগ ভারতবর্ষকে যেমন দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি-জনিত সমস্যায় জর্জরিত করেছিল তেমনই দেশভাগের ঋণাত্মক প্রভাব বিভিন্নভাবে পাকিস্তানেও অনুভূত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত, পাকিস্তানে কয়লা পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ঢাকা শহরে যুদ্ধের সময়কার নিষ্প্রদীপ অবস্থা ফিরে আসে। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা যায় যে ঢাকায় সর্বাপেক্ষা যে সময় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিকাল ৫.৩০ থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দোকানপাট, সিনেমা হল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করা যাবে না। পাশাপাশি ক্লাব, গ্রন্থাগার ও হোটেলে যতটা সম্ভব কম বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানোর অনুরোধ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তরফ থেকে করা হয়েছিল।[১৯] জানা যায় যে পূর্ববঙ্গ সরকার বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ রেশন করে দিয়েছে। পথবাতিগুলিও টিমটিম করে জ্বলছিল বলে জানা যায়। কয়লা ও বিদ্যুৎ শক্তির সামান্য যে সঞ্চয় অবশিষ্ট ছিল তা যতটা সম্ভব সঠিকভাবে বেশিদিন ব্যবহার করা যায় তার জন্যই পূর্ববঙ্গ সরকার বাধ্য হয়েছিল এই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।[২০] অর্থাৎ একথা বললে ভুল হবে না যে দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও বিদ্যুতের সমস্যা দেখা গিয়েছিল এবং বিদ্যুৎশক্তি ভারতবর্ষের কূটনৈতিক পররাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবাংলার বিদ্যুতশিল্পের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল কলকাতার অনতিদূরে নৈহাটির কাছে গঙ্গার ধারে অবস্থিত গৌরীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯৩২ সালে ১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত এই কেন্দ্রটি ১৯৫১ সালে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮.৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ইউনিট সংযোজন করে।[২১] উত্তর কলকাতা গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অধীনে ১৯৫১ সালের মধ্যে কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৫০০ বর্গমাইল অঞ্চলের মধ্যস্থিত গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় কলকাতা থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত শ্যামনগর সাবস্টেশন থেকে গ্রীডের সুইচ চালু করে এই প্রকল্পের সূত্রপাত করেন। এই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের জন্য আনুমানিক প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা খরচ বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তৎকালীন সময় অবধি প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী এই সকল গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছালে এই সকল অঞ্চলের কুটির শিল্প এবং পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে এবং ক্রমশ শহর ও গ্রামের মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।[২২] ১৯৩৩ সালে কার্শিয়াং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। গোয়েঙ্কা অ্যান্ড কোম্পানির উদ্যোগে নির্মিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৫৩ সালে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে। কার্শিয়াং শহর থেকে ৪ কিমি দূরে ফাজি রোডের উপর ৪৪৮ কিলোওয়াটের আরেকটি ইউনিট ঐ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংযোজিত হয়। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন নেপালের প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পদ্ম এম সুন্দর মাল্লা। দিলারাম চা-বাগানের কাছে বেলতারু নামক জায়গায় রিনচিংটন নদীর জলকে ফাজি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল।[২৩]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বা ১৯৪৭ এর পর সামগ্রিকভাবে এশিয়া মহাদেশের তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্য পরিকল্পনামাফিক উন্নয়নের পন্থা অবলম্বন করেছিল। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল নিরবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির যোগান। এশিয়ার সমস্ত দেশগুলি আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছিল।[২৪] স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতবর্ষের পরিকল্পনা ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ও তা পূরণের সময়সীমা নির্ধারণ করে বিনিয়োগ করা উচিত এবং

বিনিয়োগের লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা অত্যন্ত জরুরী ছিল। বিনিয়োগ এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে প্রাথমিকভাবে অর্থনীতি চাপের মুখে না পড়ে। তবে একথাও অস্বীকার করার জায়গা নেই যে শুরু থেকেই যদি নির্দিষ্ট কোন একটি খাতে বিনিয়োগ বেশী হয় তবে ভবিষ্যতে সেটি অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়। সরকারি পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয়েছিল জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ হবে এবং বাকি আয়ের বেশীর ভাগটাই শিল্প, কৃষি, পরিবহণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহৃত হবে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় দেখা যায় বা বলা ভাল উৎপাদন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, একটি হল 'মূলধন প্রধান' এবং আরেকটি হল 'শ্রমিক প্রধান'। তবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে এতটা সরলীকৃত করাও বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ উৎপাদিত পণ্যের উপর উৎপাদনপন্থা নির্ভর করে। ভারতের মত জনবহুল দেশে প্রচলিত প্রায় সব প্রযুক্তিই শ্রমিকপ্রধান, ভারতের মত দেশ যেখানে শ্রমিকের মজুরি কম সেখানে শ্রমিক বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভাবা হয়। সরকারি ক্ষেত্রে এই নীতি দেখা গেলেও বেসরকারি ক্ষেত্রে পুরোপুরি এরকম ছিল না, বরং শ্রমিক-অসন্তোষ, শ্রমিক ইউনিয়নের চাপ প্রভৃতি কমানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সহজভাবে বলতে গেলে বিনিয়োগ করা মূলধন দিয়ে উন্নতর প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি কেনা যায় এবং উৎপাদন থেকে যে আয় হয় তা থেকে প্রয়োজনীয় মজুরী দেওয়া যায়। উৎপাদনের সঙ্গে যেমন মূলধন বা শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তেমনিই বিভিন্ন উৎপাদনের মধ্যেও – 'পারস্পরিক সহযোগ' লক্ষ্য করা যায়। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার প্রয়োজন হয়। আবার কয়লা আনতে রেলপথ ও মালগাড়ী অপরিহার্য, অর্থাৎ এরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্যভাবে দেখলে দেখা যাবে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে তা অন্য শিল্পের উৎপাদন বাড়াতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ একটি শিল্পের উৎপাদন অন্য শিল্পে

উপাদান যোগায়। সর্বস্তরের শিল্পের উৎপাদন বাড়াতে যে সকল উপাদান সাহায্য করে বিদ্যুৎ তাদের মধ্যে অন্যতম। বিদ্যুতশিল্পের মত মৌলিক ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ বেসরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানায় মালিক শুধুমাত্র তার লাভ খুঁজবে, প্রয়োজনীয় উৎপাদন তার কাছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজের প্রয়োজন কোন ভাবেই তার বিবেচ্য নয়। এরূপ পরিস্তিতিতে দ্রুত উন্নতি এবং এর পাশাপাশি সামাজিক ও আর্থিক সমতা বজায় রাখতে হলে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে, উৎপাদন কাঠামো যদি ঢেলে সাজানো না যায় তাহলে শুরু থেকেই সরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থেকে যায়। আবার একথাও সত্যি যে ভারতের মত উন্নয়নশীল, তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি, বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো ছাড়া কোন উপায় নেই। ভারতের অর্থনীতির কাঠামো ছিল এই মিশ্র অর্থনীতি। কৃষিক্ষেত্রে তো বটেই শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানায় সম্মত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে ১৯৪৮-এর শিল্পনীতির মাধ্যমে এই মিশ্রনীতি ভিত্তিক পরিকল্পনার সূচনা হয়েছিল। এর পরে পরিকল্পনা কমিশন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত হতে দেখা যায়। এই শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শিল্পকে চার ভাগে ভাগ করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ব্যবস্থা করা। প্রথম শ্রেণিতে ছিল সেইসব শিল্প যেগুলির মালিকানা ও পরিচালনা পুরোটাই সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকবে, এর মধ্যে অন্যতম ছিল পরমাণুশক্তি। দ্বিতীয় বিভাগে সেইসব শিল্প ছিল যেগুলির সব উৎপাদন হবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। পূর্বের বেসরকারি উদ্যোগগুলি তাদের কাজ চালিয়ে যাবে তবে প্রয়োজন পড়লে সরকার যেকোন সময়ই এগুলিকে অধিগ্রহণ করার অধিকার রাখে। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল বিদ্যুৎ শক্তি। তৃতীয় পর্যায়ে ছিল সেইসব শিল্প যেগুলিতে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিন্তু এদের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার

থাকবে সরকারের হাতে, যেমন বৈদ্যুতিন যন্ত্রাদি। বাকি সব শিল্প ছিল চতুর্থ পর্যায়ে, যেখানে বেসরকারি উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ কোনটাতেই বাধা ছিল না। সরকার গৃহীত এই শিল্পনীতির সফল রূপায়ণের জন্য ১৯৫১ সালে 'শিল্প (উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' পাশ করা হয়েছিল। এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল রেজোলিউশন নম্বর -১(৩)-৪৪(১৩)-৪৮ এর মাধ্যমে গৃহীত শিল্পনীতির সঠিক রূপায়ণ। পাশাপাশি এই আইনে লাইসেন্সিং ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় যার মাধ্যমে একটি ন্যূনতম মূলধনের অধিক বিনিয়োগ করতে হলে, নতুন বা পুরানো উদ্যোগকে, ভারত সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। ১৯৪৮-এর ঘোষণা এবং ১৯৫১ সালের আইনের মাধ্যমে ভারতের মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। পরবর্তীকালে, ১৯৫৬ সালে শিল্পের এই চারটি পর্যায়কে পরিবর্তন করে তিনটি শ্রেণিতে পরিণত করা হয়েছিল। তারওপরে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি বাতিল না করলেও, ১৯৮০ সালে ঘোষিত শিল্পনীতিতে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়েছিল। বেসরকারি শিল্পপতিরা এরূপ পরিস্থিতিতে ঘুরপথে যেমন – সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত কয়লা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বাজারচলতি মূল্যের থেকে কম দামে পাওয়ার মাধ্যমে ভর্তুকি লাভ করেছিল।[২৫]

ইতিমধ্যে উন্নয়নের কর্মকান্ডে জোয়ার আনার জন্য সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশভাগের সমস্যা কিছুটা স্তিমিত হওয়াতে পরিকল্পনা কমিশন কাজ শুরু করে এবং ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কমিশন সরকারি বিনিয়োগের উপর জোর দিয়ে ২০৬৯ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়, যার মধ্যে ৩৮.৫% ব্যয়িত হবে কৃষি, গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন, বহুমুখী সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে। জলবিদ্যুৎ ছাড়া অন্যসব শক্তি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৬.১%। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে বহুমুখী সেচ প্রকল্প ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে

আলাদা ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ২.৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা বাড়িয়ে ৩.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও বাস্তবে ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে গিয়ে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছিল ৩.৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট।[২৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধান চন্দ্র রায় ১৯৫১ সালের ২৯ যে জুলাই ময়ূরাক্ষী বহুমুখী প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এই বহুমুখী নদী প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন।[২৭] ১৯৫৩ সালের ২৫শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বীরভূম জেলার ম্যাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ ও জলাধারের জল ব্যবহার করে ম্যাসাঞ্জোর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিটের মাধ্যমে এই প্রকল্প কাজ শুরু করে।[২৮]

এমতাবস্থায় পূর্বনির্ধারিত ও অনুমোদিত সনদ অনুযায়ী, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুতশিল্প নিয়ে তার মনোভাব স্পষ্ট করে এবং বিভিন্ন রাজ্য স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫৪ সালের ২রা জুলাই লন্ডনের ব্লুমসবেরি স্কোয়ারের ভিক্টোরিয়া হাউসে, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর ৫৭-তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই সভায় জানানো হয় যে গত বছরের তুলনায় সাধারণ গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫২ সালে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৫৮.৯ মিলিয়ন ইউনিট এবং ১৯৫৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬৬.৫ মিলিয়ন ইউনিট।[২৯] পাশাপাশি এই সময়ে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের সাথে ১০ বছরের জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই

কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়। নির্ধারিত হয় যে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন তার বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্য আরেকটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকট রিসিভিং স্টেশানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।[৩০] ১৯৫৫ সালের ২৩শে জুন লন্ডনে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্যার হ্যারি বার্ন জানান যে গত বছরের তুলনায় পুনরায় সাধারণ গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৩ সালে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৬৬.৫ মিলিয়ন ইউনিট এবং ১৯৫৪ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ১৭০.৮ মিলিয়ন ইউনিট।[৩১] শিল্পাঞ্চলগুলিতেও বিদ্যুতের চাহিদা নিজস্ব গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫৩ সালে চাহিদা ছিল ৬৪১.২ মিলিয়ান ইউনিট যা বেড়ে ১৯৫৪ সালে হয় ৬৯৯.৬ মিলিয়ান ইউনিট। নতুন রাস্তা গঠনের ফলে পথবাতির ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বর্ধিত চাহিদা স্বভাবতই কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।[৩২]

১৯৫৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৭৯ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল বলে জানা যায়। অনুমান করা হয়েছিল যে, ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের শেষ অবধি আরও প্রায় ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এবং ক্রমশ পরবর্তীকালে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর হবে।[৩৩] সংসদের পশ্চিমবঙ্গের সদস্যদের সাথে সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী গুলজারিলাল নন্দ রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। মাইথনে সাময়িক শ্রমিক অশান্তির জন্য কাজ থমকে থাকলেও ১৯৫৮ সালের মধ্যে দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে বলে জানানো হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে আরম্ভ হতে পারে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন ।[৩৪] ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনানুসারে রাজ্য সরকার, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কমিশনার শ্রী এস.কে. দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। ১৯৫৫ সালের ১লা মে থেকে এই পরিষদ কাজ আরম্ভ করবে বলে জানা গিয়েছিল। পরিষদের বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে শ্রী বিমল চন্দ্র সিংহ ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল।[৩৫] সমসাময়িক সময়েই ১৯৪৮ সালের বিদ্যুৎ আইন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কলকাতার ২নং হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীট ঠিকানায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন করেছিল। এই নবগঠিত পর্ষদের সভাপতি হন শ্রী ডি এন মিত্র। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন – শ্রী এ. কে. ভৌমিক, শ্রী এন. এন. মজুমদার, শ্রী বিমল চন্দ্র সিংহ, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক শ্রী এইচ. সি. গুহ, ডক্টর এন. দাস, শ্রী এস. কে. দে প্রমুখ।[৩৬] এই সময়েই ১৯৫৫ সালে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন-এর কাজ ধীরগতিতে এগোনো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের সম্পাদক শ্রী ক্ষেত্রপাল-এর আলোচনা হয়। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যার কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে কর্পোরেশনকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।[৩৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিদ্যুৎ শক্তির এক সুপরিকিল্পত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন। তার এই উদ্যোগের মধ্যে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিও ছিল। বিধান চন্দ্র রায় তাঁর এই ইচ্ছাপ্রকাশ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার বয়ান ছিল এইরূপ-

'During the last five years I have been putting up a network of electricity schemes in Bengal. The current is partly received from Damodar Valley Corporation, Partly from Mayurakshi and partly from the Calcutta Electric Supply Corporation. I have very nearly covered the whole of Southern Bengal including the rural areas. I did it with a purpose. I know that 70 per cent of the agriculturists in West Bengal have uneconomic holdings. I know also that the communists have got some hold on the rural areas because of this uneconomic position of the agriculturists. I have, therefore, planned to put up small industries and cottage industries to be served by power. Time has now come for me to put up these small units and I am doing so gradually but small industries can only be run as ancillary to large industries.'[৩৮] এই বয়ান থেকে স্পষ্ট যে বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতায়ন নিয়ে যথেষ্ট ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভবপর ছিল। বলা বাহুল্য, এই শিল্পোন্নয়নের মূল উপাদান ছিল বিদ্যুৎ শক্তি। শুধুমাত্র তাই নয়, বিদ্যুৎ, এই সময় রাজ্য রাজনীতির অংশও হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রাজনৈতিক জমি শক্ত করেছিল। এমতাবস্থায় রাজনীতিবিদ হিসাবে বিধানচন্দ্র রায় গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলে স্থানীয় মানুষদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন।

বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবাংলা জুড়ে গ্রীড ব্যবস্থা প্রচলনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে প্রাথমিকভাবে দুর্গাপুর শিল্পনগরী, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, ব্যান্ডেল ও সাঁওতালডিহি ছিল। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন-এর কাজ শেষ করা। ১৯৫৬-৫৭ সালে অবধি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের জন্য মোট যা

খরচ হয়েছিল তার মধ্যে ৫৮.৩৯ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করেছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ড্যাম, বোকারো এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শেষ হয়েছিল। যদিও তৎকালীন সেচমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জি স্বীকার করেছিলেন যে, যে হারে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বোকারো তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র পরিকল্পনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহী না হলেও ডঃ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই উৎপাদন কেন্দ্র বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে এক কোটি সাত লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল। এই সময়ে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সরকারকে বিরোধিতা করে জানিয়েছিল যে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, ২/৩ পয়সা প্রতি ইউনিট মূল্যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল। অথচ কলকাতার লোকেরা ইউনিট প্রতি দশ পয়সা দরে বিদ্যুৎ পাচ্ছে এবং কলকাতা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা ইউনিট প্রতি পাঁচ আনা দরে পাচ্ছেন। এখানে মনে রাখতে হবে স্থানীয় অঞ্চল ছাড়া ডিভিসি কিন্তু শুধুমাত্র বাল্ক লোড বা বড় গ্রাহকদেরই বিদ্যুৎ সরবরাহ করত, গৃহস্থবাড়িতে করত না। এছাড়াও তারা দাবি করেন যে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল, যার ফলে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা যেত। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন যে কলকাতায় তাপবিদ্যুৎ দশ আনা প্রতি ইউনিটে পাওয়া যায় আবার বর্ধমান অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ দশ আনা প্রতি ইউনিটের কমে পাওয়া যায় না অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি ও উপকারের যে কথা বলা হয়েছিল তা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল সেই নিয়ে সন্দেহ ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে করতে হবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে

তুলতে আধুনিক মানের প্রযুক্তির প্রয়োজন যা অত্যন্ত খরচবহুল এক প্রক্রিয়া ছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে এটি এক চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল।[৩৯]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, পশ্চিমবঙ্গের ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত শহর ও তিনশোর বেশী গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায়, চা শিল্পের জন্য যে নিরন্তর বিদ্যুৎ শক্তির যোগান প্রয়োজন তা মেটাতে উত্তরবঙ্গে জলঢাকা ও বালসুনা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এছাড়াও মেদিনীপুরের কাঁসাই অঞ্চলে একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং দুর্গাপুরে একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথাও পরিকল্পনা থেকে জানা যায়। জলঢাকা প্রকল্পে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ১৭০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। ৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম দার্জিলিং জেলায় বালসুনা প্রকল্পের জন্য দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সর্বোচ্চ ৪০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে প্রস্তাবিত দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটি এর মধ্যে সবথেকে বড় ছিল। ৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম এই পরিকল্পনার জন্য প্রায় চার কোটি টাকা ব্যায় বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই সময়ে ময়ূরাক্ষী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনাও আলোচিত হয়েছিল। প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় বলে জানা যায়।[৪০] উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়া অঞ্চলে এই সময়ে একটি ৫০ কিলোওয়াটের ডিজেল জেনারেটার সংস্থাপিত হয়। ১৯৫৫ সালের ১লা জুন, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের কালি পাহাড়িতে এবং ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র বার্ণপুর শহরের হিরাপুর ইস্পাত কারখানাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য, ৪৫ হাজার কিলোভোল্ট শক্তিযুক্ত একটি বৈদ্যুতিক শাখা কেন্দ্র চালু করে। দামোদর ভ্যালী

কর্পোরেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ই জুন ঘাটশিলার মুসাবনীর তাম্র খনি ও কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আরও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র চালু হবে।[৪১] রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের পর, রাজ্যের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ করা। ৮ই জুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বেসরকারি মালিকানাধীন সিউড়ি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী শংকর মুখার্জী, এই কোম্পানির পরিচালনার ভার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যেমন রাজ্যের বিদ্যুতশিল্প সংক্রান্ত নীতিকে বাস্তবায়িত করেছিল তেমনই স্থানীয় মানুষের কাছে সরকারি সুবিধাও পৌঁছে দিয়েছিল। এই অঞ্চলে এর আগে বিদ্যুতের দাম ছিল আট আনা প্রতি ইউনিট কিন্তু সরকারি অধিগ্রহণের পর ইউনিট প্রতি মূল্য কমিয়ে সাড়ে ছয় আনা করা হয়েছিল।[৪২]

১৯৫৬ সালের ২৮শে জুন লন্ডনে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্যার হ্যারি বার্ন এই সভায় জানিয়েছিলেন যে, গত বছরের তুলনায় পুনরায় সাধারণ গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৪ সালে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৭১ মিলিয়ন ইউনিট এবং ১৯৫৫ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ১৮৪ মিলিয়ন ইউনিট। শিল্পাঞ্চলগুলিতেও পূর্বের তুলনায় মোট বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫৪ সালে শিল্পাঞ্চলে চাহিদা ছিল ৬৯৯ মিলিয়ান ইউনিট যা ১৯৫৫ সালে বেড়ে হয়েছিল ৭৯৯ মিলিয়ান ইউনিট। মূলত জুটমিলগুলি তাঁদের সাপ্তাহিক কাজ করার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ায় জুটমিলগুলি থেকে অতিরিক্ত চাহিদা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৪৩]

বর্তমান দিনে আপৎকালীন ও সাময়িক বিদ্যুতের যোগান হিসাবে ডিজেল জেনারেটার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনোত্তর পর্বেও শহরতলী ও চাহিদাযুক্ত গ্রামীণ অঞ্চলে অল্প উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই ডিজেল জেনারেটার সেট বসানো হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে দার্জিলিঙের কালিম্পং শহরে এইরূপ একটি ডিজেল জেনারেটার নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে এই উৎপাদনকেন্দ্রে আরও ১৭৮ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত করা হয়। ঐ সালেই কোচবিহার শহরে ৩০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটার নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ক্রমাগত সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালে এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০০০ কিলোওয়াট হয়েছিল। এই ধারা ক্রমশ চলতে থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ডিজেল জেনারেটার নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৭ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে ৫৬ কিলোওয়াট এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে ৩১২ এবং ৩৫২ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ডিজেল জেনারেটার নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অন্তর্গত মাইথন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি চালু হয় এবং পরের বছরই ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় ইউনিটটি শুরু হয়।[৪৪] অপরদিকে ১৯৫৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে জানানো যায় যে গত বছরের ন্যায় এই বছরও সাধারণ গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫/৫৬ সালে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২২৬ মিলিয়ন ইউনিট এবং ১৯৫৬/৫৭ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ২৪১ মিলিয়ন ইউনিট।[৪৫]

দ্বিতীয় জাতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের নীতির প্রতি নজর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল বিদ্যুৎ। ডি.ভি.সি–এর বিদ্যুতের চাহিদা, যোগানের থেকে বেশী ছিল। ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে লোড সার্ভে করে অনুমান করা হয় যে ১৯৬৫-৬৬ সালে গিয়ে এই চাহিদা হবে ১১৯৫ মেগাওয়াট। ১৯৬১-৬২ সালে ডি.ভি.সি ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্মুখীন হয় যার জেরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ডি.ভি.সি-এর বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি তা বিচার করার জন্য সরকার সচদেব কমিটি নামক এক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৬৫-৬৬ সালের শেষে গিয়ে কর্পোরেশনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৯২৫.১৫ মেগাওয়াট হবে। ১৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চন্দ্রপুরা পাওয়ার স্টেশনের কাজে ১৯৬৪ সালের মধ্যে শেষ হলে ১৯৬৫-৬৬ সালে ডি.ভি.সি-র উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়াব ৭২৭.৫ মেগাওয়াট। অপরদিকে ১৯৫৮ সালে কোচবিহার জেলার চাংড়াবাঁধায় ৫৬ ও ৬০ কিলোওয়াটের দুইটি এবং হলদিবাড়ি অঞ্চলে ৫৬ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিজেল জেনারেটার নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র সংস্থাপিত হয়েছিল। একথা স্পষ্ট যে যেসকল জায়গায় জনঘনত্ব বেশী স্বাভাবিকভাবেই সেইসব অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদাও বেশী। নগরায়নের ছোঁয়া ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের সকল অঞ্চলকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছিল এবং কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরতলী অঞ্চলে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান তাদের পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রসারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ২৩শে অক্টোবর লন্ডনে সি.ই.এস.সি-র ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্যার হ্যারি বার্ন জানিয়েছিলেন যে দক্ষিণ কলকাতা এবং কর্পোরেশনের আওতায় থাকা শহরতলী অঞ্চলগুলিতে নতুন করে বাড়ি ও দোকানঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছরের তুলনায় পুনরায় সাধারণ গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে

ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪৬] শহর কলকাতার নিকটস্থ জুটমিলগুলি ছিল ভারীশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চচাপযুক্ত বিদ্যুতের অন্যতম গ্রাহক। জুটমিল গুলিতে পূর্বের তুলনায় ঐ বছর প্রায় ২৮ মিলিয়ান ইউনিট বেশী বিদ্যুৎ সরবরাহিত হয়েছিল, যা পূর্বের তুলনায় ৪০% বেশী।[৪৭] ইতিমধ্যেই ১৯৫৭ সালের দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন থেকে কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়। ১৯৫৯ সালে ১২ই নভেম্বর লন্ডনের ব্লুমসবেরি স্কোয়ারের, ভিক্টোরিয়া হাউসে, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ৬২তম বার্ষিক মিটিং-এ কর্পোরেশনের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মূলাজোড় থেকে ব্যারাকপুরে একটি এবং ব্যারাকপুর থেকে আগরপাড়ায় দুইটি ৩৩কেভি (কিলোভোল্ট) ফিডার সম্প্রসারণের খবর জানা যায়। আবার কলকাতা কর্পোরেশান এর আওতাধীন রাস্তার আলোকসজ্জার কাজ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায় যার জন্য প্রায় অতিরিক্ত ২ মিলিয়ান ইউনিট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়েছিল। যদিও ঐ বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ট্রামকোম্পানির কর্মচারীদের ৬ সপ্তাহের ধর্মঘটের ফলে ক্যালকাটা ট্রামওয়েসের বিদ্যুতের চাহিদা একটু নিম্নগামী হয়।[৪৮]

বিদ্যুতের গ্রাহক মূলত দুই ধরনের যথা গৃহস্থ পরিবার এবং গৃহস্থ ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন বিভিন্ন কলকারখানা বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি। ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু বার্ষিক গড় বিদ্যুৎ ব্যবহার ছিল ৭১.১ কিলোওয়াট ঘন্টা। কলকাতায় ছিল সবথেকে বেশি ৬৪৮.৩ কিলোওয়াট ঘন্টা এবং সর্বনিম্ন ছিল পশ্চিম দিনাজপুরে মাত্র ০.৫ কিলোওয়াট ঘন্টা। কলকাতার পরে ছিল বর্ধমান ১০৯.৭ কিলোওয়াট ঘন্টা এবং ক্রমান্বয়ে ২৪ পরগনায় ২৯.৯, দার্জিলিংয়ের ১৬ এবং বীরভূমে ৯.৬ কিলোওয়াট ঘন্টা। হুগলি ৩.৮, হাওড়া ৩,পুরুলিয়া ২.২, কোচবিহার ১.৯, বাঁকুড়া ১.৮, মেদিনীপুর ১.৬ এবং নদীয়াতে ১.৬ কিলোওয়াট ঘন্টা। জলপাইগুড়ি ০.৮, মুর্শিদাবাদ ০.৭ এবং মালদা ০.৭

কিলোওয়াট ঘন্টা, অর্থাৎ একথা বলাই যায় যে সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অবস্থা আশানুরূপ ছিল না।[৪৯] ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড' নামক একটি কোক ওভেন প্রকল্প নির্মিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে এই প্রকল্প দুইটি ৩০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ ইউনিট সংস্থাপন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি জার্মানির সিয়েমেন্স কর্তৃক নির্মিত।[৫০] ইতিমধ্যেই ১৯৬০ সালে দীঘার সমুদ্রসৈকতের নিকট একটি ১ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটার স্থাপিত হয়।[৫১]

১৯৬১ সালে দার্জিলিং শহরের নিকট লেবং-এ ২৫০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ডিজেল জেনারেটার নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৬১ সালের শুরুর দিকে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করলে, সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল। ঐ বছর ১৩ই মার্চ সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৫৫০ বিদ্যুতচালিত তাঁতের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের এই তাঁতের পারমিট প্রাপকদের তালিকা তৈরির কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করেছিল বলে জানা যায়।[৫২] ১৯৬১ সালের ১৪ই মার্চ সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী. জে. এল হাথি লোকসভায় জানান যে, তৃতীয় যোজনার আমলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় সুপার গ্রীড স্থাপনের সম্ভাবনা কম, তবে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূরের জন্য দক্ষিণী গ্রীডটি তৃতীয় যোজনার শেষে অথবা চতুর্থ যোজনার প্রথমে স্থাপনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় গ্রীড ব্যবস্থার পত্তন হবে।[৫৩] কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ১৯৬০-৬১ সালের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের খাতে ব্যয়বরাদ্দ পূর্বের ৯৭৫ কোটি টাকা থেকে

বাড়িয়ে ১১১২ কোটি টাকা করার সম্ভাবনা ছিল। এই বিবরণীতে আরও বলা হয়েছিল যে, সরকার যেসমস্ত সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় অনেক টাকা লগ্নি করেছে সেইগুলি থেকে অল্প সময়ের মধ্যে সর্বাধিক সুবিধা আদায়ের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজগুলিতে বাড়তি বিনিয়োগের মাধ্যমে কাজগুলিকে দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন।[৫৪]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ১৯৬১-৬২ সালে রাজস্ব খাতে ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯০০ টাকা ঘাটতি দিতে হবে বলে হিসাব করা হয়েছিল। এই বছর রাজস্ব খাতে পর্ষদের আয় হবে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় হবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ১৯৬১ সালের ২৩শে মার্চ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আয়-ব্যয়ের এই আনুমানিক হিসাব পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল।[৫৫] এই সময়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলিতে ডিভিসি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার একটা আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ থেকে দুর্গাপুরের ডিভিসির দুইটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট বিকল হয়ে যাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কোক চুল্লি ইউনিটেও কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ঐ কেন্দ্রে থেকে যে ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহিত হত বন্ধ ছিল। বোকারো অঞ্চলের অন্য একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রেও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছিল। মূলত এই কারণগুলির জন্য ১৩০ মেগাওয়াটেরও বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ ঘাটতি হয়েছে। ডিভিসির চেয়ারম্যান শ্রী ইউ কে ঘোষাল এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, দুর্গাপুরের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হবে। যদি এই প্রচেষ্টা অসফল হয় তাহলে ডিভিসি-র পক্ষ থেকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন সহ অন্যান্য গ্রাহকদের সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।[৫৬] কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এর দরুণ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আপতকালীন পরিস্থিতিতে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনর প্রতিনিধি

ডঃ এইচ সি বোকার সাধারণ মানুষকে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যাতে পুরো শহর বিদ্যুতহীন হয়ে না পড়ে তাই কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনমতো এক একটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল বলে তিনি জানান। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও ডিভিসির বৈদ্যুতিক জেনারেটর মেরামত সম্পূর্ণ সফল না হওয়া পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চলবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। সমস্যার কথা ছিল এই যে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টা করলেও তা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট ছিল না। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সকল গ্রাহকদের অনুরোধপত্র দিয়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলার দিকে বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ডঃ বোকারের হিসাব অনুসারে সেই সময়ে কলকাতায় বিদ্যুতের ঘাটতির পরিমাণ ১২১ মেগাওয়াটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৫৭] অতিশীঘ্রই কর্পোরেশনের আবেদনের ফল পাওয়া যায়। বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সাড়া এবং সপ্তাহের শেষে কারখানার জিনিসের স্বাভাবিক নিম্নমুখী চাহিদার ও সর্বোপরি ডিভিসি কর্তৃক ৮০-৮৫ মেগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল। স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য ১০ই এপ্রিল সি.ই.এস.সি কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের মধ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৫৮] এই সময়ে বিদ্যুতের এই সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ভবনে, সি.ই.এস.সি ও বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং এই বৈঠকে বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানোর উপায় বিবেচনা করার জন্য পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অপরদিকে ডিভিসির জলাশয়গুলির জলস্তর নেমে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ সি.ই.এস.সি-র কাছে ৮০ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ না নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও কলকাতার সান্ধ্যকালীন চাপ সামলানোর জন্য সি.ই.এস.সি ৮৯

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল।[৫৯] এরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলা নববর্ষ আসন্ন ছিল এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাছে ছিল অন্যতম এক চ্যালেঞ্জ। কর্পোরেশন সসম্মানে এই পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং ঐ দিন মহানগরীর সকল অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। কর্পোরেশনের মুখপাত্র জানায় যে কর্পোরেশান বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল।[৬০] নববর্ষের দিন সামাল দিলেও সমস্যার সমাধান কিন্তু হয়নি। রাজ্য সরকার এই সমস্যা মেটানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছিল এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় জানিয়েছিলেন যে জরুরী ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সিন্ধি, হিন্দুস্তান ইস্পাত কারখানা থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে। এমতাবস্থায় ১৪ই এপ্রিল রায়টার্স বিল্ডিং-এ কলকাতার বিদ্যুৎসঙ্কট নিয়ে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম এবং মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় রাজ্য সেচ মন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জি এবং ডিভিসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিউ কাশীপুরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সাথেও এই সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।[৬১] নিরন্তর বাড়তে থাকা বিদ্যুতের এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাদের নিউ কাশীপুর জেনারেটিং স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকার কারখানাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল। এক অংশের কারখানাগুলিকে দিনের বেলায় ও অন্য অংশের কারখানাগুলিকে রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়ে সি.ই.এস.সি রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন অনুসারে কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল।[৬২] ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে এবং কর্পোরেশান বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অবগত করার

চেষ্টা করে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ডিভিসি থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ কমে গেলে খিদিরপুর ও বেহালা অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।[৬৩] **১৯৬১** সালের ২৭শে এপ্রিল লোকসভায়, সাংসদ শ্রী ত্রিদিবকুমার চৌধুরী, দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিকল হওয়ার ফলে কলকাতার বৃহদাংশ এবং শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে তদন্তের জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন।[৬৪] কলকাতার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সার্বিক কোন উন্নতি লক্ষ্য করা না গেলেও **১**লা মে থেকে দুর্গাপুরের একটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে বলে জানা গিয়েছিল।[৬৫] এই বিদ্যুৎ বিপর্যয় কলকারখানার শ্রমিকদের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিবাদে রিষড়ার একটি চটকলের অস্থায়ী ও বদলি শ্রমিকরা **১৯৬১** সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ৩ দিন কাজ বন্ধ রেখেছিল।[৬৬] অপরদিকে কলকাতা, লিলুয়া ও বালি অঞ্চলে, কর্পোরেশন পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২রা মে, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সন্ধ্যে বেলায় ৬টা থেকে আনুমানিক ৬.৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছিল।[৬৭] এই সময়ে সি.পি.আই-র বিধায়ক শ্রী জ্যোতি বসু, ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক শ্রী অশোক ঘোষ, বিধায়ক শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক শ্রী অমর বোস, আর.এস.পি-র শ্রী মাখন পাল, আর.সি.পি.আই-র শ্রী বিমলানন্দ মুখার্জি, বি.পি.আই-র শ্রী বরদা মুকুটমণি, ডবলু.পি-র শ্রী দিলীপ রায় চৌধুরী, এস.ইউ.সি-র শ্রী নীহার মুখার্জি, শ্রী বিবেকানন্দ মুখার্জি ,শ্রী বিজয় ব্যানার্জি এবং ডঃ বি. ডি. নাগ চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ববৃন্দ সমবেত হয়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যার ভয়াবহতা নিয়ে এক বিবৃতি পেশ করেন। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি

পাওয়ার জন্য উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ ১৯৬১ সালের ৭ই মে বিকেল ৫.৩০টা নাগাদ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান হলে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে নাগরিকদের যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৬৮]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের ২২-বি ধারা অনুসারে কাশীপুর উৎপাদনকেন্দ্রের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোতে ৯ মে থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কিছু পরিবর্তন আনে। কাশীপুরের একটি ইউনিট থেকে অতিরিক্ত ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে জানা যায় এবং তার উপর নির্ভর করেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। রাজ্য সরকার কাশীপুর অঞ্চলের অত্যাবশ্যকীয় সংস্থাগুলি বাদে অন্যান্য শিল্প-কারখানায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত অন্যান্য কাজকর্মের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। অত্যাবশ্যকীয় সংস্থাগুলির মধ্যে ছিল হাসপাতাল, সিনেমা হল, গৃহ ,পরিবহণ, ময়দার কল, কোল্ডস্টোরেজ, গ্যাস যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা।[৬৯] ৭ই মে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কলকাতায় এক নাগরিক সভা আয়োজিত হয়েছিল। এই আলোচনাসভায় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ভার রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর ন্যস্ত করার দাবিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মূল প্রস্তাবে বলা হয়, বর্তমান পরিকল্পনার আমূল সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা রচনা আবশ্যিক।[৭০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এরূপ সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬১ সালের ৯ই মে কলকাতার রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকায় সি.ই.এস.সি-র মানরক্ষা হয়েছিল।[৭১]

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার এই অনিয়মতা, কলকাতার সামগ্রিক নাগরিক জীবন এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছিল। পাশাপাশি কর্মসংস্থানেও এই অনিয়মতা প্রভাব ফেলে। এই বিভ্রাট বিদ্যুতশিল্পের উপর নির্ভরশীল কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রায় একমাস ধরে চলা এই বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দিতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় কলকারখানাগুলি তাঁদের কাজের সময় কমিয়ে দেয় যার যার ফলে শ্রমিকদের রোজগার কমে যায়। পাশাপাশি তাদের শুধুমাত্র রাত্রিবেলায় কাজ করানো হতে থাকে যার ফলে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে **১১**ই মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন কলকারখানার বহু শ্রমিক ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও রাইটার্স বিল্ডিং-র সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করার ও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী উঠতে থাকে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে জ্যোতি মুখার্জি, নেপাল ভট্টাচার্য ও ঋষি ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৭২] এই বিক্ষোভের পর পরই **১৩**ই মে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে নিউ কাশীপুর ইউনিটের তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র যদি আগে সময়মত মেরামত করা হত তাহলে এইরকম অপ্রত্যাশিতভাবে একসাথে সবকটি ইউনিট বিকল হয়ে যেত না। নিয়মানুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনযন্ত্রগুলি কিছুদিন কাজ করার পর বিশ্রামে রেখে আগাগোড়া পরীক্ষা করে ছোটখাটো সমস্যা সারিয়া নেওয়া প্রয়োজন। যদিও কাশীপুরের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেই তিনটি ইউনিট একসাথে বিকল হয়ে যায়। তৎকালীন বিদ্যুৎ সংকটে সাধারণ মানুষের যে অসুবিধা হয়েছিল সেই জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ও কলকারখানাগুলি, গৃহস্থ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে

ঐ মুখপাত্র বলেন যে, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা সরবরাহের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি স্বেচ্ছায় মেনে না নিতেন তাহলে সীমিতভাবেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হত না।[৭৩] ১৫ই মে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রী আব্দুস সত্তার বিদ্যুৎ সংকটের ফলে এই রাজ্যে শিল্প বিপর্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে রাজ্যের ৮০টি চটকলের মধ্যে কাশীপুর জেনারেটিং স্টেশন এলাকাভুক্ত ৯টি চটকল ছিল এবং এর মধ্যে ৪টিতে ১৫ হাজার এবং বাকি ৫টিতে ১০ হাজার করে কর্মচারী এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই চটকলগুলিতে ১৭ই এপ্রিল থেকে ৭ই মে পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যহ ৫ ঘণ্টা ও প্রত্যহ ৩.৫ ঘণ্টা করে নষ্ট হয়েছে এবং শ্রম-বিরোধ আইন অনুযায়ী এই কর্মচারীরা নষ্ট হওয়া ঘণ্টার ৫০% ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল।[৭৪] অর্থাৎ এটি খুবই স্পষ্ট যে এই বিদ্যুতবিভ্রাট সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল বিশেষ করে বিদ্যুতশিল্পের সাথে সংযুক্ত অনুসারী শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই বিভ্রাট থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কথা মাথায় রেখে কাশীপুর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে একটি নতুন ৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটিং মেশিন বসানোর পরিকল্পনা করেছিল। সরকারও এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয় এবং একই সাথে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীনে দুর্গাপুরে এবং ব্যান্ডেলে একটি ৩০০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৭৫] ইতিমধ্যেই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ডেভেলাপমেন্ট লোন ফান্ড-এর থেকে ২ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছিল।[৭৬] অপরদিকে ৬ই জুলাই পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের দুটি বিভাগের বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু হয়েছিল যা ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আনুমান করা হয়েছিল।[৭৭] ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রেলপথের বিদ্যুতায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সরবরাহের জন্য, বৃটিশ ইনসুলেটেড ক্যালেন্ডরস কেবলস লিমিটেডকে দশ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের যন্ত্রপাতির বরাত দিয়েছিল। সাব-আরবান ট্রেনের ২৫০ মাইল রাস্তার জন্য এই কোম্পানি বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় সংস্থাপন করবে বলে জানা গিয়েছিল।[৭৮] তৃতীয় যোজনার দুই পর্যায়ে নির্ধারিত ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ নিজ গতিতেই এগিয়ে যেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ ভোল্টে বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা প্রথম শুরু হয়েছিল ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি দখল দপ্তর, হুগলি সদর মহকুমার মগরা থানার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে প্রস্তাবিত ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ৫০০ টাকা প্রতি বিঘা দরে প্রায় ৩৫০০ বিঘা জমি দখল করে। এই জমির মালিকরা অধিকাংশই চাষ-আবাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এই জমি দখলের ফলে তারা বেকার হয়ে যাবেন বলে সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন।[৭৯] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য বিধানসভায় জানান যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাবার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনকে ২০০ মেগাওয়াট এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি আরও জানা যে দুর্গাপুরে একটি দেড়শো মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনের তরফ থেকে পাওয়া গেছে। রাজ্য সরকার এর পাশাপাশি ব্যান্ডেলে একটি ৩০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুতকেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী বলেও তিনি জানান।[৮০] মূলত বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। এপ্রিল মাস থেকে শুরু হওয়া এই বিদ্যুৎ সংকট ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিক অবধিও বজায় ছিল। দুর্গাপুরের ৭৫ মেগাওয়াট একটি ইউনিটের বয়লারে গোলমালের জন্য বিকল হয়ে যাওয়ায় পুনরায় বিদ্যুতের সঙ্কট দেখা গিয়েছিল। এই যান্ত্রিক

গোলযোগের জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দৈনিক প্রাপ্ত বিদ্যুৎ প্রায় ১০ মেগাওয়াট কমে যায়। যদিও কাশীপুর ও মূলাজোড়ের উৎপাদনকেন্দ্র পর্যাপ্ত উৎপাদন করায় সাময়িকভাবে তা সামাল দেওয়া গেছে।[৮১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লিফট ব্যবহার কালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে আসে।[৮২] শুধুমাত্র তাই নয় এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন তথা সামগ্রিক অর্থনীতির উপরও প্রভাব ফেলেছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শক্তির অপ্রাচুর্য শিল্পমহলে এক ঋণাত্বক বার্তা পৌছায়। দিল্লীর এক শিল্পপতি ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে রেয়নের কারখানা খুলতে উদ্যোগী হলেও ভঙ্গুর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য এই প্রকল্প ভেস্তে যায়। রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ ব্যবস্থার এহেন সঙ্গীন অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই সচদেব কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটির অনুসন্ধানের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আজিমগঞ্জ, গৌরীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২২ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা পেশ করেছিল।[৮৩]

এরূপ প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তাদের প্রসারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। উত্তর দিনাজপুরের জেলার সদর শহর রায়গঞ্জে ১৯৬২ সালে ২টি ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটার সেট সংস্থাপন করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে জানায় যে আগামী দিনে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৭৩ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী পি.পি আগরওয়াল, কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনারের জলবিদ্যুৎ শাখার সদস্য শ্রী কে পি এস নায়ার এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেচ শাখার উপদেষ্টা শ্রী বলবন্ত সিং মাগ।[৮৪] ১৯৬২

সালের এপ্রিল মাসে শ্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার নেন।[৮৫] ইতিমধ্যে ১৯৬৩ সালে উত্তরবঙ্গের জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনে দুটি ২০০ কিলোওয়াট এবং শিলিগুড়িতে ৩৫২ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা ডিজেল জেনারেটার বসানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯৬৪ সালে, সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের যাবতীয় কাগজপত্র দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ্ পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পেশ করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে কোচবিহার শহরে স্থাপিত ডিজেল জেনারেটারটির সাথে ১৯৬৪ সালে আরও একটি ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ডিজেল জেনারেটার সেট যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে ৫৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটার সংস্থাপিত হয় এবং ১৯৬৪ সালে পুনরায় একটি ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ডিজেল জেনারেটার এর সাথে যুক্ত করা হয়। ১৯৬৫ সালে মালদহ জেলার সদর শহর কালিন্দ্রীতে ৩টি ৪৪০ কিলোওয়াট এবং ৩টি ৫৮৪ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটার সংস্থাপনের মধ্যে দিয়ে এই কেন্দ্রের পত্তন ঘটে।[৮৬]

বিদ্যুতশিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ছিল বিদ্যুতশুল্ক। ১৯৬৩ সালের ইলেকট্রিসিটি ডিউটি অ্যাক্ট অনুযায়ী শিল্প ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে মিটার আছে এবং আলো ও পাখার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার হয় সেইসব জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবহার ১৫ ইউনিটের কম হলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা বলা হয়েছিল। যে সকল মিটারে ১৫ ইউনিট থেকে ৫০ ইউনিটের মধ্যে খরচ সেখানে প্রতি ইউনিট ৩ নয়া পয়সা এবং ৫০ ইউনিট এর বেশি খরচ হলে প্রতি ইউনিট ৬ নয়া পয়সা মূল্য ধার্য হবে বলে জানা গিয়েছিল। যেসকল জায়গায় মিটার ছিল না সেইখানে ৩০ ওয়াটের নীচের বাতি মাসিক ১২ নয়া পয়সা, ৩০ থেকে ৪০ ওয়াটের মধ্যেকার বাতির জন্য মাসিক ১৯ নয়া পয়সা, ৪০

থেকে ৬০ ওয়াটের বাতির জন্য মাসিক ২৫ নয়া পয়সা এবং ৬০ থেকে ১০০ ওয়াটের বাতির জন্য মাসিক ৩৭ নয়া পয়সা হিসাবে মূল্য নেওয়া হত।[৮৭]

অপরদিকে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ২৫শে মে দমদম ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে, চিড়িয়ামোড় ও নাগেরবাজার অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের তরফ থেকে ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যান্টের সাময়িক গোলযোগের জন্যই এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল।[৮৮] এই সমস্যাটি কিছুটা উৎপাদন প্রক্রিয়াগতও ছিল। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মূলত তেল বা নিম্নমানের কয়লা ব্যবহার করত। ক্রমশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তেলের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তার জায়গায় অনেক বেশি করে উন্নতমানের কয়লানির্ভর উৎপাদন এবং জলবিদ্যুৎ এর ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালের পর থেকে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে যে পরিমাণ কয়লা বরাত দিয়েছিল তার মধ্যে ৫০% এবং ১৯৬৯ সালের প্রায় ৮০% ছিল উচ্চ জাতের কয়লা।[৮৯] উচ্চমানের কয়লা ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং এই মানের কয়লায় ছাই এর পরিমাণও কম থাকে। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্যুতের চাহিদাকে মেটাতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীদের ধর্মঘট পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পকে এক গভীর সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয়। এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিও সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে এক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, নর্থ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ শক্তি

সরবরাহের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলা হয় যে গত দু মাস ধরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলে আশ্বাস দিলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। উপরন্তু শহরে প্রায়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কোন কারণ না দেখিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা, প্রয়োজনের তুলনায় কম ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, কোন গোলযোগের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে দীর্ঘ সময় পর তা মেরামত এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি অসুবিধাগুলির জন্য উত্তরবঙ্গের গ্রাহকরা প্রচন্ড দুর্ভোগ ভোগ করছেন। এ প্রসঙ্গে চেম্বার প্রশ্ন তুলেছিল যে, জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হওয়ার পর শিলিগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যাপারে এই ধরনের বিপর্যয় বেমানান। বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিয়মের ফলে শিলিগুড়ি শহরের শিল্পব্যবস্থাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।[৯০] এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, জলপাইগুড়ি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি এবং জেলা অধিকর্তাসহ জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।[৯১] শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গই নয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুতায়নের গতি সামগ্রিকভাবে মন্থর ছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইউনিয়নগুলির বাধা প্রদানকে সামনে রেখে গ্রাম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের মন্থরতা স্বীকার করে নেয়।[৯২] কলকাতার অবস্থাও ছিল সংকটজনক, বিদ্যুতবিভ্রাট বা লোডশেডিং ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৮ সালের ১৮-ই সেপ্টেম্বর বিকেলে কলকাতা পৌরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলো নিভে যায় যার ফলে স্ট্যান্ডিং ফিনান্স সাব-কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। জানা যায় এর আগেও স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটির সভা লোডশেডিং এর জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পৌরসভা কমিশনার দুলাল গোপাল মুখার্জি এই ঘটনায় যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন। স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ বীরেন বসু এই ঘটনার জন্য পৌরসভার অভ্যন্তরের চক্রান্তকে দায়ী করেন।[৯৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়ে রাজ্য বিদ্যুৎ

পর্ষদের শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছিল। এই কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে তিনদিন নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যার ফলে ঐ সকল অঞ্চলের সরকারি দপ্তরগুলিতেও কাজ থমকে গিয়েছিল।[৯৪] জানা যায় যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম বিদ্যুৎ পাওয়ায় কলকাতা ও শহরতলিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা যায়। এই ঘটনার পিছনে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছিল।[৯৫] ক্রমশ পরিস্থিতি আরও জটিল হতে থাকে এবং নাশকতামূলক ঘটনার কথা সামনে আসে, যেমন ১৯৬৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় বিদ্যুৎ পর্ষদ এর অফিসারদের গাড়িতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেকট্রিক লাইন মেরামত করতে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।[৯৬] ইতিমধ্যেই, সি.ই.এস.সি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে, পূর্বের ভিক্টোরিয়া হাউসে অবস্থিত তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসগুলি, স্কিম নাম্বার ৬৬ রবীন্দ্র সরণি (পূর্বতন লোয়ার চিৎপুর রোড) ও স্কীম নং ৬৬ নিউ সি আইটি রোডের সংযোগস্থলে পোদ্দার কোর্টের তিনতলায় আরও বড় ভবনে স্থানান্তরিত করার কথা জানায়। ৩রা অক্টোবর, ১৯৬৮ তারিখ থেকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনর মেইনস সুপারিনটেনডেন্ট ও ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট যাত্রা শুরু করেছিল।[৯৭]

উৎসবের মরসুমে আলোকোজ্জ্বল ভাবে দুর্গাপূজা করার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে পুজোর সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষ বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। তবে এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা পর্ষদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, সেটিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়।[৯৮] বলা বাহুল্য, এই সময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলকাতা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল, পূর্ব ও পশ্চিম পুটিয়ারি থেকে কুদঘাট, ব্রহ্মপুর, গড়িয়া, সোনারপুর,

বারুইপুর অঞ্চলের ছোট-বড় কলকারখানা এই বিদ্যুৎ বিপর্যয় এর ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গমকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও রাস্তার আলো নিভে যাওয়ায় নাগরিক জীবন এক গভীর সংকটের মুখে পড়ে গিয়েছিল।[৯৯] আবার রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছিল যে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ না হওয়ার ফলে হাওড়া ও শিয়ালদা লাইনের বৈদ্যুতিক মালগাড়ির চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। কলকাতা বন্দরের সমস্ত জিনিসপত্র শিয়ালদা ডিভিশন থেকে যাওয়ার ফলে এই লাইনে বেশি সমস্যা হয়েছিল। এই ডিভিশনকে সচল রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য শিয়ালদহের পাওয়ার স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল।[১০০] একদিকে যেমন প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াগত সমস্যার জন্য বিদ্যুৎ বিভ্রাট মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল তখন খোদ কলকাতার বুকে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ পরিবাহী তামার তার চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছিল। কাউন্সিলর শ্রী সমর রুদ্র তৎকালীন মেয়র শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দের কাছে, ১৯৬৮ সালের ১০ই অক্টোবর মানিকতলা স্ট্রীট, ডাফ স্ট্রীট, এন্টনি বাগান,পার্শি বাগান স্ট্রীট, বেলগাছিয়া রোড, চীৎপুর ব্রিজ, টালা ব্রিজ, আহিরীটোলা ও নিমতলা গঙ্গার ঘাট অঞ্চল থেকে ব্যাপক পরিমাণে বিদ্যুৎ পরিবাহী তামার তার চুরি হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন।[১০১] এই চুরির ফলে কলকাতা অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। কিছুদিন পরে ২৪শে অক্টোবর বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য সন্ধ্যাবেলায় বরানগরে বেশ কিছু অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।[১০২] অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে নানান কারণে ষাটের দশকে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা আশানুরূপ ছিল না।

ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া যায় যে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় জলঢাকা প্রকল্পের থিও ডোলাইট ডাম্পার, ওয়াটার কংক্রিট প্রেসার, ওয়েল্ডিং সেট এর মত প্রায় কয়েক লক্ষ

টাকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভেসে গিয়েছিল।[১০৩] উত্তরবঙ্গের মত ভুটানের থিম্পু ও পারো-র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ভারতীয় আর্থিক আনুকূল্যে ১৯৬৭ সালে থিম্পু ও ১৯৬৮ সালে পারোর কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল।[১০৪] অপরদিকে ২রা নভেম্বর থেকে জলঢাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তিন মাইল দীর্ঘ প্রবাস প্রকল্পের সুড়ঙ্গে পলি জমে যাওয়ায় তা সংস্কারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছিল। শিলিগুড়ি ডিজেল পাওয়ার থেকে 'শেভি লোড' এর সাহায্যে শহরাঞ্চলে আপৎকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল।[১০৫] ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ ছিল ১২২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ৬৯-৭০ সালে ১৩৯৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ১৯৭১-৭২ সালে এই উৎপাদন বাড়িয়ে ১৫০২ মিলিয়ন কিলোওয়াট করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। অপরদিকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৭৪৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ও ১৯৬৯-৭০ সালে ১৭৫০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল।[১০৬] রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর কিছু পূর্বেই এই বর্ধিত চাহিদার কথা মাথায় রেখে দুর্গাপুর-সাঁওতালডিহি, হাওড়া ডিভিশনের সাঁওতালডিহি-হাওড়া, হাওড়া-বারাসাত ৪০০ কিলোভোল্টের বিদ্যুৎ প্রেরণ লাইন স্থাপন করে দুর্গাপুর-বারাসাতকে একই প্রেরণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার এবং বারাসাত (পরবর্তীতে জিরাট), কোলাঘাট ও হাওড়া অঞ্চলে ৪০০/২২০/১৩২ কিলোভোল্টের সাব-স্টেশন গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।[১০৭] পাশাপাশি দুর্গাপুরের ষষ্ঠ ইউনিট গঠনের এক পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং এর জন্য আমেরিকার এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।[১০৮] এই সময় গড়ে ওঠা বেশীরভাগ উৎপাদন কেন্দ্রই হয় বৈদেশিক অথবা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশেনাল ডেভেলপমেন্টের) থেকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার

(তৎকালীন মূল্য অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৮ কোটি টাকা) ঋণ এবং স্থানীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পি এল ৪৮০ তহবিল থেকে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যে ঋণ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের থেকে তা ধীরে ধীরে শোধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৯৭০ সালে ৩.২৭ কোটি টাকা, ১৯৭১ সালে ৩.৩৩ কোটি টাকা ঋণ শোধ করে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে রাজ্য সরকারকে প্রায় ২৩.০৭ কোটি টাকা ঋণ শোধ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল।[১০৯] অপরদিকে ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যাবকক ও উইলকক্স থেকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। এই যন্ত্রপাতিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় মুলধন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে গৃহীত ঋণের মধ্যে সংযোজিত ছিল।[১১০]

উত্তরবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের টালমাটাল অবস্থা অব্যাহত ছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ই অগাস্ট উত্তরবঙ্গের ডিজেল জেনারেটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত কর্মীরা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পতাকাতলে বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেন।[১১১] বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উত্তরবঙ্গের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এ কে গাঙ্গুলি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, পর্ষদ, ডিজেল পাওয়ার হাউসের কর্মীদের বেতনক্রম পরিবর্তন করার পাশাপাশি তাদের সাথে একটা মীমাংসায় আসার চেষ্টা করছে। পর্ষদের পক্ষ থেকে সবরকমের চেষ্টা করা হলেও, কর্মচারীরা মীমাংসার সমস্ত প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ বিরোধ মেটানোর জন্য সমস্ত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, ফলে মালদাহ সমেত সমগ্র উত্তরবঙ্গের এক বৃহৎ অংশের মানুষ ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।[১১২] অবশেষে ২৩শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং বিদ্যুৎ ওয়াকাস

ইউনিয়নের উত্তরবঙ্গের শাখার মধ্যে এক চুক্তির ফলে রাত ১০টা থেকে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। পর্ষদ ৭ই অক্টোবর মধ্যে ওয়াকর্স ইউনিয়নের ডিজেল কর্মীদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কর্মীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।[১১৩] অপরদিকে ২৬শে আগস্ট বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর প্রতিবাদে যুব কংগ্রেসের এক মিছিল চন্দননগর ইলেকট্রিক অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। ইউনিট প্রতি ৪ পয়সা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার ও চন্দননগরের সমস্ত এলাকায় আলোর সুবন্দোবস্তের দাবি এই স্মারকলিপি মারফৎ জানানো হয়েছিল।[১১৪]

সত্তরের দশকের গোড়ায়, রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের তাগিদে রাজ্য সরকার কর্তৃক ডিরেক্টরেট অফ ইলেকট্রিসিটির সাথে একটি বৈদ্যুতিক গবেষণাগার যোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[১১৫] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে এই পরিকল্পনা নেওয়া হলেও প্রয়োজনীয় পুজিঁ না থাকায় সেটি তখন রদ করা হয়। পুনরায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা ও গবেষণাগার বাবদ ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। অপরদিকে ১৯৬৯ সালের মধ্যেই ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৮২.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি ইউনিটি চালু হয়ে গিয়েছিল। সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বছরে প্রায় ১৩.৩৮কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালের জন্য আরও ১১.৮৩কোটি টাকার খরচের একটি হিসাব পেশ করা হয়েছিল। জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের দুইটি ৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা থাকলেও ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের ভয়াবহ বন্যায় এই প্রকল্পের কাজ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই প্রকল্পের পুনর্নির্মাণের এর কাজ শুরু হলেও এই প্রকল্পে মৃত্তিকা সংরক্ষণের একটি সমস্যা দেখা গিয়েছিল।

রাজ্য সরকার এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে যা এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে। জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে তৃতীয় ইউনিটের কাজ ১৯৭২ সালের শুরুর দিকে হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, লিটিল রঙ্গিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প যাত্রা শুরু করলেও অক্টোবর মাসের বন্যায় সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রঙ্গীত নদীর উপরের দিকে একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এইসময়ে উত্তরবঙ্গের চাপড়ামারিতে যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা ছিল তার জন্য অতিরিক্ত ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এই সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে বিদ্যুৎ বন্টন ও প্রেরণের জন্য বেশকিছু ২২০ কেভি লাইন স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৭২ সাল অবধি এই প্রকল্পে প্রায় ২.১১কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরমধ্যে সাঁওতালডিহি-কসবা ১৩২কেভি লাইন, অশোকনগর-কসবা ১৩২কেভি লাইন এবং অশোকনগর-ধর্মপুরা লাইনের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল এবং সোনারপুর-কসবা ১৩২কেভি লাইন চালু হয়ে গিয়েছিল। সাঁওতালডিহি-দুর্গাপুর এবং সাঁওতালডিহি-হাওড়া ২২০ কেভি লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বরাত দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে দুর্গাপুর ও হাওড়ায় ২২০ কেভি সাবস্টেশন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।[১১৬]

৩১শে মার্চ ১৯৭১ সাল অবধি বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুতায়নের হার*			
জেলা	সাল	বিদ্যুতের সংযোগ প্রাপ্ত শহরের সংখ্যা	বিদ্যুতের সংযোগ প্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা
হাওড়া	১৯৭১	২৭	১১১
দার্জিলিং	১৯৭১	৪	১৬২
নদীয়া	১৯৭১	১৩	৪৩৪
বীরভূম	১৯৭১	৬	৮৯
পুরুলিয়া	১৯৭১	৭	৫৪
বাঁকুড়া	১৯৭১	৫	১১৫
মালদা	১৯৭১	২	৭২
হুগলী	১৯৭১	১৭	৩৪২
পশ্চিম দিনাজপুর	১৯৭১	৫	১৯
জলপাইগুড়ি	১৯৭১	৭	১৬২

২.১. *১৯৭১ সালের আদমশুমারি (সেন্সাস) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বয়ান অনুযায়ী, ১৯৭২ সালের মার্চ মাস অবধি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৮৫ মেগাওয়াট। পর্ষদ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে সাঁওতালডিহি প্রথম ইউনিটটি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং দ্বিতীয় ইউনিট ১৯৭৪ সালের শুরু থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করবে। ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের চারটি ইউনিটি সচল কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তিনটি ইউনিট চালু রাখা হয়। অপরদিকে গৌরীপুরে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্রে তুলনায় বেশি হলেও রাজ্য পর্ষদ প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে এই কেন্দ্র চালু রাখতে বাধ্য হয়েছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে পর্ষদ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ডিভিসি, ডিপিএল এবং পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্য থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংগ্রহ করত। বিহার ও উত্তরবঙ্গের মধ্যবর্তী ৩৩কেভি লাইনের মাধ্যমে, পর্ষদ বিহার রাজ্য থেকে বার্ষিক ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিল। ডালখোলা শিলিগুড়ি ১৩২ কেভি লাইনের কাজ সম্পন্ন হলে বিহার থেকে আরও

বেশি বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে পর্ষদ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। পর্ষদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছিল যে ১৯৭৩ সালের মধ্যে আলিপুরদুয়ার বঙ্গাইগাঁও লাইনের কাজ সম্পন্ন হলে আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকেও বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ পর্ষদ ডিভিসি থেকে ৬.৮ পয়সা প্রতি ইউনিট দরে বিদ্যুৎ ক্রয় করছিল কিন্তু ডিভিসি খুব শীঘ্রই ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের এই দাম বাড়িয়ে ৭ পয়সা বা ৭.২ পয়সা করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল বলে জানা যায়।[১১৭] তবে অপর্যাপ্ত অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পরিবেশকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। রাজ্যে শিল্পের অবস্থান নিম্নমুখী ছিল, ১৯৭০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৩০৩৩টি নতুন শিল্প অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল, যার মধ্যে মাত্র ১৫৪টি ছিল পশ্চিমবঙ্গের।[১১৮]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে জানা যায় যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ উৎপাদিত বিদ্যুৎ ১২.১ পয়সা ইউনিট প্রতি দরে বিক্রি করে প্রায় ২৩৪.৫ কোটি টাকা আয় হবে বলে অনুমান করেছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে বিদ্যুৎ পর্ষদের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ১৩৯৮.৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রয় করা বিদ্যুৎ এর পরিমাণ ছিল ৫৬৬.৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট। ১৯৭০-৭১ উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ ছিল ১৪৯৩.৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ১৯৭১-৭২ সালে ১৪৯০.২ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ১৯৭২-৭৩ সালে ১৫৪০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। অপরদিকে পর্ষদ এই সময়ে বিদ্যুৎ ক্রয় করেছিল, যথাক্রমে- ১৯৭০-৭১ সালে ৫৬২.১ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ১৯৭১-৭২ সালে ৭০৪.৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ১৯৭২-৭৩ সালে আনুমানিক ৭৬৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট। গৃহস্থের কাজে ক্রমশ বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে থাকে। ১৯৭০-৭১ সালে যেখানে গৃহস্থে মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৩৯.৩০ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ১৯৭১-৭২ সালে গিয়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ১৯৭২-৭৩ সালে

তা প্রায় ৬৩ মিলিয়ন কিলোওয়াটে পৌঁছেছিল। ভারী শিল্পের বিদ্যুতের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭০-৭১ সালে যেখানে এই ক্ষেত্রে মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৬০৪.৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ১৯৭১-৭২ সালে গিয়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১৪.৪মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ১৯৭২-৭৩ সালে তা প্রায় ৭৭৯.২ মিলিয়ন কিলোওয়াট। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উৎপাদিত বিদ্যুতের অন্যতম বড় গ্রাহক ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। কলকাতায় বিদ্যুতের চাহিদা যত বৃদ্ধি পেয়েছিল, সি.ই.এস.সি ততবেশি করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করেছিল। সি.ই.এস.সি ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে ৬৭৫.৫৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ১৯৭১-৭২ সালে ৭৫৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ১২৬৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করেছিল। ১৯৭০-৭১-৭২ এই ৩টি বছরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ১৯৭০ সালে ১১.৭ পয়সা এবং পরবর্তী ২ বছরে ১১.৮ টাকা দরে বিক্রি করে মোট ২০.৭৯ কোটি, ২১.৯০ কোটি এবং ২৩.২৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।[১১৯] পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মধ্যে সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম দু'টি ইউনিট এর কাজ শেষ করার কথা বলা হয়েছিল। সাঁওতালডিহির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল ভোপালের হেভি ইলেকট্রিক্যালসের উপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিকল্পনা বিভাগের সহকারি সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাথে সাঁওতালডিহির তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছিলেনন। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি এই দু'টি ইউনিট এর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে, ১৯৭২-৭৩ সালের পরিকল্পনায় এই দুইটি ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিকল্পনা বিস্তারিত জানাতে বললেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে এরূপ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ধাপের বিস্তারের জন্যও কোন পরিকল্পনা

দেখা যায়নি। কার্শিয়াং এবং রাম্মাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নতুন করে কোনো অনুমোদন প্রাপ্ত হয়নি। অপরদিকে রঙ্গীত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা খরচের হিসাব দেখানো হলেও তার মধ্যে থেকে ১৯৭২-৭৩ সালে মাত্র ২ লক্ষ টাকা অনুমোদন পেয়েছিল। সংকটকালীন পরিস্থিতির জন্য উত্তরবঙ্গের ডিজেল সেট বসানোর পরিকল্পনা ছিল তাও এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে নির্দিষ্ট একটি নিয়ামক সংস্থার অধীনে নিয়ে আসায় বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল।[১২০]

কলকাতার বিদ্যুতায়নের কাজও নিজ গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে শ্রী অশোক মিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের নগর পরিকল্পনা বিভাগের কমিশনার এর মধ্যেকার এক আলোচনাচক্রে কলকাতার শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছি যার মধ্যে বস্তি উন্নয়ন একটি অন্যতম অংশ ছিল। কলকাতা ও হাওড়ার অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ বস্তি ছিল এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চল এর বাইরে আরও ১০০০ বস্তি ছিল বলে জানা যায়। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন এর অধীনে বস্তিগুলির উন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্ম শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে বস্তিবাসীদের ঘরে এবং রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কলকাতা অঞ্চলের বেশকিছু কাউন্সিলর, কলকাতা কর্পোরেশনের এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব অঞ্চলের বস্তিগুলোতে পথবাতি এবং বস্তির গৃহস্থবাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থার প্রচেষ্টা করতে থাকে। অশোক মিত্র এই উন্নয়নের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়েই কিভাবে বস্তিবাসীদের আরো এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা নিয়ে কর্পোরেশনকে বিশদে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বস্তিতে বসবাসকারী যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বস্তিতে বসবাসকারী সকল যুবক-যুবতীদের যদি পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করা যায় তাহলে তা বস্তির সামগ্রিক

উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হবে।[১২১] কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের বস্তিতে ও তৎসংলগ্ন রাস্তায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক কাজ। ১৯৭২ সালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে, বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বস্তি অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু ১০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ ছিল কম কারণ সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে এইসব অঞ্চলে যদি সঠিকভাবে উন্নয়ন করতে হয় তাহলে ন্যূনতম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা মাথাপিছু খরচ প্রয়োজন। যার মধ্যে পরিকল্পনায়, রাস্তা ও তা আলোকিত করার জন্য মাথাপিছু ১৫ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল।[১২২] পাশাপাশি কলকাতা থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হুগলি জেলার অন্তর্গত বৈঁচি অঞ্চলের পীরগ্রামে ১৯৭২ সালে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়। এটি ভৌগোলিক ভাবে কলকাতার অন্তর্ভুক্ত না হলেও এটি কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট এলাকার অন্তর্গত ছিল।[১২৩]

ইতিমধ্যেই জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৯ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি ইউনিট প্রতিস্থাপন করা হয়ে গিয়েছিল। লিটিল রঙ্গীত প্রকল্পের কাজও আশানুরূপ গতিতে এগিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। সত্তরের দশকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক ব্যবহৃত ডিজেল সেট ক্রয়। উত্তরবঙ্গের বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে, আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, গুজরাট, ফারাক্কা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কেনা, ব্যবহৃত (সেকেন্ড হ্যান্ড) ডিজেল সেটগুলি শিলিগুড়ি, কোচবিহার, বীরপাড়া এবং জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। আন্তঃরাজ্য চুক্তি অনুযায়ী বিহার থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ উত্তরবঙ্গে আনার জন্য ডালখোলা শিলিগুড়ি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়োজনীয় স্টিলের অভাবে পর্ষদকে এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ৯ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন

প্ল্যানিং কমিশন, কেন্দ্রীয় ওয়াটার ও পাওয়ার কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর বিভিন্ন আধিকারিকরা। বৈঠকের সভাপতি ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এর মতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাব হলেও ঐ বছরের মধ্যেই সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ, সাঁওতালডিহি-পুরুলিয়া ১৩২কেভি লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছিলেন। কলকাতা অঞ্চলের বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর জন্য ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ২৫০ কিমি লম্বা সাঁওতালডিহি-হাওড়া এবং ১০০ কিমি লম্বা সাঁওতালডিহি-দুর্গাপুর এই দুটি লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি দুর্গাপুর এবং কলকাতার কসবা-এর মধ্যে একটি ২২০কেভি লাইন এবং আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ির মধ্যে একটি ১৩২ কেভি লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং অঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য লাইন স্থাপন এবং একটি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রকল্পে আনুমানিক প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানা যায়। একই সঙ্গে এইসময়ে কিছু কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত পরিকল্পনাও এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছিল, যেমন- আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাথে মিলিত ভাবে আলিপুরদুয়ার-বঙ্গাইগাঁও লাইন এবং বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে মিলিত ভাবে শিলিগুড়ি-পূর্ণিয়া লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।[১২৪] ইতিমধ্যেই ১৯৬৮ সালের বন্যায় প্রচন্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লিটিল রঙ্গীত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দুটি ইউনিটই চালু হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কার্শিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি এখনো অবধি অনুমোদন পায়নি। ডিসেরগড় থেকে চারটি ১.৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন উৎপাদন যন্ত্র উত্তরবঙ্গের চাপড়ামারিতে আনার কথা হলেও জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের তিনটি ইউনিট চালু হয়ে যাওয়ায় এবং বিহার থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ডালখোলাতে পৌঁছে যাওয়ায় এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল।[১২৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের

জন্য ১৯৭২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রুদ্রনগরে ১২৮ কিলোওয়াট, একটি ৩২ কিলোওয়াট এবং একটি ২৫ কিলোওয়াটের ৩টি এবং ১৯৭৩ সালে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে একটি ডিজেল জেনারেটার সংস্থাপন করেছিল।[১২৬]

বন্যা পরবর্তী উত্তরবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় ভালো স্থানে থাকলেও পাওয়ার হাউস ঠিক থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের ২৪শে জুন হলদিবাড়ি অঞ্চলে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। ২৩শে জুন রাতে থেকেই জলঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। সব কর্মীর উপস্থিতিতে এরূপ কি করে ঘটল তার কোন সদুত্তর পর্ষদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি।[১২৭] এরূপ পরিস্থিতিতে তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী গনি খান চৌধুরী দাবী করেছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের কাজে রাজ্যের অগ্রগতি আশাদায়ক। তিনি জানিয়েছিলেন যে আনুমানিক ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে নতুন প্রায় ৮০০০ মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে এবং প্রায় ১৬০০ গভীর নলকূপ বিদ্যুতচালিত করা হয়েছিল। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিগম এই প্রকল্পের জন্য ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দিয়েছিল।[১২৮] সমসাময়িক সময়ে আই.এন.টি.ইউ.সি-র ডাকে রানীগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানির কর্মীরা ধর্মঘট করলে স্থানীয় অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল। আই.এন.টি.ইউ.সি নেতা শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এই ধর্মঘটের জন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে রানীগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থাকে জাতীয়করণের দাবি জানান।[১২৯] ২৬শে জুন থেকে প্রায় ৫দিন এই ধর্মঘট চলার পর ১লা জুলাই এই ধর্মঘট প্রত্যাহিত হয়েছিল।[১৩০] সমসাময়িক সময়ে পরিকল্পনা কমিশন, পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি দিয়েছিল বলে জানা যায়। প্রকল্পটির রূপায়ণে আনুমানিক ১১৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রকল্পটির জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম পুরোটাই দেশের নিজস্ব

উৎপাদন হবে বলে জানা গিয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা রাণীগঞ্জ কয়লাখনি থেকে সরবরাহিত হবে।[১৩১]

কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে. সি. পন্থ্ লোকসভায় বলেছিলেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির হয়েছিল তার চেয়ে ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট কম বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার সদস্য শ্রী এস. এম. ব্যানার্জি প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলে, শ্রী কে সি পন্থ্ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সংকটের কথা স্বীকার করেছিলেন। বিশেষ করে ব্যান্ডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থা খুবই শোচনীয় বলে তিনি স্বীকার করেন।[১৩২] একথা অনস্বীকার্য যে সত্তরের দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অবস্থা নিম্নমুখী। ৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যের মাত্র ১০% গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল, যা জাতীয় গড় ২১ শতাংশেরও নিচে। এই অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় একটি ১৬ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬২২ মেগাওয়াট অথচ ১৯৭৩ সাল অবধি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩৮৬ মেগাওয়াট। ১৯৭৩ সাল অবধি উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ২৩০৮ কিলোওয়াট এবং যার মধ্যে ১৯৮৮ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ বিক্রি হয়েছিল।[১৩৩] অপরদিকে এই সময়ে কলকাতার বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছিল এবং লোডশেডিং-র মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বেলগাছিয়ার বীরেন্দ্রনগর এবং সেন্ট্রাল ডেয়ারি সংলগ্ন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক অভিনব পন্থায় লোডশেডিং করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। স্থানীয় মানুষরা অভিযোগ করেছিলেন যে, কর্পোরেশনের কর্মীরা এসে বেলগাছিয়া ভিলার ভিতরের ট্রান্সফর্মারটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, এই লোডশেডিং কোন

ভাবেই স্বাভাবিক নয় বরং তা কৃত্রিম বলেই অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন।[১৩৪] কলকাতার পাশাপাশি দুর্গাপুরেও এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা চলতে থাকে। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ, ১৪০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুর্গাপুরের ৩ নং কেন্দ্রটি চালু করলেও সামগ্রিক ভাবে দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা অসফল হয়েছিল, যা পরিস্থিত স্বাভাবিক করতে পারেনি।[১৩৫] এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. বি. এ. গনি খান চৌধুরী, ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিদ্যুতের রেশন ব্যবস্থা চালু হবে বলে জানিয়েছিলেন। এই ব্যাবস্থা চালু হলে কলকারখানাগুলোতে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ হবে বলে জানানো হয়েছিল। একই সাথে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার এই সঙ্কট এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা নির্ধারণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নির্দেশে একটি কমিশন গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রস্তাবিত এই কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন।[১৩৬] রাজ্যের তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী তরুণকান্তি ঘোষ ঐ সময়ে মহাকারণে দুদফায় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. বি. এ. গনি খান চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রথমে বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে এবং উভয়ে পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী, এই সঙ্কটকালীন পরিস্থিতির অনিশ্চিয়তা দূর করার জন্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির থেকে সর্বনিম্ন কত পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব তা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেছিলেন।[১৩৭] অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের উপমন্ত্রী সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ, ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল লোকসভায় জানান যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ফারাক্কায় একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যা প্রয়োজন পড়লে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আরও বিস্তার করা হতে পারে। শ্রী প্রসাদ স্বীকার করেছিলেন যে, গত কয়েক মাস যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাপক

অবনতি ঘটেছে এবং তার ফলে লোডশেডিং এর মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভাগের বিদ্যুৎ উত্তরপ্রদেশকে দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে কম সংখ্যক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন না বাড়ার বিষয়টিকে এই সংকটের জন্য দায়ী করেছিলেন।[১৩৮] উল্লেখযোগ্য ভাবে এর কিছুদিনের মধ্যেই পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পটিকে রাজ্যের চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন প্রদান করেছিল।[১৩৯] ইতিমধ্যেই আবার কলকাতার উল্টোডাঙা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে সি.ই.এস.সি-র (উত্তর কলকাতা শাখা) অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল। ঘন ঘন লোডশেডিং হওয়ায় কলকারখানা ও স্থানীয় অধিবাসীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে লোডশেডিং বন্ধের জন্য বিক্ষোভকারীরা অফিস কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাগরিক কমিটির সভাপতি শ্রী দীপক রায়চৌধুরী, ডঃ বিমল চক্রবর্তী, শ্রী সুনীল কুমার পাল প্রমুখ নেতৃত্ববৃন্দ।[১৪০]

এই সময়ে পূর্বাঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অ্যাসোসিয়েশানের মুখপাত্র জানিয়েছিলেন যে, বিদ্যুৎ ছাটাইয়ের ফলে গত তিনমাসে সংগঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় ২৬ কোটি টাকার উৎপাদন কম হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাসোসিয়েশন মনে করেছিল বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের সমস্যা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমাধানের চেষ্টা করা দরকার। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে তাদের পুরানো যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর অনুমতি দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা এবং কলকাতার বাইরের অঞ্চলের শিল্পগুলিতে বিদ্যুতের যোগানের তারতম্য

নিয়েও সরব হয়েছিল।[১৪১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনে এসে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী কে. সি. পন্থ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার খামতির কথা তিনি তুলে ধরেছিলেন।[১৪২] তিনি রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সংকটের শোচনীয় অবস্থার কথা স্বীকার করে রাজ্যকে কেন্দ্র মারফৎ সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদিও তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের এই বেহাল দশার জন্য বর্ধিত চাহিদা ও অপর্যাপ্ত উৎপাদনের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায় যে চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা প্রায় ৭০% বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই অনুপাতে উৎপাদন মাত্র ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। সি.ই.এস.সি, ডিভিসি, ব্যান্ডেল ও দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় কমে গিয়েছিল, যা শুধুমাত্র কলকাতারই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। একথা স্পষ্ট যে এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের ভঙ্গুর অবস্থার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।[১৪৩] পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে নিয়ে তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. বি. এ. গনি খান চৌধুরী, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন, বিরোধী দলের নেতা তিমির ভাদুড়ী, সিপিআই নেত্রী গীতা মুখার্জি, কংগ্রেসের মৃগেন মুখার্জি ও অন্যান্য জন প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেছিলেন। এই মিটিং-এ বিরোধীপক্ষ ও সিপিআই প্রতিনিধিরা এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে দায়ী করে তার পদত্যাগ দাবী করেছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এইগুলিকে সিপিআই ও আরএসপি-র 'রাজনৈতিক স্টান্ট' বলে মন্তব্য করেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রীও তাঁর জবাবী ভাষণে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেক প্রতিনিধি আবার এই বিভ্রাটের

জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ধর্মঘটী ইঞ্জিনিয়ারদের কথাও এই আলোচনায় তুলে ধরেছিলেন।[১৪৪] ১৯৭৪ সালের ২৬শে এপ্রিল, হাওড়া থানা অঞ্চলের মতি ঘোষ লেনে, লোডশেডিং-এর সময়ে শঙ্কর কাহার নামক তিন বছরের এক শিশুর খোলা নর্দমায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল।[১৪৫] অবশেষে প্রায় এক সপ্তাহ পরে সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন চালু করায় ও ধর্মঘটী ইঞ্জিনিয়াররা পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ায় পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল।[১৪৬] দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই বিদ্যুতবিভ্রাট পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও কলকারখানাগুলিকে বিদ্যুতের যোগান নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন সংস্থাগুলি নিজ উদ্যোগে তাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র সংস্থাপনের কাজ শুরু করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৭৫ সালে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তাদের দূর্গাপুর প্রকল্পের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে ১৫ মেগাওয়াট টার্বো জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। মূলত দূর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার দূর্বলতার জন্যই এই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়েছিল। কর্পোরেশনের কাজের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হলেও দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড থেকে ১৯৭৪ সালে ১৯ বার (২৮ ঘন্টা ২৪ মিনিট), ১৯৭৫ সালে ৯ বার (৪ ঘন্টা ৫০ মিনিট) এবং ১৯৭৬ সালে ৬ বার (২ ঘন্টা ৩০ মিনিট) বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মূলত এই অব্যবস্থার জন্যই কর্পোরেশন বাধ্য হয়েছিল নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে।[১৪৭] এর ঠিক এক বছর পরে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রী অশোক মিত্র ১৯৭৬ সালের একটি কর্মশালার সভাপতি হয়ে কর্মশালায় যোগদানের জন্য কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময়ে বিদ্যুতশিল্পের বিষয়টি ক্রমশ কেন্দ্রীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এবং এই বিষয়টি আর কোনভাবেই শুধুমাত্র রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং তা ক্রমশ জাতীয় স্বার্থে রূপান্তরিত হতে

চলেছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার মধ্যে তাপবিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুতের অনুপাত কিরূপ হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় ছিল। রাজ্যগুলির ভূমিকা যে একেবারেই নগণ্য হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলগুলি বণ্টনব্যবস্থা ছিল অনিয়ন্ত্রিত অবিন্যস্ত। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ভিন্ন তাই এই অঞ্চলগুলিতে সরবরাহের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা এক অন্যতম কঠিন কাজ ছিল। এই কর্মশালার সভাপতি, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সকে পরামর্শ দেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড এবং দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনকে একত্রিত করে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করার যারা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতায়নের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কাজ করবে।[১৪৮] **১৯৭৬** সালে ভারতীয় বণিকসভা, কেন্দ্রীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর সাথে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল। এই আলোচনার মধ্যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের কথা উঠে এসেছিল।[১৪৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার শিল্পোন্নতির সাথে সাথেই কলকাতার নগরায়নের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বলা বাহুল্য তাল মিলিয়ে বিদ্যুতের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপভোক্তাদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন একই ঠিকানায় একাধিক বৈদ্যুতিক মিটার দেওয়ার নিয়ম চালু করেছিল। যেসকল বাড়িতে ভাড়া দেওয়া হত সেই সকল বাড়ির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট সময় অবধি বিদ্যুতের বিল প্রদান বকেয়া থাকলে কর্পোরেশন থেকে এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে

দেওয়ার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের রীতিও প্রচলিত ছিল।[১৫০] সামগ্রিকভাবে বিদ্যুতশিল্পের পক্ষে কঠিন পরিস্থিতি হলেও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান নাগরিক স্বাছন্দ্য ও উপভোক্তাদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এরূপ সুবিধা প্রদান করেছিল বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের 'ভারতীয়করণ'-র কাজ শুরু হয়েছিল।

১৯৭৬ সালের ১৯শে জুলাই, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তর, বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ পরিকল্পনা রূপায়ণের নির্দেশ দিয়েছিল। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সংস্থা এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিল যে পরিকল্পনা তৈরির সময়ে রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাধারণ উন্নয়নমূলক প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। নীতি নির্ধারকদের বিদ্যুতের সহজলভ্যতা ও ট্রান্সমিশন ব্যবস্থাসহ, বিদ্যুতায়নের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পল্লী বৈদ্যুতিকরণ সংস্থা ১৯৭৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ১২৩৯টি প্রকল্প মঞ্জুর করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে মোট ৩১১ কোটি টাকা দিয়েছিল।[১৫১] এই সময়ে দিল্লীতে কেন্দ্রীয়স্তরে সকল রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের নিয়ে একটি দুইদিন ব্যাপী উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর শেষদিন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ফারাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী কে. সি. পন্থ সম্মেলন শেষে সাংবাদিক সম্মলন করে জানিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সূত্র হিসেবে ফারাক্কা প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তাবটি কেন্দ্র পরীক্ষা করে দেখতে রাজি হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ

পর্ষদগুলির জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের থেকে ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া সরলীকরণের প্রশ্নটিও এই সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছিল।[১৫২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জোর দেওয়ার অন্যতম কারণ হল উত্তরবঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগ ও বিদ্যুতের ঘাটতির জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় এর নিকটস্থ অঞ্চলে একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. বি. এ. গনি খান চৌধুরী রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকে অবিলম্বে এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কিছু সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যা বিদ্যুতের এই ক্রমবর্ধিত চাহিদাকে কিছুটা সামাল দিতে সক্ষম ছিল।[১৫৩]

১৯৭৮ সালে কলকাতা থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণের উপকুলে কোলাঘাট অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ২১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার ৬টি ইউনিট সম্বলিত কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল। এই প্রকল্পে দেশীয় প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি, ১৯১০ সালের ইন্ডিয়ান ইলেক্ট্রিসিটি অ্যাক্ট ও ১৯৪৮ সালের ইন্ডিয়ান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুবাদে সরাসরি সরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে টাকা ধার করতে পারত না। কোলাঘাটের মত বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান' গঠন করে এই সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে দেশের প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র অর্থাৎ 'সিদ্রাপং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অধিগ্রহণ করেছিল। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দার্জিলিং জেলার রিনচিংটনে ১৯৭৯ সালের ৮ই মার্চ দুটি ১ মেগাওয়াট

নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপিত হয়। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ছিল।[১৫৪] ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন ৩২০.৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ন্যাশেনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ৩টি ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বয়লার এবং ৪১০ কেভি-র ৪০০ কিলোমিটার বন্টন লাইন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়টিকে অনুমোদন দিয়েছিল। ১৯৭৮ সালের প্রকল্পের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম ২০০ মেগাওয়াটের ইউনিটটি ১৯৮৩-৮৪ সালে চালু হওয়ার কথা থাকলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে তা পিছিয়ে ১৯৮৫-৮৬ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে পূর্বের তুলনায় ১০৮% এবং বন্টন ব্যবস্থা প্রস্তুতিতে প্রায় ৯৩% অতিরিক্ত ব্যয় হলে কর্তৃপক্ষ ৬২২.৮২ কোটি টাকার সংশোধিত ব্যয় ঘোষণা করেছিল।[১৫৫] এর কিছু দিনের মধ্যেই ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ১০০৩.৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা ঘোষিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই উৎপাদিত বিদ্যুৎ বন্টনের প্রয়োজনীয় ফারাক্কা-জিরহাট, ফারাক্কা-বিহারশরীফ ও ফারাক্কা-দুর্গাপুরের মধ্যে বন্টন লাইন এবং বিহারশরীফে একটি ৪০০ কেভি ট্রান্সফরমার স্থাপনের পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফারাক্কা প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কয়লা রাজমহল কয়লাখনি অঞ্চলের হুরা ব্লক এবং প্রয়োজনীয় জল ফারাক্কার বারোমেসে (পেরনিয়াল) খাল থেকে সংগৃহীত বলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল। বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পের জন্য ২৬০-৩০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতালীয় সরকার ও মেসার্স আনসালডো নামক এক সংস্থা এই প্রকল্পে ৫০০ মেগাওয়াটর দুইটি বয়লার প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ আগ্রহী ছিল। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয় যে ইউনিট দুটি যথাক্রমে ১৯৯০-৯১ ও ৯১-৯২ সালে চালু হবে।[১৫৬] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেটে ১৯৮০-৮১ সালের বার্ষিকী রাজ্য পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও বিদ্যুতের মোট অগ্রাধিকারভুক্ত

ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশ খানিকটা বাড়ানো হয়েছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১৯৭৯-৮০ সালে ১৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও তা পরের বছর বাড়িয়ে ১৪৫ কোটি টাকা করা হয়েছিল। রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র জানিয়েছিলেন যে ঐ বছরেই একশো মেগাওয়াট বাড়তি উৎপাদনের জন্য স্বল্পমেয়াদী গ্যাস টারবাইন সংস্থাপন প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ছিল সাঁওতালডিহি, কোলাঘাট, ব্যান্ডেল, দুর্গাপুর ও টিটাগরের প্রকল্পগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করা।[১৫৭] ১৯৭৯-৮০ সালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের ১১ই মার্চ অর্থমন্ত্রী শ্রী আর ভেঙ্কটরামন সংসদে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য মৌল ক্ষেত্রগুলির দুর্দশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় তা সকল ক্ষেত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি মেটানোর জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা সরবরাহের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছিলেন।[১৫৮] এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে সারা ভারতে বিদ্যুতের ঘাটতি থাকলেও দেশের পূর্বাঞ্চলে সেই অবস্থা ছিল শোচনীয়। মূলত উচ্চমানের কয়লার অভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। আবার উল্টোদিকে এটাও সত্যি যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ায় কয়লা উত্তোলনের কাজও বিঘ্নিত হয়েছিল। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কয়লাখনি অঞ্চলে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য, বিদ্যুৎমন্ত্রী, ডি.ভি.সি ও বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৫৯] এই একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্যের অবসানের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আহ্বান জানিয়ে দেশব্যাপী উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের সাথে সহযোগিতার কথা বলেন।[১৬০] নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার প্রাক্কালে ১৯৭৯-৮০ সালের আর্থিক বর্ষে শিল্পোৎপাদনের নিম্নমুখী হারের কারণে প্রধানমন্ত্রী এরূপ প্রতিক্রিয়া

দিয়েছিলেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে শিল্পোৎপাদন প্রায় ৭.৬% হারে বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালে তা ০.৮% হারে হ্রাস পেয়েছিল। এই ঘাটতির জন্য অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ। একদিকে অনাবৃষ্টির জন্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং অপরদিকে উচ্চমানের কয়লার পর্যাপ্ত যোগান না থাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিও প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে অসফল হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যুতের চাহিদা এই সময়ে প্রায় ১৬% বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন বেড়েছিল মাত্র ২%।[১৬১] পশ্চিমবঙ্গে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু রাজ্য বিধানসভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ব্যয়মঞ্জুরীর দাবী পেশ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদনে সক্ষম। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই পরিমাণ বাড়িয়ে ১৬০০ মেগাওয়াট করার লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছিল। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে পর্ষদের প্রত্যক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বণ্টনযোগ্য বিদ্যুতের চাহিদা ২০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে আনুমানিক ৮০০ মেগাওয়াট হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা করেছিলেন যে কোলাঘাট, সাঁওতালডিহির চতুর্থ ইউনিট ও ব্যান্ডেলের পঞ্চম ইউনিটটি চালু হলে এই বর্ধিত চাহিদা সামাল দেওয়া সম্ভবপর হবে। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ৬০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজও দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। তবে এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সমস্যা নিয়েও তিনি তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন।[১৬২] যদিও ১৯৮০ সালের ২৫শে নভেম্বর দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক (জেনারেল ম্যানেজার) শ্রী এস বি দেব এক চিঠির মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রককে তাদের প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গে নতুন একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কথা জানিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গঙ্গাজলঘাটি থানার মৌজার অন্তর্গত মেজিয়ায় ২৬৭ কোটি টাকা খরচ করে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন

তিনটি ইউনিট বসানোর পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছিল।[১৬৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিদ্যুতশিল্পের এরূপ করুণ অবস্থার মধ্যেও বিদ্যুতশিল্পের পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। লাদাখের চোগলামসার গ্রামে ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার পর বিশ্বের দ্বিতীয় ও ভারতবর্ষের প্রথম সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ, স্থানীয় একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হসপিটাল ও একটি বড় রান্নাঘর আলোকিতকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এই কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও নক্সা প্রস্তুত করেছিল বলে জানা যায়।[১৬৪] পশ্চিমবঙ্গের সাথে সম্পর্কিত না হলেও ভারতের বিদ্যুতশিল্পের ক্ষেত্রে এই আধুনিক প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।

১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে কয়লার উত্তোলন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় যা পক্ষান্তরে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছিল।[১৬৫] এর ফলস্বরূপ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে পূর্বের তুলনায় বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৮০ সালে ডিসেম্বরে, দেশব্যাপী মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯১৭ মিলিয়ন ইউনিট যার মধ্যে পূর্বাঞ্চলের বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ১৬.১%।[১৬৬] কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের পরিচালনাধীন শিল্পসংস্থাগুলিতে ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ২৫৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার উৎপাদন হয়েছিল, যা গতবছরের উৎপাদনের তুলনায় ৪২.৬৩% বেশী।[১৬৭] ১৯৮১-৮২ আর্থিকবর্ষের পরিকল্পনা যোজনার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়ায় বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ৩১৮০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পায় যা পূর্বের তুলনায় ১৩% বা বেশী ছিল।[১৬৮] কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বিক্রম মহাজন জানিয়েছিলেন যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ১৯,২৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রায় ২০০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল যার মধ্যে ৭২% তাপবিদ্যুৎ, ২৪% জলবিদ্যুৎ ও ৩.৫% পারমাণবিক চুল্লি থেকে সংগৃহীত হবে।[১৬৯] কেন্দ্র ও রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ১৯৮২ সালের এপ্রিল-মে এই দুই মাসে বিদ্যুতের উৎপাদন হয়েচ্ছিল ২১২৫.৫০ কোটি ইউনিট যা গতবছরের তুলনায় প্রায় ৭.২% বেশী এবং পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৪.৫% ছিল।[১৭০] অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২ সালের ৩১ শে মার্চ অবধি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬১৩.৫ মেগাওয়াট। পাঞ্চেত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৪০ মেগাওয়াট), বোকারো 'বি' তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প (২১০ মেগাওয়াট) এবং বোকারো 'বি' তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায় (৪২০ মেগাওয়াট) এর সাথে সংযুক্ত হলে আরো ৬৬০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। উল্লিখিত প্রথম দুটি প্রকল্প, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে এবং তৃতীয় প্রকল্পটি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হয়। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ পূর্বাভাস ছিল আগামী দিনে তাদের বিদ্যুতের ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। এই ঘাটতি ৮৫-৮৬ সালে ১৪৯৫ মেগাওয়াট থেকে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯-৯০ সালে গিয়ে প্রায় ২৫৩৮ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে।[১৭১] এই ঘাটতির কথা মাথায় রেখেই দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ১৯৮২ সালের ১২ই মার্চ মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকে পাঠিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তিনটি ২১০ মেগাওয়াটের উৎপাদক যন্ত্র বসিয়ে উৎপাদন কেন্দ্রটি শুরু করার কথা হলেও এই উৎপাদন কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১১০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা প্রস্তুত করা সম্ভবপর ছিল বলে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ কম থাকলেও কালিদাসপুর ও মধুকুণ্ড এর মধ্যবর্তী ১৬ কিলোমিটার রেল সংযোগের জন্য অসামরিক ও যন্ত্রপাতির খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই প্রকল্পের খরচ বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। দামোদর ভ্যালী কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী এই প্রকল্পের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় তহবিলের প্রায় ৫০%

তারা তাদের অভ্যন্তরীণ তহবিল থেকে খরচ করতে সক্ষম ছিল। কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ হিসেব অনুযায়ী, ১৯৮৭-৮৮ সালে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন-এর চাহিদা হবে ১৮১৮ মেগাওয়াট কিন্তু মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া কর্পোরেশনের মোট উৎপাদন ওই সময়ে দাঁড়াবে ১২২৭ মেগাওয়াট। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে, মেজিয়ার উৎপাদন যুক্ত হওয়ার পরও ২১৯ ইউনিটের ঘাটতি থাকবে যা বার্ষিক ১০% উৎপাদন বৃদ্ধির ঘটিয়ে সামাল দেওয়া সম্ভবপর ছিল। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই কর্পোরেশন এই প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের পরিবেশ দপ্তর, ওয়েস্টবেঙ্গল প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ওয়াটার পলিউশন বোর্ড এবং স্মোক ন্যুইসেন্স ডিটেক্টর এর থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র যোগাড় করেনিয়েছিল।[১৭২] দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালে তারা মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি চালু করার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর বাকি ইউনিটগুলি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল। মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য যে বিপুল কয়লা প্রয়োজন ছিল তা কালিদাসপুর ও দামোদর নদের উত্তরে অবস্থিত রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন যন্ত্র ঠান্ডা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যহ ১৩০ মিলিয়ন লিটার জল দামোদর নদ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল।[১৭৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের ২৯শে মার্চ, ১৬ দফা দাবি নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে, পুরুলিয়ার হুরা অঞ্চল থেকে এক বিশাল পদযাত্রা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলার মধ্যে দিয়ে প্রায় ২৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১৯৮২ সালের ৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে পৌঁছেছিল। এই মিছিলের অন্যতম প্রধান একটি দাবি ছিল মেজিয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা।[১৭৪]

১৯৮৪ সালে মেজিয়া প্রকল্পের খরচ বৃদ্ধি পেয়ে আনুমানিক ৫৬৬ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যদিও সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য শর্তসাপেক্ষ ৪৭১.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল।[১৭৫] অপরদিকে ফারাক্কার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি জুলাই মাসে শুরু হওয়ার কথা ছিল। ফারাক্কার প্রথম পর্যায়ের কাজ চালু হয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ২০৫ মেগাওয়াট, বিহার ১৩৫ মেগাওয়াট, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ৯০ মেগাওয়াট এবং উড়িষ্যা ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে। একই সময় ভুটানের চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও উৎপাদন শুরু করবে বলে জানা গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে চুখা প্রকল্প থেকে বিহার, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ সহযোগিতা লাভ করবে। এই প্রকল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গ ৭৫ মেগাওয়াট, বিহার ৬৬ মেগাওয়াট, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ৪৫ মেগাওয়াট এবং উড়িষ্যা ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে বলে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা জারী হয়েছিল।[১৭৬] এর ঠিক এক বছর পর অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের সভাপতি ডঃ রাজা রামান্না, ১৯৮৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সির ২৮তম সাধারণ সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছিল যে শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহারে ভারত ক্রমশ অগ্রগতি করছে এবং পারমাণবিক চুল্লি পূর্বের তুলনায় অনেক দ্রুত এবং সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে। পুরোপুরি দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি ২৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভারী জলের পারমাণবিক চুল্লি (হেভি ওয়াটার রিয়্যাক্টার) দ্বারা নির্মিত মাদ্রাজ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছিল। এই চুল্লির সফলতার হার ছিল প্রায় ৮০%। এরপরে স্থাপিত রাজস্থান কেন্দ্রটির চুল্লির সফলতার হার ছিল প্রায় ৮৬%। পরবর্তীকালে শুরু হওয়া তারাপুর কেন্দ্রের চুল্লির সফলতার হার ছিল

প্রায় ৯৩%। পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যেকোন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি ভারত তার নিজস্ব ক্ষমতায় কুক্ষিগত করে স্বয়ংক্রিয়তা অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে দাবী করেছিলেন।[১৭৭] মূলত একবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে ক্রমশ অচিরাচরিত মাধ্যমে বিদ্যুতের উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তি অনুসারে কর্পোরেশন তার ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তৈরি ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট সংস্থাপিত হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।[১৭৮] পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার কোলাঘাট, সাঁওতালডিহি ও ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার যোগান ত্বরান্বিত করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কয়লা দপ্তরকে অনুরোধ জানিয়েছিল। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অরুণ নেহেরু পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কাজ সঠিক সময়ে শেষ না হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়ে, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল যার ফলস্বরূপ সাঁওতালডিহিতে উন্নতমানের কয়লার যোগান ও আধুনিক ব্যবহার পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অতিরিক্ত এক কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রতিনিধি দল সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিল।[১৭৯]

১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণ হল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৮৯১৩ কোটি, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৪৯৭৭ কোটি ও পারমানবিক কেন্দ্র থেকে ৩৬৩ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১২.৫% বেশী ছিল। সপ্তম যোজনায় রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে জোর দিয়েছিল। প্রথাগত বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও সাগর তরঙ্গ ও সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয় নিয়ে কেন্দ্র বিদেশী অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।[১৮০] একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির দিকে বিদ্যুতশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা এবং একই সময়ে সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষদেরকে এই প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ‘লোকদীপ প্রকল্প’ নামক এক প্রকল্প চালু করে এবং ১৯৮৬ সালের ৩১শে মার্চ এই প্রকল্পের অধীনে হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ১নং ব্লকের অন্তর্গত মালিপুকুর গ্রামের দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত ৩১টি তপশীল পরিবারের গৃহে মাসিক ৫ টাকার বিনিময়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছিল।[১৮১] ইতিমধ্যেই কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ২১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট ১৯৮৫ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাহকদের স্বস্তি দিয়ে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান সমস্ত নিয়ম মেনে টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন করেছিল। ৪টি ৬০ মেগাওয়াটের ইউনিট যথাক্রমে ১৬ই মার্চ ১৯৮৩, ৬ই জুলাই ১৯৮৩, ১৬ই জুলাই ১৯৮৪ এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছিল। ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ইউনিটটি ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি ও দ্বিতীয় ইউনিটটি ঐ বছরের ২৬শে ডিসেম্বর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছিল।[১৮২] ১৯৭৭ সালে যখন রাজ্যে তীব্র বিদ্যুৎ সংকট

চলেছিল তখন বিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। তখন দৈনিক গড়ে আধঘন্টা মত লোডশেডিং হত। তবে পরবর্তীকালে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে আকস্মিক বিপর্যয় ছাড়া পূর্বের মত লোডশেডিং-এর ঘটনা লক্ষ্য করা যায়নি। বিদ্যুৎ সংকটের মূল কারণ অনুসন্ধান, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট প্রয়াস এবং সর্বোপরি নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতে অধিকতর বিনিয়োগের ফলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির এই উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, দূর্গাপুর প্রজেক্টেস লিমিটেড ও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত ১৩৩০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সব ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং সেগুলি যাতে সঠিকভাবে চালানো হয় তার দিকেও নজরদারি চালিয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলস্বরূপ রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৮৮ সালে এই রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা গত দশ বছরের তুলনায় প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫০ মেগাওয়াট হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের সংকটজনক অবস্থা কেটে যাওয়ায় শিল্পক্ষেত্রেও বিদ্যুতের ব্যবহারের ওপর আরোপিত অনেক বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে।[১৮৩] আবার রাজ্য সরকারের উদ্যগে ইতিমধ্যে বীরভূমের বক্রেশ্বরে ৬৮২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী (বিদ্যুৎ) অরুণ নেহেরুকে চিঠি দিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[১৮৪] এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ এক অন্য মাত্রায় পৌঁছেছিল। রাজ্য সরকার এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল। বামফ্রন্ট ১৯৮৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বক্রেশ্বরে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের দাবী (অন্যান্য দাবীও ছিল) নিয়ে বন্‌ধ ঘোষণা

করেছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে রক্তদান কর্মসূচী, একদিনের বেতনদান প্রভৃতি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।[১৮৫] বক্রেশ্বর প্রকল্পের বিষয়টিকে এমন ভাবেই তুলে ধরা হয়েছিল যেন এই প্রকল্পের উপরই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ছিল। তৎকালীন সময়ে রাজ্য সরকার লকআউট, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সমস্যায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং বক্রেশ্বর প্রকল্পকে ঘিরে তাদের রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল বললে ভুল হবে না।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান ৮০'র দশকের শেষ দিকে সাউদার্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুটি ৬৭.৫ মেগাওয়াট নিহিত ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট চালু করে। এর কিছুদিন পর ১৯৯১ সালে গার্ডেনরিচে কর্পোরেশনের দুটি ৬৭.৫ মেগাওয়াট নিহিত ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন শুরু করে। বজবজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও অতিরিক্ত ৫০০ মেগাওয়াট সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভ করে এবং ১৯৯৫-৯৭ সালের মধ্যে এই দুটি ইউনিটই চালু করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের নাম বদলে সি.ই.এস.সি লিমিটেড হয়েছিল এবং ১৯৮৯ সালে রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন আরপিজি গ্রুপ অফ কোম্পানিসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[১৮৬] অপরদিকে ফারাক্কার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটগুলি ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছিল। এর পাশাপাশি অচিরাচরিত মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জোর দেওয়া হয়। এই রাজ্যে স্বল্প নিহিত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংস্থাপনের কাজ ১৯৯২ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতার বিধান নগরের বিকাশ ভবনের চতুর্থ তলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অপ্রচলিত শক্তি উৎস বিভাগে সংস্থাপনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল।[১৮৭]

অষ্টম পরিকল্পনায় নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি নিয়ে পর্যালোচনা চলেছিল। প্রাথমিকভাবে ১৯৯০-৯৫ সালের মধ্যে ৩৮০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বাড়তি ক্ষমতা ধরা হয়েছিল। এই লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে পূরণ করার জন্য সপ্তম পরিকল্পনা থেকেই কাজ শুরু হয়েছিল। জল, তাপ ও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণ সময় সাপেক্ষ বলে এবং পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান থাকায় অষ্টম পরিকল্পনায় ৬০০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯০-৯৫ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আরো ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প তৈরিতে নিয়োজিত ছিল। এই প্রকল্পে ১৯৯০-৯৫ সালে অতিরিক্ত ৪৮০০০ এবং ১৯৯৫-২০০০ সালে প্রায় ৬২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার অনুমান করা হয়েছিল।[১৮৮] পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে গৌরিপুরে ২টি ৬০ মেগাওয়াট ও সি.ই.এস.সি-র উদ্যোগে হুগলী জেলার বলাগড়ে ৩টি ২১০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি চালু হয়েছিল। এর ঠিক এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় ইউনিট এবং অক্টোবর মাসে আরও একটি ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বক্রেশ্বরের তৃতীয় ইউনিটটি চালু হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই রাজ্য সরকারগুলি বিদ্যুতায়নের কাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে, কাজের নিরিখে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে পুনর্বিন্যাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ২০০১ সালে, সি.ই.এস.সি-র টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ISO 9002 শংসাপত্র পেয়েছিল। অবশেষে ২০০৩ সালের ২রা জুন, ইলেক্ট্রিসিটি অ্যাক্ট ২০০৩ লাগু হয়েছিল। এই আইনানুসারে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টনের

নিরিখে ভেঙে (আনবান্ডেল) দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ও বিদ্যুৎ বণ্টনের দায়িত্ব ২০০৭ সালের ১লা এপ্রিল গঠিত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।[১৮৯] ২০০৭ সালের ২১শে মার্চ, সি.ই.এস.সি-র বজবজ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প ভারতের মধ্যে কয়লা ব্যবহৃত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অসাধারণ কর্মক্ষমতার জন্য তাম্র পদক লাভ করেছিল।

পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারাবাহিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৫১ সালে সারা ভারতে বিদ্যুতশিল্পের নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ৪২% পশ্চিমবঙ্গে সংস্থাপিত ছিল এবং ১৯৯১ সালে গিয়ে তা দাঁড়ায় মাত্র ৪.৫%। পাশাপাশি ১৯৬১ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিক মাথা-পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার ছিল সর্বাধিক কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে গিয়ে তা ভারতের সামগ্রিক গড় ব্যবহারের তুলনায়েও কমে যায়। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ বর্তমান প্রথমত পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হত তাঁর গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন ছিল। মূলত ছাইয়ের পরিমাণ বেশী হওয়ার দরুণ উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কম হত। যেহেতু কয়লা ও বিদ্যুতশিল্প চারিত্রিক ভাবে অনেক বেশী সম্পৃক্ত ছিল তাই উভয়ে একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিল, ফলস্বরূপ নিম্নমানের কয়লার জন্য বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা যায়। অপরদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় কয়লা উত্তোলনেও সমস্যা দেখা যায়। এছাড়াও বিদ্যুতশিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের অসন্তোষ যেমন-১৯৬৮'র অসন্তোষ, ১৯৭৪'র অসন্তোষ বা ১৯৭৭-৭৮'র অসন্তোষ সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। নীতিগত কিছু সমস্যাও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পকে প্রভাবিত করে। কলকাতাব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের বাকি

অঞ্চল ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীনে। পর্ষদ যেহেতু সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল তাই যেকোনো রকম পরিকল্পনা অনুমোদন পেতে ও বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লেগে যেত। ফলস্বরূপ যখন ঐ প্রকল্প বা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত বেশীরভাগ সময়েই সেই পরিকল্পনা তাঁর যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলত। তাছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের বিদ্যুতের মত প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের উৎপাদনরীতি বা বণ্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এই বিষয়টি অনেকাংশে টেকনোক্র্যাটিক নির্ভর ছিল বলে আমার মনে হয়। আবার আইনতভাবে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান নতুন করে প্রসার বা বিস্তারে অপারগ হাওয়ায় কলকাতার বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে কর্পোরেশনকে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও ডিভিসি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হত। যার ফলস্বরূপ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ডিভিসি-র উৎপাদিত বিদ্যুতের নির্দিষ্ট অংশ রপ্তানি করতেই হত যা বিভিন্ন সময়ে তাদের আঞ্চলিক চাহিদাকে প্রভাবিত করেছিল। এর পাশাপাশি ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিকভাবে অস্থির পরিস্থিতি বিদ্যুতশিল্পের মত মৌল ক্ষেত্রকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই সকলের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ তাঁর নিজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতশিল্পের প্রসারে সচেষ্ট হয় এবং বিভিন্ন আধুনিক পন্থায় উৎপাদন ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ বণ্টনের কাজ সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। অচিরাচরিত শক্তির মাধ্যমে বিকল্প সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৩ সালে ওয়েস্টবেঙ্গল রিনিউয়েবেল এনার্জি ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সি স্থাপন করে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের ক্ষেত্রে এই সংগঠন একবিংশ শতকের শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পরবর্তী অধ্যায়গুলির অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু।

সূত্রনির্দেশ

১. Anonymous, “Lahore Electric Supply Company,” The Calcutta Municipal Gazette, VolNo.-XLIV-No.13-16, Calcutta (24th Aug-19th Sep): P-389.

২. Anonymous, “Madras Electric Supply Corporation,” The Calcutta Municipal Gazette, Vol No. XLV, No. 9, Calcutta (1st February): P-249.

৩. Anonymous, “Nationalization of Electrical Service; A Worldwide Move,” The Calcutta Municipal Gazette, Vol No.XLV, No.8, Calcutta (25th January): P-209.

৪. The Electric (Supply) Act, 1948 as amended by THE ELECTRICITY LAWS (AMENDMENT) ACT, 1998, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, Delhi, P-1.

৫. Ashok Mitra Papers, “Papers of the Planning Commission relating to Power, Energy, Electrification Water & Irrigation containing summary records of the meetings, notes, circulars, annexure etc,” Subject File No-168, 1970-71, Nehru Memorial Museum and Library, P-102.

৬. Ministry of Home Affairs, Government of India, “Organisational Set Up-Central Electricity Commission,” File No. RE-4(46)/50, 1950, National Archives of India, Pp-6-8.

৭. Ministry of Finance, Planning Branch, “West Bengal Government Legislation involving Financial Legislature Implications,” File No,- F.4 (8)-P/48,1948 National Archives of India, P-3.

৮. Ministry of Finance, Planning Branch, “West Bengal Government Development Programme for 1948,” File No.- F.5(14)-P/48,1948, National Archives of India, P-13.

৯. ‘West Bengal Government Development Programme for 1948’, তদেব, পৃ-২৩৪-৩৫।

১০. Prime Minister’s Office, Government of India, “Small schemes for development of Power, Quick food production and other matters,” File No. 17(121)/48- PMs, 1948, National Archives of India, P-1N.

১১. Ministry of Home Affairs, Government of India, “Ministry of W. M & P,” File No. - 32/77/50-CS, 1950, National Archives of India, P-1.

১২. Ministry of Home Affairs, Judicial Section, Government of India, “The Madhya Pradesh Electricity (Control) (Extending) Bill, 1950,” File No.-17/159/50-Judicial, 1950, National Archives of India, P-2.

১৩. Devi Sarkar Ganguly, Public corporations in a National Economy (With special reference To India), (Bookland Private Ltd, 1963), Pp-12-18.

১৪. “দামোদর পরিকল্পনার কাজে ব্যয় সংকোচে প্রভূত ক্ষতির আশঙ্কা,” যুগান্তর, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৯, পৃ-৪।

১৫. বিশ্বজিৎ হালদার, ‘প্রসঙ্গঃ বিদ্যুৎ’, পৃ-৮।

১৬. “The Calcutta Electric Supply,” Brochure released on the occasion of the official opening of the New Cossipore Generating Station, Calcutta (4th January, 1950): P-7.

১৭. “কাশীপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র,” যুগান্তর, ৫ই জানুয়ারি ১৯৫০,পৃ-৪।

১৮. “Company Meetings: The Calcutta Electric Supply Corporation, LTD: A Year of Marked Progress,” The Manchester Guardian (27th May, 1949): P-9.

১৯. “ঢাকায় নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা,” যুগান্তর, ১লা জানুয়ারি, ১৯৫০,পৃ-৬।

২০.“কয়লার অভাবে পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গীন অবস্থা,” যুগান্তর, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৫০,পৃ-১।

২১. অমিতাভ রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, (কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৩), পৃ-১৫।

২২. Staff Correspondent, “Electrification of rural areas, Bengal Scheme” The Times Of India, 10th December, 1951, P-9.

২৩. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন,পৃ-১৪।

২৪. “এশিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১৩,৬২৮,০০০,০০০ ডলার ব্যয়বরাদ্দ,” যুগান্তর, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫০, পৃ-৫।

২৫.ভবতোষ দত্ত, ভারতের আর্থিক উন্নয়ন- অর্থনীতি গ্রন্থমালা (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেত লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৮৪), পৃ- ২৭-৩৯।

২৬. দত্ত, ভারতের আর্থিক উন্নয়ন- অর্থনীতি গ্রন্থমালা, পৃ- ৪২-৫২।

২৭. Saroj Chakraborty, With Dr. B C Roy and other Chief Minister (A record upto 1962), (Calcutta; Bensons, 1974), P-185.

২৮. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-১৫।

২৯. “CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY: Year of Development and Expansion,” The Manchester Guardian, 5th July, 1954, P-9.

৩০. “THE CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION, LTD.: A YEAR OF ... Sir James Donald’s Review,” The Times of India, 7 th July, 1954, P-4.

৩১. “CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION,” The Manchester Guardian, 24th June, 1955, P-15.

৩২. “THE CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION: RECORD TURNOVER SIR HARRY BURN'S STATEMENT,” The Times of India, 28th June, 1955, P-4.

৩৩. নিজস্ব সংবাদদাতা, “সেচ ও বিদ্যুৎ,” যুগান্তর, ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৫, পৃ-৫।

৩৪. “পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেচ বিদ্যুৎ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা,” যুগান্তর, ২১ শে এপ্রিল ১৯৫৫, পৃ-৫।

৩৫. স্টাফ রিপোর্টার, “পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি,” ২৮ শে এপ্রিল ১৯৫৫, যুগান্তর, পৃ-৭।

৩৬. প্রেসনোট, “রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ,” যুগান্তর, ১৯শে মে ১৯৫৫, পৃ-৩।

৩৭. Ministry of Home & Affairs, Judicial Section, Government of India, ‘The Damodar Valley Corporation (West Bengal Amendment) Ordinance,1955’, File No.- 28/24/55-Judicial(I),1955, National Archives of India, P-2.

৩৮. Chakraborty, With Dr. B C Roy and other Chief Minister (A record upto 1962), Pp-268-69.

৩৯. Chakraborty, With Dr. B C Roy and other Chief Minister (A record upto 1962), Pp-198-201.

৪০. স্টাফ রিপোর্টার, “পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত শহর ও তিন শতাধিক গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা,” যুগান্তর,২৭ শে মে, ১৯৫৫, পৃ-৩।

৪১. নিজস্ব সংবাদদাতা, “শিল্প কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ,” যুগান্তর, ৩রা জুন ১৯৫৫, পৃ-১।

৪২. নিজস্ব সংবাদদাতা, “সিউড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ,” যুগান্তর, ১৩ই জুন ১৯৫৫, পৃ-৫।

৪৩. “CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION: ANOTHER SATISFACTORY YEAR'S..,” The Times of India, 29th June 1956, P-4.

৪৪. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ. ১৯-২১।

৪৫. “CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION: Continued expansion,” The Manchester Guardian, 27th September 1957, P-15.

৪৬. “THE CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION LIMITED: Increased Demand,” The Times of India, 24th October 1958, P-4.

৪৭. “THE CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION: Increased demand from all classes of consumer” The Manchester Guardian, 24th 1958, P-12.

৪৮. “CALCUTTA ELECTRIC SUPPLY CORPORATION: Sir Harry Bum Reviews Results And Operations,” The Times of India, 16 th Nov 1959, P-4.

৪৯. Ashok Mitra Papers, Bureau of Applied Economics and Statistics, Govt. Of West Bengal, “Backwardness of the districts of West Bengal; A comparative studies,” Subject File No-707, 1971-74, Nehru Memorial Museum and Library, P-235.

৫০. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-২২।

৫১. Daniel Thorner, The shaping of Modern India, (New Delhi: Allied Publishers Pvt, Ltd, 1980) Pp.125-144.

৫২. স্টাফ রিপোর্টার, “সাড়ে পাচশত বিদ্যুতচালিত তাঁত,” যুগান্তর, ১৪ই মার্চ ১৯৬১, পৃ-৩।

৫৩. পি.টি.আই, “বিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বভারতীয় গ্রিড স্থাপন,” যুগান্তর, ১৫ই মার্চ ১৯৬১, পৃ-৬।

৫৪. স্টাফ রিপোর্টার, “সেচ ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যায় বরাদ্দ,” যুগান্তর, ২০ই মার্চ ১৯৬১, পৃ-৫।

৫৫. স্টাফ রিপোর্টার, “পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের বাজেট,” যুগান্তর, ২৪শে মার্চ ১৯৬১, পৃ-৩।

৫৬. স্টাফ রিপোর্টার, “কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট,” যুগান্তর, ৩রা এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-২।

৫৭. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুতের অভাবে শহর ও শহরতলীতে কিছু সময়ের জন্য সরবরাহ বন্ধ,” যুগান্তর, ৭ই এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-৩।

৫৮. স্টাফ রিপোর্টার, “কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ,” যুগান্তর, ৯ই এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-১।

৫৯. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুতের ব্যবহার কমাইবার উপায়,” যুগান্তর, ১১ই এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-৩।

৬০. স্টাফ রিপোর্টার, “নববর্ষ দিবসে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত,” যুগান্তর, ১৫ই এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-৩।

৬১. স্টাফ রিপোর্টার, “সিন্ধি প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যুৎ আনার জরুরি ব্যবস্থা,” যুগান্তর, ১৫ই এপ্রিল ১৯৬১, পৃ- ১ ও ৫।

৬২. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুতের চাহিদার চাপ কমাইবার জন্য কলিকাতা বিজলি কর্পোরেশনের প্রস্তাব,” যুগান্তর, ১৮ই এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-৫।

৬৩. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ সরবরাহে আরও অবনতির আশঙ্কা,” যুগান্তর, ২৪শে এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-১।

৬৪. দিল্লি অফিস, “বিদ্যুতের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর পরিস্থিতি,” যুগান্তর, ২৮শে এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-১ ও ৫।

৬৫. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অপরিবর্তিত,” যুগান্তর, ৩০শে এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-১।

৬৬. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট," যুগান্তর, ৩০শে এপ্রিল ১৯৬১, পৃ-৪।

৬৭. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা," যুগান্তর, ৩রা মে ১৯৬১, পৃ-৩।

৬৮. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সংকট সম্মেলন," যুগান্তর, ৫ই মে ১৯৬১, পৃ-৩।

৬৯. স্টাফ রিপোর্টার, "কাশীপুর কেন্দ্রের এলাকাধীন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ কঠোরতা হ্রাস," ৭ই মে ১৯৬১, যুগান্তর, পৃ-১০।

৭০. স্টাফ রিপোর্টার, "কলিকাতা বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কে তদন্তের দাবি," যুগান্তর, ৮ই মে ১৯৬১,পৃ-৫।

৭১. স্টাফ রিপোর্টার, "মঙ্গলবার বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন," যুগান্তর, ১০ই মে ১৯৬১,পৃ-৩।

৭২. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সরবরাহে বিপর্যয়ের প্রতিবাদে বিরাট শ্রমিক বিক্ষোভ," যুগান্তর, ১২ই মে ১৯৬১, পৃ-১।

৭৩. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ কোম্পানি কর্তৃক স্বীয় গাফিলতি স্বীকার," যুগান্তর, ১৪ই মে ১৯৬১, পৃ-১ ও ৫।

৭৪. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সংকটে শিল্প বিপর্যয়," যুগান্তর, ১৬ই মে ১৯৬১, পৃ-১।

৭৫. স্টাফ রিপোর্টার, "কাশীপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র," যুগান্তর, ৬ই জুন ১৯৬১, পৃ-৩।

৭৬. Ministry Of Finance, Department of Economic Affairs, AID Section, Government Of India, "AID (DLF) Loans; Durgapur Thermal Power Project (DLF Loan No. 130)," File No. 15(14)-EA/DLF/60 Vol. I, 1960, National Archives of India, P-34.

৭৭. স্টাফ রিপোর্টার, "শিয়ালদহ ডিভিশনের বৈদ্যুতিকরণ," যুগান্তর, ৮ই জুলাই ১৯৬১, পৃ-৩।

৭৮. রয়টার, "কলিকাতা রেলপথে বৈদ্যুতিকরণ," যুগান্তর, ২৯শে জুলাই ১৯৬১, পৃ-১০।

৭৯. স্টাফ রিপোর্টার, "ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র," যুগান্তর, ২২শে জুলাই ১৯৬১, পৃ-৫।

৮০. স্টাফ রিপোর্টার, "পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা," যুগান্তর, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১, পৃ-১ ও ৫।

৮১. স্টাফ রিপোর্টার, "বয়লারের গোলযোগের ফলে দুর্গাপুর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বন্ধ," যুগান্তর, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৬১, পৃ-৩।

৮২. স্টাফ রিপোর্টার, "কলিকাতা ও শহরতলীতে বিদ্যুৎ সংকট," যুগান্তর, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬১, পৃ-৩।

৮৩. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ শক্তির অপ্রাচুর্যের ফলে-পশ্চিমবঙ্গে কারখানা স্থাপনের শিল্পপতিদের অনুৎসাহ," যুগান্তর, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬১, পৃ-৪ ও ৫।

৮৪. পি.টি.আই, "ভারতে অতিরিক্ত ৭৩ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা," যুগান্তর, ৬ই মার্চ ১৯৬২, পৃ- ৩।

৮৫. "কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন," বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ৬২শ ভাগ ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৬৯, ১ম সংখ্যা, পৃ- ২।

৮৬. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-১৯।

৮৭. Planning Commission (I & P Division), Government of India, "Electricity Duty Act, 1963 and The rules framed thereunder," File No. - I-5(4) /65-I&P, 1965, National Archives of India, P-14.

৮৮. স্টাফ রিপোর্টার, "ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট," যুগান্তর, ২৭শে মে ১৯৬৬, পৃ-৯।

৮৯. Ashok Mitra Papers, "Papers of the Planning Commission relating to Power, Energy, Electrification Water & Irrigation containing summary records of the meetings, notes, circulars, annexure etc.," Subject File No-168, 1970-71, Nehru Memorial Museum and Library, P-141.

৯০. নিজস্ব প্রতিনিধি, “শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি,” যুগান্তর, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ-৬।

৯১. নিজস্ব প্রতিনিধি, “জলঢাকা প্রকল্পের জল বিদ্যুৎ সরবরাহ,” যুগান্তর, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ-৩।

৯২. নিজস্ব প্রতিনিধি, “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর বক্তব্য,” যুগান্তর, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮,পৃ-৭।

৯৩. নিজস্ব প্রতিনিধি, “পৌরসভা আবার নিষ্প্রদীপ,” যুগান্তর, ২০ই, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ-১০।

৯৪. নিজস্ব প্রতিনিধি, “নিউ ব্যারাকপুরে অচলাবস্থা,” যুগান্তর, ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ-৫।

৯৫. স্টাফ রিপোর্টার, “কলকাতা ও শহরতলিতে বিভ্রাট,” যুগান্তর, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮,পৃ-৫।

৯৬. নিজস্ব প্রতিনিধি, “বিদ্যুতের লাইন নষ্ট,” যুগান্তর, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮,পৃ-৬।

৯৭. “ঠিকানা পরিবর্তন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,” যুগান্তর, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮,পৃ-৭।

৯৮. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ কর্মী ধর্মঘটের অবস্থা,” যুগান্তর, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ-১।

৯৯. স্টাফ রিপোর্টার, “গ্রামের পর গ্রাম অন্ধকার,” যুগান্তর, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ-৫।

১০০. স্টাফ রিপোর্টার, “রেলের অসুবিধা,” যুগান্তর, ৫ই অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ-৫।

১০১. স্টাফ রিপোর্টার, “শহর থেকে বৈদ্যুতিক তার চুরি হচ্ছে,” যুগান্তর, ১২ই অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ-৫।

১০২. স্টাফ রিপোর্টার, "বরাহনগরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অন্ধকার," যুগান্তর, ২৫শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ-৯।

১০৩. নিজস্ব সংবাদদাতা, "বন্যায় জলঢাকা প্রকল্পের ক্ষতি," যুগান্তর, ১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ-১।

১০৪. স্টাফ রিপোর্টার, "বন্যায় ভুটানের ২টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত," যুগান্তর, ১৭ই অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ-৩।

১০৫. স্টাফ রিপোর্টার, "জলঢাকা থেকে শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ," যুগান্তর, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

১০৬. "Papers of the Planning Commission relating to Power, Energy, Electrification Water & Irrigation containing summary records of the meetings, notes, circulars, annexure etc.," Ibid, P-177.

১০৭. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Branch-AID, Government of India, "Durgapur Thermal Power Station VI Unit. AID Loan No. 386-H-144," File No. – F9 (2) AID/64, 1964, National Archives of India, P-108.

১০৮. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Branch-AID, Government of India, "Durgapur Thermal Power Station VI Unit. AID Loan No.- 386-H-144," File No. – F9 (2) AID/64, 1964, National Archives of India, P-18.

১০৯. "Papers of the Planning Commission relating to Power, Energy, Electrification Water & Irrigation containing summary records of the meetings, notes, circulars, annexure etc.," Ibid, P-174.

১১০. Ministry Of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India, "Bandel Thermal Power Project (AID Loan No. 386-H-056-

(DLF14)," AID Branch, File No. 2(1)AID/69, 1969, National Archives of India, P-11.

১১১. নিজস্ব সংবাদদাতা, "উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ কর্মীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার," যুগান্তর, ২৪শে আগস্ট ১৯৭১, পৃ-৫।

১১২. নিজস্ব সংবাদদাতা, "বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ উত্তরবঙ্গ চরম সংকটের সম্মুখীন," যুগান্তর, ২০শে আগস্ট ১৯৭১, পৃ-৯।

১১৩. স্টাফ রিপোর্টার, "শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু," যুগান্তর, ২৫শে আগস্ট ১৯৭১, পৃ-৭।

১১৪. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ," যুগান্তর, ২৯শে আগস্ট ১৯৭১, পৃ-১০।

১১৫. Ashok Mitra Papers, "Paper of The Planning Commission relating to The Annual Plan 1971-72 for West Bengal. Includes a Circular and Summary Record of meeting of The Working Group on Industries and Minerals," Subject Files-665, 1971-72, Nehru Memorial Museum and Library, P-10.

১১৬. Ashok Mitra Papers, "Paper of Planning Commission relating to the Annual Plan- 1971-72 for West Bengal includes circulars, reports of The working groups, notes etc. Also include a bill by West Bengal Legislative Assembly and a booklet entitled towards planning for the development of a village community:Pirgram," Subject File No-707, 1971-74, Nehru Memorial Museum and Library, Pp-50-55.

১১৭. Ashok Mitra Papers, "Paper of the Transport Division, Power and Energy Division; Etc. of the Planning Commission regarding Financial resources of the State Transport undertakings in West Bengal for The Fourth And Fifth Five Years Plans includes some annexure, summary, records of

meetings, circulars and statements relating to TT," Planning Commission Section, Subject File No-708, 1972, Nehru Memorial Museum and Library, Pp-1-5.

১১৮. Prime Minister's Office, Government of India, "1) Reported pull out of Indian and Foreign Firms of Calcutta by stages, 2) Industrial in West Bengal", File No. – 17(841)/71-PMS, 1971, National Archives of India, Pp-4-5.

১১৯. "Paper of the Transport Division, Power and Energy Division; Etc. of the Planning Commission regarding Financial resources of the State Transport undertakings in West Bengal for The Fourth And Fifth Five Years Plans includes some annexure, summary, records of meetings, circulars and statements relating to TT," Ibid, Pp- 9-15.

১২১. Ashok Mitra Papers, "The Priority Schemes of the Calcutta Industrial Region; issued by Planning Commission," Articles/Speeches/Writings by Him, File No-137, 1972, Nehru Memorial Museum and Library, Pp-8-11.

১২২. Ashok Mitra Papers, "Papers on Calcutta Metropolitan Development Authority. Includes an office memorandum issued by the Ministry of Health & Family Planning, Department of Health on the subject accelerated development programme in Calcutta Metropolitan District minutes of 10 review meetings, CMDA 1971-72 programme expenditure progress as on the 13th March 1972 and Bustee Improvement in Calcutta position Etc. Also includes papers of the Planning Commission- Housing and Urban Development and Division, and agenda of Calcutta Metropolitan Development programme, etc.," Subject File No-1100, 1972, Nehru Memorial Museum and Library, Pp-239-43.

১২৩. Ashok Mitra Papers, "Towards planning for the development of a village community: Pirgram', Boinchee CADP Area, Hooghly Dist; Investigation and Report – Ardhendu Kumar; Guidance- Dr. B.K.Roy

Burman," Subject File No-707, 1971-74, Nehru Memorial Museum and Library, P-162.

১২৪. Ashok Mitra Papers, Power and Energy Division, Planning Commission, 1973, "Report of The Working Group on Power held in the Planning Commission on 09.01.1973 to consider The Annual Plan 1973-74 regarding Power Sector of the West Bengal State," Subject Files-739, Nehru Memorial Museum and Library, Pp-73-82.

১২৫. "Papers of the Planning Commission on an Annual Plan 1973-74 for West Bengal includes salient features of West Bengal Plan 1973-74, Summary Record of the discussion held with the officials of the Government of West Bengal, Consideration of proposals of the Draft Annual Plan by The Working Group on agriculture including Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development Etc.," Ibid, Pp-396-398.

১২৬. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-২১।

১২৭. নিজস্ব সংবাদদাতা, "খামখেয়ালীর জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ," যুগান্তর,২রা জুলাই, ১৯৭৩, পৃ-৭।

১২৮. স্টাফ রিপোর্টার, "গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কাজ অনেক এগিয়েছে," যুগান্তর, ৩০শে জুন ১৯৭৩, পৃ-৭।

১২৯. পিটিআই, "রানীগঞ্জে তীব্র বিদ্যুৎ সংকট," যুগান্তর, ১লা জুলাই ১৯৭৩, পৃ-৫।

১৩০. পিটিআই, "রানীগঞ্জ বিদ্যুৎকর্মী ধর্মঘট প্রত্যাহার হল," যুগান্তর, ৩রা জুলাই ১৯৭৩, পৃ-৯।

১৩১. পিটিআই, "কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প অনুমোদন," যুগান্তর, ২রা জুলাই ১৯৭৩, পৃ-১।

১৩২. পিটিআই, "বিদ্যুৎ সংকটের সুরাহার আশা," যুগান্তর, ৩রা জুলাই ১৯৭৩, পৃ-১।

১৩৩. “Papers of the Planning Commission on an Annual Plan 1973-74 for West Bengal includes salient features of West Bengal Plan 1973-74, Summary Record of the discussion held with the officials of the Government of West Bengal, Consideration of proposals of the Draft Annual Plan by The Working Group on agriculture including Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development Etc.,” Ibid, Pp-6-9.

১৩৪. নিজস্ব সংবাদদাতা, “ট্রান্সফর্মার অচল করে বিদ্যুৎ ছাটাই,” যুগান্তর,৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ-৭।

১৩৫. নিজস্ব সংবাদদাতা, “দুর্গাপুরে বিদ্যুৎ ছাটাই চলছে,” যুগান্তর,২৫শে এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ-১।

১৩৬. স্টাফ রিপোর্টার, “১লা বৈশাখ থেকে বিদ্যুৎ রেশন,” যুগান্তর, ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৩৭. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ ঘাটতি নিয়ে তিন মন্ত্রীর বৈঠক,” যুগান্তর, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৩৮. “ফারাক্কায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে,” যুগান্তর, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৩৯. পিটিআই, “কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র,” যুগান্তর, ২২শে এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-৫।

১৪০. নিজস্ব সংবাদদাতা, “লোডশেডিং–এর বিরুদ্ধে নাগরিক বিক্ষোভ,” যুগান্তর, ৮ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৪১. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের শিল্পে সংকট,” যুগান্তর, ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৪২. “বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি দরকার,” যুগান্তর, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-৭।

১৪৩. বিশেষ সংবাদদাতা, “রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট ত্রাণে কেন্দ্রের সাহায্যের আশ্বাস,” যুগান্তর, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ-১।

১৪৪. স্টাফ রিপোর্টার, “জনসেবাই উদেশ্য, ক্ষমতা নয়,” যুগান্তর, ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৪৫. স্টাফ রিপোর্টার, “লোড শেডিংয়ের বলি!,” যুগান্তর, ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৪৬. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি,” যুগান্তর, ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-১।

১৪৭. Planning Commission, Government Of India, “Durgapur in Plant Power Generations,” File No.- PAD/7-3(15)/75, 1975 National Archives of India, Pp-74-78.

১৪৮. Asok Mitra Papers, “Papers relating to a Tour of Asok Mitra to Calcutta to attend the Conference of Calcutta 2000- Some Imperatives for action now, organized by Indian Chamber of Commerce. Includes a booklet of Review for 1975-76 and correspondence exchanged by Asok Mitra and Indian Chamber of Commerce etc.,” Feb 1976 to Aug 1976, Seminars/Synopsis/Conferences, Subject File-487, Nehru Memorial Museum and Library, Pp- 110-127.

১৪৯. Asok Mitra Papers, “Papers relating to a Tour of Asok Mitra to Calcutta to attend the Conference of Calcutta 2000- Some Imperatives for action now, organized by Indian Chamber of Commerce. Includes a booklet of Review for 1975-76 and correspondence exchanged by Asok Mitra and Indian Chamber of Commerce etc.,” ibid, Pp-75-76.

১৫০. J P Narayan (III Installment), “Correspondence with Jayaprakash Narayan from West Bengal,” Subject File No,-560 (Part-I) 1978, Nehru Memorial Museum and Library, P-63.

১৫১. “পল্লী বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন করার নির্দেশ,” যুগান্তর, ২০শে জুলাই ১৯৭৬, পৃ-৫।

১৫২. “ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে রূপয়ণ চাই” যুগান্তর, ২৩শে জুলাই ১৯৭৬, পৃ-৫।

১৫৩. স্টাফ রিপোর্টার, “গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্ন,” যুগান্তর, ২৯শে জুলাই ১৯৭৬, পৃ-৫।

১৫৪. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ. ১৮-১৯।

১৫৫. Planning Commission, “Farakka Super Thermal Station,” Power & Energy Division, File No. I 22(2)4/83 P&E,1983 National Archives of India, Pp-35-36.

১৫৬. ‘Farakka Super Thermal Station’, ibid, P-33.

১৫৭. বিশেষ প্রতিনিধি, “রাজ্য বাজেট, ১৯৮০-৮১,” ধনধান্যে, একাদশ বর্ষ- উনবিংশ সংখ্যা, ১-১৫ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ-১০।

১৫৮. নিজস্ব প্রতিনিধি, “১৯৭৯-৮০ সালের মোট জাতীয় উৎপাদনে ১ থেকে ২ শতাংশ হ্রাস,” ধনধান্যে, একাদশ বর্ষ- উনবিংশ সংখ্যা, ১-১৫ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ২ ও ৫।

১৫৯. “কয়লার উৎপাদন বাড়াতে,” ধনধান্যে, একাদশ বর্ষ- অষ্টাদশ সংখ্যা, ১৬-৩১ মার্চ ১৯৮০, পৃ-১৬।

১৬০. “বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ান- প্রধানমন্ত্রী,” ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ- তৃতীয় সংখ্যা, ১-১৪ অগাস্ট ১৯৮০, পৃ-১৪।

১৬১. নিজস্ব প্রতিনিধি, “আর্থিক অবস্থায় অবনতিঃ প্রাক-বাজেট সমীক্ষা” ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ- দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৬-৩১ জুলাই ১৯৮০, পৃ-৩।

১৬২.“পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ চিত্র,” ধনধান্যে, একাদশ বর্ষ- একবিংশ সংখ্যা, ১-১৫ মে ১৯৮০, পৃ-১৬।

১৬৩. Planning Commission, Government of India, “Letter from Mr. S. B. Deb (General Manager, DVC) to The Secretary to the Government of India, Ministry of Energy, Department of Power dated 25th November, 1980, No. 11FA(Bt) 72 Pt X-3504, ‘Mejia Thermal Power Station,’ Stage-I, 3x210

MW Unit," File No.I-26(24) /1/81P&E, 1981, National Archives of India, P-1.

১৬৪."ভারতের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র," ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ- একাদশ সংখ্যা, ১-১৫ ডিসেম্বর ১৯৮০, পৃ-২০।

১৬৫. "কয়লা উৎপাদনে নতুন রেকর্ড," ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ- একবিংশ ও দ্বাবিংশ সংখ্যা, ১-৩১ মে ১৯৮১, পৃ-২৫।

১৬৬. "তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২২ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি," ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ- ষোড়শ সংখ্যা, ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ-২২।

১৬৭. "সরকারি শিল্প উদ্যোগে উৎপাদন বৃদ্ধি," ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ- ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ সংখ্যা, ১-৩০ জুন ১৯৮১, পৃ-২৬।

১৬৮. অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, "বার্ষিক যোজনা ১৯৮১-৮২," ধনধান্যে, ত্রয়োদশ বর্ষ- পঞ্চম সংখ্যা, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, পৃ-৬।

১৬৯. "বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ কর্মসূচী," ধনধান্যে, ত্রয়োদশ বর্ষ- সপ্তম সংখ্যা, ১-১৫ অক্টোবর ১৯৮১, পৃ-১৪।

১৭০."বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ছে," ধনধান্যে, চতুর্দশ বর্ষ- প্রথম সংখ্যা, ১-১৫ জুলাই ১৯৮২, পৃ-১৮।

১৭১. Planning Commission, Government of India, "Mejia Thermal Power Station, Stage-I, 3x210 MW Unit," File No. I-26(24) /1/81P&E, 1981, National Archives of India, Pp.3-4.

১৭২. "Mejia Thermal Power Station, Stage-I, 3x210 MW Unit,'' ibid, Pp.66-69.

১৭৩. "Mejia Thermal Power Station, Stage-I, 3x210 MW Unit,'' ibid, Pp.43-44.

১৭৪. "Mejia Thermal Power Station, Stage-I, 3x210 MW Unit,'' ibid, Pp.1-2.

১৭৫. "Mejia Thermal Power Station, Stage-I, 3x210 MW Unit,'' ibid, P-19.

১৭৬. Planning Commission, Power & Energy Division, ''Letter dated 2nd November, 1983 from T Ramachandran (Jt. Adviser Power) to Shri A N Singh (Chairman, CEA), Farakka Super Thermal Station,'' File No.- I 22(2)4/83 P&E, 1983, National Archives of India, P-15.

১৭৭. Planning Commission, Government of India, "Nuclear- Dept. Of Atomic Energy," File No.-11014/93/85 SdT, 1985, National Archives of India, Pp.2-3.

১৭৮. "পশ্চিমবঙ্গের জন্য ফারাক্কার বিদ্যুৎ," ধনধান্যে, সপ্তদশ বর্ষ- পঞ্চম সংখ্যা, ১৬-৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ-১৯।

১৭৯. "পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করে তুলতে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ," ধনধান্যে, সপ্তদশ বর্ষ- ষষ্ঠ সংখ্যা, ১-১৫ই অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ-১৩।

১৮০. অময় বন্দ্যোপাধ্যায়, "শক্তি চাই আরও শক্তি" ধনধান্যে, সপ্তদশ বর্ষ- অষ্টাদশ সংখ্যা, ১-১৫ই এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ-১২।

১৮১. "হুগলী জেলায় লোকপ্রদীপ প্রকল্প," ধনধান্যে, সপ্তদশ বর্ষ- পঞ্চম সংখ্যা, ১-১৫ই মে ১৯৮৬, পৃ-২১।

১৮২. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-২৪।

১৮৩. "রাজ্য বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি," ধনধান্যে, উনবিংশ বর্ষ- দ্বাবিংশ সংখ্যা, ১৬-৩১শে মে ১৯৮৮, পৃ-২০।

১৮৪. Planning Commission, Department of Power & Energy, Government of India, 'Bakreshwar T.P.S. Stage-I (3 X 210 MW)', File No. – I-26(9)/1/85-P&E, 1985, National Archives of India, P-11.

১৮৫. ‘এই বন্‌ধ্‌-এর আহ্বান কতটা আন্দোলনমুখী’, গণদাবী, ৪১ বর্ষ, বুলেটিন নং-২, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ-১।

১৮৬. ‘CESC Ltd’, The Economic Times, 5th Jan 2005, P-7.

১৮৭. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-৩০।

১৮৮. “অষ্টম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তির লক্ষ্যমাত্রা,” ধনধান্যে, একবিংশ বর্ষ-পঞ্চম সংখ্যা, ১-১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, পৃ-১।

১৮৯. Government of West Bengal, “Order of the West Bengal Electricity Regulatory Commission in Case No. FPPCA-26/07-08”, 03.06.2008, P-2.

বিদ্যুতশিল্প ও শ্রমিকঃ প্রেক্ষাপট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

ঔপনিবেশিক আমলে, মূলত বিদেশী পুঁজিতে যে শিল্পায়ন হয়েছিল তাতে ভারতের শিল্প মানচিত্রে কলকাতা তথা বাংলা এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। উনিশ শতকে শহর জীবনের ছোঁয়া লাগল পশ্চিমী শিক্ষার মাধ্যমে। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং তৎকালীন সময়ের ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। একথা বলাই বাহুল্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যখন কলকাতা শহরের গুরুত্ব বাড়তে থাকল তখন শহর কলকাতায় এসে ভিড় জমাতে লাগল নানাধরণের শ্রমিকশ্রেণীর দল। কলকাতায় নগরায়নের সাথে সাথেই এসেছিল শিল্পায়নের ধারা যা বিভিন্ন গণকৃত্যক ক্ষেত্রের যেমন গণপরিবহণ ও পৌর ব্যবস্থা, এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসার ঘটায়। এই সকল জায়গায় বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল এবং প্রাথমিকভাবে কৃষক, তাঁতি, ভূমিহীন মানুষদেরকে নিয়ে জন্ম হয়েছিল এক আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর। চটকল, চা শিল্প, বন্দর ও ডক অঞ্চল, ট্রাম ও রেল কোম্পানির নানা স্তরের শ্রমিকদের নিয়ে বাংলার শ্রমজীবী সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা হয়। ধীরে ধীরে শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি পায় এবং বাংলায় বিদ্যুতশিল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর আগে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে যেসকল আলোচনা দেখা গিয়েছে সেখানে বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলনামূলক কম।

শ্রমিক বা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন 'শ্রমিক' শ্রেণী হিসাবে কাদের চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে এবং শ্রমিক আন্দোলন হিসাবে কোনগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই সম্পর্কিত আলোচনা। 'শ্রমিক' শ্রেণী মূলতঃ একটি আর্থ সামাজিক

শব্দ, যা একটি সামাজিক শ্রেণীকে চিহ্নিত করে। এরা মূলত সীমিত আয়ের, শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনায় কম এবং কায়িক শ্রম নির্ভরশীল। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শ্রমিকরাই যেকোন অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। অপরদিকে শ্রমিক আন্দোলন বলতে কালানুক্রমিক ধারায় প্রধান প্রধান ধর্মঘটের কথা ও আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাংগঠনিক কার্যকলাপ ও দাবি আদায়ের কথা বোঝায়। এই ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে কায়িক এবং মানসিক শ্রম প্রদানকারী উভয়ই শ্রমিক। মার্কসীয় মতে শ্রমিকের শ্রমশক্তি পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই 'শ্রমশক্তি' একটি পণ্য এবং স্বাভাবিক ভাবেই অন্য পণ্যের মত এরও ক্রেতা, বিক্রেতা, মূল্য এবং বাজার দর বর্তমান। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকেরা 'মুক্ত-মানুষ'।[১] শিল্প বিপ্লব বা ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভূমিদাসদের জমির বন্ধন থেকে মুক্তি হয় এবং তারা 'স্বাধীন মানুষ' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে শিল্প শ্রমিকে পরিবর্তিত হয়। শ্রমশক্তি হল শ্রমিকদের সম্পত্তি এবং তার উপর অন্য কারোর কোন অধিকার নেই। শ্রমশক্তির বিনিময়ে তাকে তার জীবন-ধারণের জন্য অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয় তাই শ্রমশক্তির বিনিময়ে নিযুক্ত হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে বিনিময়-মূল্য। বিনিময়ের উপাদানের জন্য শ্রমশক্তির ঘটেছে পণ্য-রূপ। পুঁজিপতিরা টাকা দিয়ে এই পণ্য ক্রয় করে; টাকা হল তাদের পুঁজি।[২] শ্রমিকরা চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হয় টাকার বিনিময়ে। অন্যান্য পণ্যের ন্যায় টাকার মূল্যে শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করা হলেও শ্রমিকের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয় হল তাদের শ্রমশক্তির আধার "শরীর"-কে রক্ষা করা। শ্রমশক্তি বিক্রয় করে নানা প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোই শ্রমিকের লক্ষ্য। তাই শ্রমিকেরা তাদের জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা উপকরণের বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে তাদের শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত করে।[৩]

পণ্যের মূল্য নির্ণয় হয় পণ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক যেটুকু শ্রম পণ্যের মধ্যে নিহিত আছে তা দিয়ে। মার্কস সর্বপ্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শ্রমের মূল্য-সঞ্চারী গুণটির অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে কোন একটা পণ্যের উৎপাদনে আপাতভাবে এমনকি বাস্তব পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমই সকল অবস্থায় পণ্যে এমন পরিমাণে মূল্য যোগ করে না যেটা বিনিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের সমান। অর্থাৎ কোন পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনে আবশ্যিক শ্রম দ্বারা নির্ণীত হয়। অন্য ভাবে দেখলে আবার পণ্যের মূল্য তার উৎপাদন ব্যয়ের সমান। মনে রাখা দরকার, অর্থনীতিবীদরা যাকে 'শ্রমের' উৎপাদন ব্যয় বলে গণ্য করেন সেটা শ্রমের উৎপাদন ব্যয় নয়, জীবন্ত মজুরটারই উৎপাদন ব্যয় এবং মজুর পুঁজিবাদীর কাছে যা বিক্রয় করে তার জীবনের বিনিময়ে।[৪] শ্রমিকের নিজের জন্য ব্যয়িত শ্রমকে বলা হয়, প্রয়োজনীয় শ্রম (নেসেসারি লেবার) আর পুঁজিপুতিদের জন্য দেওয়া শ্রমকে বলা হয় হয়, অতিরিক্ত শ্রম (সারপ্লাস লেবার), এই প্রয়োজনীয় শ্রম হল মূল্য প্রদত্ত শ্রম (পেড লেবার) আর অতিরিক্ত শ্রম হল মাগনা শ্রম বা মূল্য না দেওয়া শ্রম (আনপেড লেবার)।[৫] মজুরী দেওয়ার নানা পদ্ধতি চালু আছে যার মধ্যে অন্যতম হল: সময়-ভিত্তিক মজুরী (টাইম রেটেড ওয়েজ) এবং উৎপাদনভিত্তিক মজুরী (প্রাইস রেটেড ওয়েজ) উভয় পদ্ধতিতেই পুঁজিপুতিরা মজুরী হার কম রেখে উৎপাদন থেকে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করে। সময় ভিত্তিক মজুরী পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এই সময়-ভিত্তিক মজুরী পদ্ধতিতে, শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর নিম্নহারের কারণে, অতিরিক্ত সময় কাজ করার প্রবণতা বাড়ে। অতিরিক্ত সময়ের কাজ (ওভারটাইম) পুঁজিপতিদের পক্ষে লাভ জনক। স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগকে এড়িয়ে, বর্তমানের শ্রমিকদের সামান্য অর্থ দিয়ে অতিরিক্ত কাজ আদায় হল এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব।[৬]

ভারতবর্ষে শ্রমিক ইতিহাস চর্চার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বর্তমান যা প্রথাগত ইতিহাস চর্চার মতনই সমান গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সমাজ সংস্কারক শশীপদ বন্দোপাধ্যায় ১৮৭৪-এ 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত রজনীকান্ত দাশের 'প্লান্টেশ্যান লেবার ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আসামের চা শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্লেভারি ইন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান', সুকোমল সেনের 'ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ইন্ডিয়া' (১৯৭৭), ডাঃ পঞ্চানন সাহার 'ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' (১৯৭৮) এই স্বতন্ত্র ইতিহাস চর্চার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত রজনী পাম দত্তের 'ইন্ডিয়া টুডে'-তে (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ) শ্রমিক শ্রেণীর আর্থ সামাজিক অবস্থা ও সংগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনা এই ইতিহাস চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রাথমিক ভাবে এই বইগুলিতে মূলত দুই ধরণের আলোচনা দেখা যায়, যথা- শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ও তাদের কালানুক্রমিক বিবরণ এবং দ্বিতীয়ত শ্রমিক আন্দোলন ও সেই সংক্রান্ত আলোচনা। ষাটের দশকের গোড়া থেকে এরিক হবসবম ও ই.পি টমসনের গবেষণা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এই দুজনেই শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথাগত ধারণা অর্থাৎ শ্রমিক সংঘ বা আন্দোলনের বৃত্তান্তের যৌক্তিকতাকে প্রশ্ন করেন। তারা উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক ভিত্তিক এবং একই সঙ্গে শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী চৈত্যন্যের নিরিখে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস রচনায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অপরদিকে রিচার্ড প্রাইস 'দি লেবার প্রসেস অ্যান্ড লেবার হিস্ট্রি' এবং জোনাথান জেইটলিন 'ফ্রম লেবার হিস্ট্রি টু দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশান' গ্রন্থে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণে শ্রেণী নির্ভর বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস লিখেছেন। এই আলোচনাগুলিতে শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্বৃত মূল্যের সৃষ্টি ও পুঁজিবাদী শোষণ, শ্রম ক্ষমতার কেনাবেচার বাজারে পুঁজিপাতিদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকদের প্রতিবাদ

ও প্রতিরোধের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। অপরদিকে মিখাইল বুরাভয় তার পলিটিক্স অফ প্রোডাকশান (১৯৮৫) নামক গ্রন্থে উৎপাদনের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৭]

এইভাবে ক্রমশই বিগত শতাব্দীর ষাটের ও সত্তরের দশকে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা ও চর্চা প্রাধান্য পেতে থাকে। এই ভাবেই নিম্ন বর্গের 'তলা থেকে ইতিহাস' রচনার ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে শ্রমজীবী মানুষরা। ইতিহাস রচনার এই নতুন ধারার প্রয়োজন অনুভব করেন মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা, ইংল্যান্ডের হিল, হিল্টন ও রাফায়েল স্যামুয়েল, ই.পি.টমসন, হবসবম প্রভৃতি মার্কসীয় ঐতিহাসিকরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রমিক বা খেটে খাওয়া মানুষের ইতিহাস রচনা শুরু করেন। ই পি টমসনের 'দি মেকিং অফ দি ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস' (১৯৬৩)[৮] এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দীপেশ চক্রবর্তীর বহু আলোচিত 'রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি ; বেঙ্গল ১৮৯০-১৯৪০' বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইটি ভারতের মত উন্নয়নশীল এক দেশে শ্রমিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। দীপেশ চক্রবর্তীর আলোচনায় দেখা যায় যে ভারতের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উপরে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিধ্বংসী প্রভাবকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়েছে এবং তিনি এই পশ্চাৎপদতার মূলে প্রাক ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দায়ী করেছেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ঔপনিবেশিক, পুঁজিবাদের জঠরে বা তার উদ্ভবের সঙ্গে। তাই শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার জন্য অগ্রগতি পাবে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ। পাশাপাশি পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের থেকে আলাদা করে জোর দিতে হবে 'সংস্কৃতি' ও 'চৈতন্য'-এর উপর। শ্রমিকদের মানসজগৎ, সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও জাতি বারবার প্রাধান্য পেয়েছে দীপেশ চক্রবর্তীর লেখায়।[৯] পারত পক্ষে বলা যায় দীপেশ চক্রবর্তীর

ইতিহাসচর্চায় তিনি ঐতিহাসিকদের ন্যায় শুধু তথ্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সমালোচনা করেননি। তিনি আমাদের দেশের শ্রমিকদের সকলকেই কৃষক সমাজ থেকে আগত বলে মনে করে বলেছেন যে শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশই কারিগর ও হস্তশিল্প, শহরে রকমারি কাজে নিযুক্ত মজুর এবং বনাঞ্চল থেকে বিতাড়িত আদিবাসী বা 'ট্রাইবাল সমাজ' থেকে আগত। তবে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কৃষক, প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুরের অংশ গ্রহণের কথাও স্বীকার করে নেন। রণজিৎ গুহর মতে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস চর্চায় লেনিনীয় বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ সমার্থক নয়। ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের পটভূমি হল ঔপনিবেশিক শাসন এবং ঔপনবেশিক ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ।[১০]

প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরেই কাজ হয়েছিল। সরকারি বিষয়ক কাজগুলি ছিল মূলতঃ অনুসন্ধান ভিত্তিক এবং সেগুলি ছিল ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা (অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস) ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড সরকারি পর্যায়ে শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তা ভাবনার বৃদ্ধি পেতে সহায়ক হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ রয়্যাল কমিশন অন লেবার-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বেসরকারি স্তরে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চার প্রবণতা ভারতবর্ষে মূলতঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু হয়। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে প্রথাগত মার্কসীয় দর্শনের আলোকে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনতা এবং শ্রেণী সংগ্রামের কথা বিশেষ ভাবে তুলে ধরেছেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর দি ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস গ্রন্থে 'শ্রেণী' প্রেক্ষাপটের উপর জোর দেন। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের এই দুইটি কাজ ব্যক্তিগত/বেসরকারি ক্ষেত্রের শ্রমিক সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চাগুলির মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার

পরবর্তী সময়ে এই ইতিহাসচর্চার ধারায় গতি আসে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমিক শ্রেণী পুরোপুরি শিল্পায়নের উপর নির্ভরশীল, যা পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের পথকে প্রশস্ত করেছিল। শ্রমিকদের আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধানতম অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হত। তবে পরবর্তীকালে বিংশ শতকের শেষার্ধে এই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গতি আনতে দুইটি আর্থিক তহবিল সংস্কার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের হাত ধরে শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে দুইটি বড় প্রকল্প শুরু হয়। প্রথমত, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে গড়ে উঠল শিল্প ও শ্রমিক নিয়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকল্প এবং দ্বিতীয়ত ইউনেস্কো-র আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠল 'সোশ্যাল ইমপ্লিকেশান অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান প্রোগ্রাম'। বলাই বাহুল্য, স্বাধীনোত্তর পর্বে বিশেষত নব্বই-র দশকের পর ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিকাশ ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সংগঠন শিল্পের শ্রমিকদের নিয়েই এই ইতিহাস চর্চার ধারা সীমাবদ্ধ ছিল, শুরুর দিকে অসংগঠিত ক্ষেত্র নিয়ে ইতিহাস চর্চার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়নি।[১১] সামাজিক মানচিত্রের বাইরে অর্থাৎ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নানা রূপ, নানা সমস্যা তুলে ধরতে পারলেও শ্রমিক ইতিহাসচর্চা সর্বাঙ্গীন ভাবে সফল হবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা অনেক পরে মূলধারায় ইতিহাস চর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও নির্বাণ বসু এই ধারনার বিরোধিতা করে উনিশ শতকের শেষভাগে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির মত ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারদের শ্রমিকদের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] পাশাপাশি সত্তরের দশক থেকে যখন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা সর্বাত্মক না হয়ে অঞ্চল বিশেষ সম্পর্কিত হতে থাকে তখন স্বভাবতই প্রাচীনতম শিল্পাঞ্চল হওয়ার সুবাদে বাংলা

বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। নির্বাণ বসু এই ক্ষেত্রে পঞ্চানন সাহার 'হিস্ট্রি অফ ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' (১৯৭৮) কে পথিকৃতের মর্যাদা দিলেও সনৎ বসু কর্তৃক রচিত ১৯৫৮ সালের এক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধকে প্রথম পৃথক আলোচনা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।[১৩] তিনি আরো বলেন যে, সত্তরের দশক থেকেই উত্তর আধুনিকতাবাদ, সাবঅল্টার্ন গোষ্ঠীর চিন্তাধারা এবং নয়া সামাজিক ইতিহাসের ফলে শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত এবং আঙ্গিক বদলাতে শুরু করে।[১৪] শ্রমিক আন্দোলনের চিরাচরিত ক্লিশে গন্ডি পেরিয়ে শ্রমিকদের সংস্কৃতি অনুভবের আঙ্গিকে হওয়া নতুন শ্রমিক ইতিহাসের ইতিহাসচর্চার উদাহরণ হিসাবে দীপেশ চক্রবর্তী, পরিমল ঘোষ, শুভ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীপেশ চক্রবর্তীর গবেষণায় পাটশিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার এবং সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। চটশ্রমিকদের নিয়ে গবেষণায় ঐতিহাসিক পরিমল ঘোষ তার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে কলকাতার চটকলের শ্রমিকদের ইতিহাস হল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর বিবর্তনের ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি, যাকে কোনও বাঁধাধরা তাত্ত্বিক কাঠামোর দ্বারা নির্ণয় করা যায় না।[১৫] অপরদিকে শুভ বসু ১৮৯০ থেকে ১৯৩৭ এই সময়সীমার মধ্যে শ্রমিকদের নিজস্ব রাজনীতি, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।[১৬] তাঁর কাজের মধ্যে থেকেই আমরা জানতে পারি যে উনিশ ও বিংশ শতকের সংযোগস্থল থেকেই শিল্পক্ষেত্রের পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা শুরু করে এবং এর পাশাপাশি মালিক, বহিরাগত নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রেও এমনই পরিণত হতে থাকে। তবে তিনিও শ্রমিক শ্রেণীর গড়ে ওঠার বিষয়টিকে পাশ্চাত্য মডেলে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নির্বাণ বসু বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ বিষয় তুলে ধরেন যেগুলি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন, যেমন – শ্রমিক শ্রেণীর উপর সর্দারদের

নিয়ন্ত্রণ, এই নেতৃত্বের উৎস, সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ান সৃষ্টির পর ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের সঙ্গে সর্দার বা তথাকথিত স্বাভাবিক নেতৃত্বের সম্পর্কের স্বরূপ এবং ত্রিশের দশকের পর থেকে সর্দারদের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন।[১৭] আবার জানকী নায়ার এর মতে মহীশূরের স্বর্ণখনির শ্রমিক শ্রেণীর গঠনে ও সংগঠনে বর্ণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সেই বিষয়েও তিনি সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। যদিও তিনি মনে করেন যে এই ধরনের গবেষণাও বাংলায় অপ্রতুল। ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্ভর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও বাংলা কিছুটা পিছিয়ে আছে বলেই তিনি মনে করেন।[১৮]

আমাদের দেশের আধুনিক শিল্প ও বিকাশের অঙ্গ হিসাবে আধুনিক শিল্পশ্রমিকের উদ্ভব এবং বিকাশের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে শিল্প বিপ্লবের পীঠস্থান ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের উত্থান ও গড়ে ওঠার সঙ্গে কোন ভাবেই আমাদের দেশের শ্রমিকদের ব্যুৎপত্তির তুলনা করা যায় না। ইংল্যান্ডের কৃষকরা প্রথমে কারিগর এবং তারপরে কারিগর থেকে শিল্পশ্রমিকে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই জায়গায় আমাদের দেশীয় কৃষকদের সরাসরি শিল্প শ্রমিকের জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছিল। এই অতর্কিত প্রবেশের জন্য দেশীয় শ্রমিকবর্গের মানসিকতার মধ্যে শুরুর দিকে এক ধরণের সাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্ম ও বর্ণের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। শিল্প বিকাশের মন্থরতা ও অসম্পূর্ণতা দেশীয় শ্রমিকদের গোড়ার দিকে তাদের গ্রামীণ জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন করতে পারেনি।[১৯] একথা অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক সমাজের মধ্যে থেকেই বাংলার নতুন শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। শহরে এসে বিভিন্ন চটকল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও গ্রামের আকর্ষণের থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন নি, তাই এদের অর্ধ-কৃষক ও অর্ধ-শ্রমিক বললে অত্যুক্তি হবে না। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রায় একশো বছর পর বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান হয়েছিল। দেশীয় শ্রমিকদের দ্বিমুখী সঙ্কট ছিল,

প্রথমত, শহরের কলকারখানায় কাজের বা কারখানায় কাজ করা সম্পর্কে তাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না এবং দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন হওয়াতে অত্যাচার ও শোষণ ছিল নিত্যসঙ্গী। বাংলার শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের নিয়ে তৈরি। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে কাজের সন্ধানে গরীব প্রান্তিক মানুষেরা কলকাতা ও হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চলে আসেন। এই 'অবাঙালী' শ্রমিক শ্রেণী তাদের সাথে করেনিজস্ব সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য, কুসংস্কারের পিছুটানও সঙ্গে এনেছিল।[২০] এখানকার মানুষদের সাথে সহাবস্থানের ফলে এবং কালের নিয়মে ধীরে ধীরে এই বাঙালী-অবাঙালী মিশ্রিত শিল্পশ্রমিক বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক পরিপূর্ণ শ্রেণী হিসাবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারি উদ্যোগে এবং গণকৃত্যক ক্ষেত্রে শিল্প সংস্থাগুলি গড়ে ওঠে যেখানে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্র, চাহিদা ও সমস্যা চিরাচরিত শিল্পশ্রমিকদের থেকে আলাদা। এই ক্ষেত্রে ক্রমে কায়িক শ্রমের তুলনায় তথাকথিত 'White Collar' বা মধ্যবিত্ত বাবু শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠন ও আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হওয়া এরূপ এক গণকৃত্যক সংস্থা হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যার কাজ ছিল কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এর পূর্বেই, ১৮৯৭ সালে পত্তন হয়েছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন নামক এক বেসরকারি সংস্থা, যাদের উপর ছিল কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব। উভয় সংস্থাতেই 'White Collared' ও 'Blue Collared'[২১] শ্রমিকের সহাবস্থান ছিল এবং এই শ্রমিকদের আনুপাতিক সংখ্যা, সাংগঠনিক বিস্তার, আন্দোলন ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ এক বিষয়।

শ্রম ছিল সভ্যতার চলমানতার প্রতীক। আদিম মানুষ প্রস্তর যুগ থেকে তার যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে স্থিতিশীল কৃষি জীবনে এসেছিল পেশীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। ধীরে ধীরে এই পেশীশক্তিকে সরিয়ে সভ্যতার বুকে জায়গা করেনিয়েছিল যন্ত্রশক্তি, যথাক্রমে প্রথমে বাস্পশক্তি এবং পরবর্তীকালে বিদ্যুতশক্তি। পেশীশক্তির এই পরাজয় ক্ষণস্থায়ী, কারণ যন্ত্রের বা যন্ত্রশক্তির স্রষ্টা মানুষই এবং বলা বাহুল্য, তা পরিচালনও করে মানুষ। তাই যন্ত্রকে শ্রমের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হলেও তা কখনই শ্রমিকের জায়গা নিতে পারেনি। একথা অনস্বীকার্য যে, ঔপনিবেশিক বাংলায় বিদ্যুতের আগমন ব্রিটিশদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হয়েছিল কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এই প্রযুক্তি বা শিল্প ঔপনিবেশিক বাংলায় সামগ্রিকভাবে এক সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে আবির্ভূত হওয়া এই শিল্পের কর্মসংস্থানের চরিত্র ছিল অন্যরকম এবং বিভিন্ন স্তর যুক্ত। বিদ্যুতশিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাবেই কর্মসংস্থানে সহায়তা করেছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কর্মীর প্রয়োজন হয়, যা প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থানের নির্দেশক ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং বিদ্যুতশিল্পকে কেন্দ্র করে যে সকল অনুসারি শিল্প (কয়লার খাদান, বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত প্রভৃতি) গড়ে উঠেছিল সেগুলির মাধ্যমেও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছিল। তবে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির, অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতই মুনাফা অর্জন করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কর্মসংস্থান বা গণসেবার উদ্দেশ্যে সেভাবে ছিল না। নতুন প্রতিষ্ঠিত এই গণকৃত্যক ক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্র, চাহিদা ও সমস্যা চিরাচরিত শিল্পশ্রমিকদের থেকে আলাদা ছিল। অন্তত এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কায়িক শ্রমের তুলনায় তথাকথিত হোয়াইট কলার বা মধ্যবিত্ত বাবু শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠন ও আন্দোলন গুরুত্ব পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন যে শ্রমিকদের ইতিহাস মানে কিন্তু শুধুই শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর

ইতিহাস নয়। বিদ্যুতশিল্পের মত আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশীয় শ্রমিকদের উৎকর্ষ, তাদের সামাজিক অবস্থান এবং চাকরিক্ষেত্রে তাদের সুযোগসুবিধাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের কথা তেমন জানা যায় না। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যেখানে শ্রমিক অসন্তোষ তুঙ্গে সেই সময়ও বিদ্যুৎ কর্মীদের অংশগ্রহণ বা আন্দোলনের কথা জানা যায় না। তবে বিংশ শতকের শুরুর সময় থেকে শ্রমিকশ্রেণী সংক্রান্ত কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বিংশ শতকের প্রথম দশকে সাধারণ মানুষকে আলো ও শক্তির বিকল্প হিসাবে বিদ্যুতের পরিচয় করানোর জন্য 'বিক্রয়িক' নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর সাথে সাথেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান 'বৈদ্যুতিক পরিদর্শক' নিয়োগ করে যার কাজ ছিল নতুন সংযোগের কোনও আবেদনকে পর্যবেক্ষণ করা এবং সরকারের কাছে তা প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পাঠানো।[২২] এই রকম একজন বৈদ্যুতিক পরিদর্শক ছিলেন শ্রী আর জে ব্রাউন, যিনি ১৯০৮ সালে এম্পায়ার থিয়েটারের বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করেছিলেন। সি.ই.এস.সি ব্রিটিশ কোম্পানি হওয়ার সুবাদে সমস্ত উঁচু পদেই ব্রিটিশরা ছিলেন। অপরদিকে কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে কর্পোরেশান বেশীরভাগটাই দেশীয় শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯২৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গার্ডেনরীচে অবস্থিত সাউদার্ন জেনারেটিং স্টেশন থেকে হাওড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য হুগলী নদীর তলদেশ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু হয়। নক্সা প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজদের আধিপত্য চোখে পড়ার মতন ছিল কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে হাতে কলমে ও কায়িকশ্রমের দ্বারা কাজটি সুসম্পন্ন করেছিল ভারতীয় শ্রমিকরাই। বিশেষত বর্ষাকালে উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মধ্যে এই কাজ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।[২৩]

ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি মালিকানাধীন ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তার শ্রমিকদের প্রতি খুব যত্নশীল হবে না একথা ভাবা অন্যায় নয়। অন্যায় ছাঁটাই, কাজের পরিমাণ বাড়ানো বা বেতন কমানো প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ থাকলেও শ্রমিকদের কোন সংগঠন না থাকায় তা দানা বাঁধতে পারেনি। কর্পোরেশনের ৩০০০ শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ২০০ শ্রমিক নিয়ে ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশের গোঁড়া গান্ধিবাদী কংগ্রেসিদের সংগঠন বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শ্রী দেবেন সেনের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে বাংলার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রী শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের এক বিরাট সম্মেলন হয়েছিল এবং এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যাকে উল্লেখ করে কর্পোরেশনের কাছে একটি দাবিসনদ পাঠানো হবে। কর্তৃপক্ষ যদি এই দাবি না মানে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন হিসাবে ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘটে বসার হুমকি দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ এই দাবি মানতে অরাজি হয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করলেও ২০শে সেপ্টেম্বর শরৎ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রমিকদের ধর্মঘটে না যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।[২৪] এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি আলোচনা কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং কমিটির বৈঠকে স্থির হয় মেয়র সনৎ রায়চৌধুরী এবং শ্রী সন্তোষ কুমার বসু, শ্রী তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, শ্রী হেমন্ত কুমার বসু ও নবাবজাদা হাসান আলি চৌধুরী কর্তৃপক্ষের সাথে মীমাংসার বিষয়ে আলোচনা করবেন।[২৫] ২২শে সেপ্টেম্বর দেবেন সেনের সভাপতিত্বে বিদ্যুৎ কর্মীদের এক সভায় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শ্রমিকদের অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবিপূরণই যে ইউনিয়ন নেতৃত্বের একমাত্র লক্ষ্য সেটিও জানানো হয়।[২৬] শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে ছাত্র ও যুবদের উদ্যোগে ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে ৬টায় দেশপ্রিয় পার্কে শ্রী নলিনীমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে এক জনসভা আয়োজিত হয়েছিল। তৎকালীন নেতৃত্বদানকারী শ্রী ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী জওহর গাঙ্গুলি, শ্রী ফণী দাশগুপ্ত প্রমুখ বক্তাগণ সি.ই.এস.সি-কে শ্রমিকদের দাবীগুলি মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[২৭] ঐ সময়ে শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ১৯৩৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর মধ্য কলকাতার গিরীশ পার্ক এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে নাগরিক সভা আয়োজিত হয়েছিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর, আলোচনা কমিটির তরফে প্রতিনিধিদল কোম্পানির অ্যাক্টিং এজেন্টের সাথে দেখা করলে কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা ও বোনাস সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার প্রশ্নে কিছু সমাধান সূত্র বেরিয়েছিল বলে জানা যায়।[২৮] ইতিমধ্যেই ধর্মের নামে শ্রমিকদের বিভাজনের চিত্রও আমাদের সামনে উঠে আসে। ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে সকল মুসলিম শ্রমিক সদস্য পদত্যাগ করেছিল বলে জানা যায়। মুসলিম লীগের শ্রমমন্ত্রী হুসেন শাহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তার অনুগামীদের দ্বারা, গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের মুসলিম বিরোধী মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা এই ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল বলে মনে করা হয়।[২৯] অপরদিকে কমিউনিস্টরা বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশনকে সরিয়ে বিদ্যুতশিল্পের এই ইউনিয়নের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সি.পি.আই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোর পরিচালনায় যেসব ট্রেড ইউনিয়ন আছে তাদের মধ্যে সংহতি সাধনের জন্য এক আলোচনা সমিতি (নেগোসিয়েশান কমিটি) গঠন করে এবং সি.ই.এস.সি তে প্রাধান্য বিস্তারের ভীষণরকম ভাবে চেষ্টা করতে থাকে।[৩০]

৪ঠা অগাস্ট, ১৯৪৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন বিধায়ক শ্রী সুভাষ চন্দ্র ব্যানার্জী। শ্রী শরৎচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, তিনি কর্পোরেশনের কর্মচারীদের অবস্থা দেখে যারপরনাই অবাক। তিনি কর্মচারীদের পক্ষে বক্তব্য রেখে বলেন যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে, যার সাথে তাল মিলিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ও জীবনযাপনের খরচ অনেকাংশেই বেড়েছে। সেই অনুপাতে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের না বেড়েছে মাইনে, না তাদের কাজ করার যে ন্যুনতম স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সি.ই.এস.সি বিগত বছরে অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ২ টাকা বৃদ্ধি করলেও, কর্পোরেশনের ‘কুলি’ পদের কর্মচারীরা পূর্বের মতই ২০ টাকা মাইনে ও ২২ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা পেত। সুভাষ বাবুর মতে কর্পোরেশনের যথেষ্ট মুনাফা লাভ করেছিল এবং সেই মুনাফার জন্য যারা দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছে সেই সকল কর্মচারীদের মাইনে বাড়াতে হবে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দিতে হবে।[৩১] ক্রমশ কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে। তারা প্রত্যেক কর্মচারীকে ৩ মাসের বেতন অধিবৃত্তি হিসাবে দেওয়ার দাবী করেছিল। এর সাথে মহার্ঘ্য ভাতা ২৫% বাড়ানো, সবেতন ছুটি, ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের পুনরায় নিয়োগ, ঘরভাড়া ভাতা বাড়ানো এবং চাকরির স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা তাদের দাবী ছিল। ১৯৪৭ সালের ৫ই জানুয়ারি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক মাহরুফ হুসেন এক বক্তব্যে জানান যে, সি.ই.এস.সি যদি ২১শে জানুয়ারি রাত ১১টার মধ্যে তাদের সমস্ত দাবিদাওয়া না মানে তাহলে তারা হরতালের রাস্তা বেছে নেবে। এই সংক্রান্ত একটি সনদও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষ থেকে কর্পোরেশনকে পাঠানো হয়েছিল।[৩২] এর কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধী নিহত হন। ক্যালকাটা

ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই ঘটনায় গভীর সমবেদনা জানায়। ১৪ই মার্চ, ১৯৪৮ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্মীরা গান্ধীজির দেখানো পথে সমাজ-শৃঙ্খলা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও অহিংসার নীতি মেনে চলার সঙ্কল্প নেয়।[৩৩]

১৯৪৮ সালের ৭ই জুলাই দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন স্থাপিত হলেও এর কাজ স্বাধীনতার আগে (১৯৪৪) থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই কাজটির তদারকির জন্য তৎকালীন ভারত সরকার বি আর আম্বেদকর এর পরামর্শে 'সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড' গঠন করেছিল, যা পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি কমিশন নামে পরিচিত হয়।[৩৪] এই বোর্ড উপরোক্ত প্রকল্পটির রূপায়ণের জন্য অভিজ্ঞ মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ডব্লিউ. এস. ভুরদুইনের সাহায্য নিয়েছিল। ভুরদুইন সাহেবকে এই কাজে যোগ্য সহায়তা করেছিলেন দুইজন প্রখ্যাত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার এ. এন. খোসলা এবং এম. নরসিংহাইয়া।[৩৫] শুধুমাত্র ভুরদুইন সাহেবই নন এই সময়ে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে বহু বিদেশী কারিগর নিযুক্তির কথাও জানা যায়। ১৯৫০ সালে ওয়ার্কশপ সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে জে. এল. পোটোচকি নামক এক পোলিশ নাগরিক,[৩৬] হেড অপারেটার হিসাবে এস. সি. ওয়াং[৩৭] ও অপারেটার (তৃতীয় গ্রেড) পদে চৈনিক নাগরিক এস. সি. কাই[৩৮] এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জার্মান নাগরিক জে. এইচ. বালিন[৩৯] এর নিয়োগের কথা জানা যায়। ইতিমধ্যেই আবার শ্রম, খনি ও শক্তি (ওয়ার্কস, মাইনস অ্যান্ড পাওয়ার) মন্ত্রক থেকে কে. এস. রাজাগোপালনকে উক্ত মন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে নিয়োগের সুপারিশের কথা সামনে আসে।[৪০] সর্বভারতীয় স্তরে বিদ্যুতশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি কমিশনের পত্তন হয়েছিল। এই কমিশন শুরুতেই কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দেয়। একটি বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে

তারা প্রকাশ করে জানায় যে গুরুত্বপূর্ণ ও দক্ষতামূলক (যেমন-প্রকল্প আধিকারিক) পদগুলিতে সাক্ষাৎকার বা অন্য যেকোন নির্ণায়ক উপায়ের মাধ্যমে যোগ্যতম ব্যক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং এইগুলি ব্যতীত যাবতীয় পদে (যেমন- দপ্তরি) প্রয়োজনীয় মান পূরণকারীদের মধ্যে থেকে নিয়োজিত হতে পারে।[৪১] ইতিমধ্যেই সমকালীন সময়ে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'ইলেক্ট্রিসিটি ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেট' নামক এক সংস্থা গড়ে ওঠে, যার কাজ ছিল স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহণ ও সরবরাহ। এই সংস্থা যাত্রা শুরু করে ৯০% অস্থায়ী কর্মী নিয়ে, যাদের কোন সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া দিনে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হত। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসাকালীন কোন খরচ বা ছুটি পাওয়া যেত না। প্রাথমিকভাবে ১৫ দিন অন্তর মজুরি দেওয়ার কথা বলা হলেও বেতন পেতে এক-দেড় মাস সময় লেগে যেত এবং এত কিছুর পরেও কর্মীদের চাকরীর কোন স্থায়িত্ব ছিল না।[৪২] ১৯৫২ সালে আবার বেশ কিছু বিদেশী নাগরিককে নিয়োগের কথা জানা যায়। জে. আর. রবার্টস নামক এক বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে নিয়োজিত হন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।[৪৩] দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে ছাড়াও হিরাকুদ ও কাঁকরপুর বাঁধ প্রকল্পেও কিছু বিদেশী কারিগর নিয়োগের উদাহরণ পাওয়া যায়। কংক্রিট বিশেষজ্ঞ হিসাবে হিরাকুদ বাঁধ প্রকল্পে আমেরিকান ব্যয়রাম স্টীপ-কে নিয়োগের কথা জানা যায়।[৪৪] হিরাকুদ ও কাঁকরপুর বাঁধ প্রকল্পের নক্সার কাজের জন্য ডঃ জে. এস. স্যাভেজের নিয়োগের কথাও জানা যায়।[৪৫]

১৯৩৩ সালে বাংলায় কার্শিয়াং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 'গোয়েঙ্কা অ্যান্ড কোম্পানি'র উদ্যোগে নির্মিত এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে। কার্শিয়াং শহর থেকে ৪ কিমি দূরে, ফাজি রোডের উপর ৪৪৮ কিলোওয়াটের আরেকটি ইউনিট ঐ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংযোজিত হয়। এই জলবিদ্যুৎ

কেন্দ্রটি নির্মাণের সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন নেপালের প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পদ্ম এম. সুন্দর মাল্লা।[৪৬] অর্থাৎ প্রকল্পের প্রয়োজনে বৈদেশিক সহায়তা নেওয়ার এক প্রবণতা দেখা যায় এই ক্ষেত্রে যা পূর্বে ডি.ভি.সি গঠনের সময়ে দেখা গিয়েছিল। এর কিছুদিন পর ১৯৫৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড), যাদের হাতে ছিল মূলত কলকাতার পার্শ্ববর্তী শহরতলীর অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব। প্রাথমিক পর্বে এই সংস্থার কর্মী সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন মত যাদের বেশীরভাগটাই ছিল পূর্ববঙ্গের থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষ। এই সকল কর্মীদের বেতন ছিল দৈনিক ২ টাকা। শুরুর দিকে প্রতি ১০০ জন গ্রাহকপিছু কর্মী ছিল মাত্র ১৩ জন। বিংশ শতকে ষাট এবং সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সংগ্রাম, আন্দোলনের ঢেউ ওঠে তা বিদ্যুতশিল্পকেও ছুঁয়ে যায়। বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের সময় থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত সব থেকে বড় পরিবর্তন হল অস্থায়ী ও স্থায়ী কর্মীর অনুপাত ৯০:১০ এর সম্পূর্ণ বিপরীতে ১০:৯০-এ পরিবর্তিত হওয়া, যার ফলে এই সংস্থার কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়।[৪৭] বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন এর আগে, মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, এলাকাভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। কয়েকটি এলাকা ছাড়া সর্বত্রই মালিকদের মুখের কথাই ছিল আইন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছিল অলীক স্বপ্ন। শ্রমিকরা নিজেদের চাকুরীগত সমস্যাও মালিকের কাছে উত্থাপন করতে রীতিমত ভয় পেত। এরফল স্বরূপ মালিকের শোষণ, বঞ্চনার শিকার হয়ে তাদের সারাটা জীবন কাটাতে হত। রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যুৎ কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা ঐক্যবদ্ধ করা ছিল কল্পনাতীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ট্রেড ইউনিয়ান আইনে এই শ্রমিক সংগঠন গঠনের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে মাত্র ৭জন শ্রমিক মিলেই সংগঠন গড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। যে কেউই বুঝতে পারবেন ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠা, নিয়োগকর্তা

ও সংস্থার মালিকদের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ান আইনটি ইউনিয়নগুলোকে ধর্মঘট করার অধিকারও দিয়েছে আর সেই সঙ্গে দিয়েছে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে আইনি বিবাদে শ্রমিকের পক্ষে লড়ার আইনি অধিকার। তবে যেহেতু কোনও সংগঠন গড়ে তুলতে কমপক্ষে সাতজন শ্রমিক দরকার, তাই যে সংস্থায় সাতজনের কম শ্রমিক ছিল সেখানে এরকম ইউনিয়ান গড়ে ওঠার প্রশ্ন ছিল না। তাই এটা এক হিসাবে, বিশেষ করে শ্রম নিবিড় শিল্পের ক্ষেত্রে, সংস্থাকে খুব ছোট আকারে সীমিত থাকতে বাধ্য করেছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রায় গোটা সময়টা ধরেই শ্রম আইনে রাজ্যগুলো সংশোধনী এনেছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐসব রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিধির তুলনায় আইনগুলো যাতে মালিকদের দিকে বা শ্রমিকদের পক্ষ নিতে পারত। এই নির্দিষ্ট দিকে পক্ষপাত নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আগ্রহ ও রাজনৈতিক সমীকরণের ওপরে। তবে একটি সংস্থার মধ্যে বহুসংখ্যক ইউনিয়নের ব্যবস্থা হলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে নির্দিষ্ট সংস্থার উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই বিষয়েও সচেতনতা ছিল।[৪৮]

ট্রেড ইউনিয়ানের ধারণা মেহনতী মানুষের এক দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফল, এর পিছনে মূল ধারণা ছিল তাদের শুধুমাত্র 'বেতনভূক দাস' এর তকমা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং তাদের মধ্যেকার ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো। শ্রমিকদের সবথেকে বড় শক্তি ছিল তাদের সংখ্যাগত সমষ্টি, কিন্তু এই সংখ্যার আধিক্য তখনই কাজে আসত যখন তারা এক ছাতার তলায় সমষ্টিবদ্ধ থাকতে পারত। এই তাগিদ থেকেই ট্রেড ইউনিয়ানের ধারণার বাস্তবায়ন হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৪৯] ভারতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করবার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভারতীয় শিল্প বিভাগে 'রাষ্টের' প্রবেশ এবং 'পরিকল্পনা' কে হাতিয়ার করে বিদেশী পুঁজির আধিক্যের

থেকে মুক্ত এক আধুনিক শিল্প নির্ভর অর্থনীতির তাগিদ দেখা গিয়েছিল। আধুনিক শিল্পব্যবস্থার উন্নতি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে ক্রমশ 'স্থানীয়' অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের আবির্ভাব ঘটে, যাদের এর পূর্বে 'শিল্প সংস্কৃতি'-র সাথে পরিচয় ছিল না। আবার শিল্পাঞ্চলগুলিতে 'বাইরের' থেকেও মানুষের সমাগম হতে থাকে যারা দক্ষ ও উচ্চ দক্ষতার কাজগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এদের সাথে ছিল নির্মাণ শ্রমিকদের আধিক্য যাদের বিভিন্ন প্রকল্পে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে নেওয়া হত।[৫০] এই অবস্থায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠিত হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে আগের সমস্ত বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির শ্রমিকদের পর্ষদে অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত যে শুধুমাত্র শ্রমিকদের পক্ষে স্বস্তিদায়কই ছিল না, একই সঙ্গে তাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়েছিল। নির্ধারিত পরিমাণ শ্রমিক নিয়ে পর্ষদ যাত্রা শুরু করলেও কাজের প্রয়োজন অনুসারে, যেমন- নতুন এল টি লাইন বা ট্রান্সফর্মার বসানো ইত্যাদির জন্য মাস্টার রোলের মাধ্যমে কায়িক শ্রম দিতে পারে এমন কর্মীদের, কাজের এলাকাভিত্তিক স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে 'নো ওয়ার্ক, নো পে' ভিত্তিতে নিয়োগ করা হত। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কর্মীদের থাকতে হত তাঁবুতে। এমতাবস্থায় অন্যান্য কর্মীসহ এই অসংগঠিত ও অস্থায়ী কর্মীদের সংঘবদ্ধভাবে ১৯৫৭ সালে গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নটি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন ছিল।

ইতিমধ্যেই সমাজের সর্বস্তরের শ্রমিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার, শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠন করে। তাদের পরিচালনায় সারা ভারতে ৩০টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে এবং প্রায় ১৬০০ প্রাথমিক কেন্দ্রে শ্রমশিক্ষার কাজ চলেছিল। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে

শ্রম আইন, শ্রম অর্থনীতি ও অন্যান্য অনেক বিষয় পড়ানো হত। এই শিক্ষাক্রম তিনমাস ধরে চলে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার শরৎ বসু রোডে, ব্যারাকপুরে রিভার সাইড রোড এবং আসানসোলে কলেজ রোডের নিকটে এই আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।[৫১] ইতিমধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের নবগঠিত ট্রেড ইউনিয়ান তার কাজ শুরু করে দেয় এবং ১৯৫৮ সালে ইউনিয়নের নেতৃত্ব শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ পর্ষদের সদর দপ্তর অভিযান করে। মাস্টার রোল কর্মীদের সাপ্তাহিক সবেতন ছুটি ও অন্যান্য সমস্যা এই অভিযানের মূল দাবী ছিল। এই আন্দোলনের ফলেই মাস্টার রোল কর্মীরা সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি লাভ করে। ১৯৬১ সালে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বিদ্যুৎ পর্ষদের স্থায়ী কর্মীদেরও বেতন সংশোধিত হয়ে মহার্ঘ্য ভাতা যোগ হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তা অস্থায়ী কর্মচারীদের দিশেহারা করে তোলে। ইউনিয়ন, মহার্ঘ্য ভাতা চালুর জন্য আন্দোলন শুরু করলে পর্ষদ প্রশাসন বাধ্য হয়ে ৫ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা করে।[৫২]

বিদ্যুতশিল্প এমন এক শিল্প যা শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান করে তা নয়, এর পাশাপাশি কিছু অনুসারি শিল্পও অঙ্গাঙ্গীভাবে গড়ে ওঠে। ভারতের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ কল কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্পে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতি আসার পরেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনালগ্নে ১৯টি নিবন্ধিত অর্থাৎ রেজিস্টার্ড কলকারখানাতে মাত্র ২ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৫৯ টি কলকারখানাতে দাঁড়ায় ও শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে হয় প্রায় ১০ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬১ সালে আটটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ কারখানায় দৈনিক গড়ে প্রায় ১৮ হাজার কর্মী নিযুক্ত ছিল বলে জানা যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির

কারখানায় শ্রমিকদের দৈনিক গড় আয় ছিল মাত্র ৫.৫২ টাকা।[৫৩] আবার ১৯৫১ সালের পর থেকেই জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা বাড়তে থাকে যা ১৯৫৬ পর আরও বৃদ্ধি পায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুর দিকে ভারতবর্ষের সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২.৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট, যা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ১০ মিলিয়ন কিলোওয়াটে গিয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে বিপুল মাত্রায় বৈদ্যুতিক বাতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে বহু সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের ৫৪টি বৈদ্যুতিক বাতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় ৫৮৬৯ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয় যা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের মোট কর্মীর ১২.৮ শতাংশ। বোর্ডের নিজস্ব কর্মীসংখ্যার হিসাব করলে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে প্রায় ৬৭৯৩৫ জন কর্মী বৈদ্যুতিক বাতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে বড় উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ৪৬৯৯৩ জন ও ছোট উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ২০৯৪২ জন কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে আনুমানিক ৭৮ শতাংশ শ্রমিক, উৎপাদন ও তৎসম্পর্কিত কাজে বা পরিদর্শনমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। কেরানি বা তৎসম্পর্কিত কাজ, ওয়াচ ওয়ার্ড ও অন্যান্য পরিষেবার প্রতিটিতে ৮ শতাংশ কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। তবে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী ও পরিচালনার কাজে কর্মীসংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল।[৫৪] উৎপাদন ও তৎসম্পর্কিত ক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের প্রায় ৭১ শতাংশ মহিলা কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে ২০ শতাংশ ওয়াচ ওয়ার্ড, অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ এবং পেশাদারি ও প্রযুক্তিগত এবং তৎসম্পর্কিত কাজের সঙ্গে ৩ শতাংশ যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। প্রশাসনিক, কার্যনির্বাহী ও পরিচালনার কাজের সাথে যুক্ত কোন মহিলাকর্মীর উল্লেখ এই রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। বেশিরভাগ মহিলা কর্মীরা লোডিং, আনলোডিং, কয়লা ও ছাই বহন করে

আনা, সাফাইয়ের কাজ, সাধারণ সাহায্যমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। কর্মীর মোট বেতনের প্রায় ৬৬ শতাংশ প্রাথমিক মজুরি হিসেবে ধার্য করা হত এবং এছাড়া নগদ ভাতা ও মহার্ঘ্যভাতা মিলিয়ে মোট ৩১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ বোনাস দেওয়া হত। বকেয়া ক্ষেত্রের ছাড়ের অবদান ছিল নগণ্য। বৈদ্যুতিক বাতি ও বৈদ্যুতিক সংস্থার প্রায় ৮১% কর্মী রাত্রিকালীন কাজের সাথে যুক্ত থাকলেও কোন সংস্থাই এই কর্মীদের আইনানুগ কোনো সুযোগ-সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেনি এবং একথা খুবই দুঃখজনক যে আনুমানিক ৭৩% বৈদ্যুতিক সংস্থায় শ্রমিকদের কোন নির্দিষ্ট বিশ্রাম করার সময় ছিল না। ষাটের দশকে প্রায় ৭৭ শতাংশ শ্রমিক অর্জিত ছুটি গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই ছোট সংস্থাগুলি থেকে বড় সংস্থাগুলির শ্রমিকদের এই ছুটির পরিমাণ ছিল বেশি। শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশকে থাকতে হত এক কক্ষের ঘরে, ৩৮% থাকতেন দুকক্ষের ঘরে এবং বাকিরা তিন কক্ষের ঘরে থাকতেন। এক কক্ষের ঘরগুলি সাধারণত উৎপাদন শ্রমিক, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড স্টাফদের দেওয়া হত। দুই কামরার ঘরগুলি পরিদর্শন বিভাগের কর্মীদের দেওয়া হত এবং তিন কামরার ঘরগুলি মূলত প্রযুক্তি কর্মী ও কার্যনির্বাহী কর্মীদের দেওয়া হত।[৫৫] তৎকালীন বিভিন্ন নিরীক্ষণ থেকে বোঝা যায় ৩১শে মার্চ ১৯৬৫ এর মধ্যে বিদ্যুতশিল্পের সাথে মোট ৬৮ হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিলেন যার মধ্যে ২৭ শতাংশ শ্রমিকই ১৯৪৮ এর ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় ছিলেন না।[৫৬]

১৯৬৫ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পে এক টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ক্রমশ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্ষদের কর্মীদের মধ্যে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ২০ জন কর্মী ১৯৬৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের সম্মুখে গণ-অনশন শুরু করেন বলে জানা যায়। অনশনের মূল কারণ হিসাবে জানা যায় যে বিদ্যুৎ পর্ষদের লভ্যাংশ গত

বছরের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মীদের বোনাস ও অন্যান্য দাবী মানতে নারাজ ছিল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৯৬৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হলেও কোন মীমাংসা না হওয়ায় ইউনিয়ন আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ইউনিয়ন এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানায় যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্তে সকল ইউনিয়নের কাছে পাঁচ বছরের এক চুক্তি করার প্রস্তাব রাখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীদের উন্নতির স্বার্থে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তা ইউনিয়নের মনঃপূত হয়নি। ইউনিয়ন এজাতীয় কোন চুক্তি স্বাক্ষর করা ন্যায়সঙ্গত মনে করেনি বলেই আন্দোলনের পথে এগোয়।[৫৭] ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা বোনাস এবং অন্যান্য একুশ দফার দাবীতে কেন্দ্রীয় দপ্তরের সামনে গণ-অনশন শুরু করে। কুড়ি জন কর্মচারী নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হলেও তৃতীয় দিনে গিয়ে প্রায় ৬০ জন কর্মচারী এই গণ-অনশনে যোগ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অনশনের সমর্থনে ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মীরা দু-দিনের গণ-অনশন শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী এস দত্ত মজুমদারের এক বিবৃতিতে জানান যে শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আগামী ১৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের কথা জানিয়েছে। ইউনিয়নের তরফ থেকে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ করলেও, তা নস্যাৎ করে পর্ষদ ২৬০০ মাস্টার-রোল কর্মীদের তাদের গ্রেড অনুসারে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে তিনি জানান। তাঁর কথামত ঐবছর ৪% বোনাস দেওয়ার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়। ষাটের দশকের একেবারে শেষের দিকে পর্ষদের সর্বনিম্নস্তরের কর্মচারী মাসিক বেতন ছিল ১৩৭ টাকা ১০ পয়সা, যেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন মাসিক ১৩০ টাকা। শ্রী দত্ত মজুমদার আরও বলেন যে ঐ ইউনিয়ন এর আগেও একাধিকবার বেআইনী ধর্মঘট করেছে।[৫৮]

সমগ্র দেশজুড়েই সেই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মী বিক্ষোভ চলেছিল এবং তা সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সরকার 'অত্যাবশ্যকীয় কর্ম রক্ষণাবেক্ষণ অর্ডিনান্স' নামে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের যে কোন অত্যাবশ্যকীয় কৃত্যকে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে। এই অত্যাবশ্যকীয় কৃত্যকের তালিকায় ডাক, তার, রেলওয়ে, পরিবহণ ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও বিদ্যুতশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।[৫৯] ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পর্ষদ কর্মীদের সপ্তাহব্যাপী গণ-অনশনের কর্মসূচী ১৬ই সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছিল বলে জানা যায়। রাজ্য সরকারের জয়েন্ট লেবার কমিশনের উদ্যোগে ইউনিয়নের ২২ দফা দাবী নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে কর্তৃপক্ষ বোনাসের দাবী নিয়ে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পুনরায় ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ৪৮ ঘন্টার গণ-অনশন করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৬০] এরূপ পরিস্থিতিতে জনরোষ সামলানো এবং ইউনিয়নের আসন্ন ধর্মঘটের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য ও বিদ্যুৎ পর্ষদের বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতি নিয়ে জনসাধারণকে অবগত করার উদ্দেশ্যে পর্ষদ এক বিবৃতি জারি করে। পর্ষদ সেই সময় পর্যন্ত দুটি ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিয়েছিল যথা – ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন। এর কিছুদিনের মধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন নামক নতুন একটি ইউনিয়ন সংগঠিত হয়েছিল। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে একটানা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল এবং পর্ষদের কাজকর্ম পরিচালনার কাজে বিভিন্ন রকমের বাধা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই ইউনিয়ন তাদের আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে প্রায় ৫টি বেআইনী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। বিরোধ নিস্পত্তির জন্য পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এযাবৎ বহু চেষ্টা করলেও তা ইউনিয়ন নেতৃত্বের অনড় মনোভাবের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি। এই সময়ে ইউনাইটেড

ফ্রন্ট সরকারের আমলে শ্রী জ্যোতি বসু, শ্রী সুবোধ ব্যানার্জী এবং শ্রী সুশীল ধাড়া-কে নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট সাব-কমিটি এক খসড়া চুক্তি তৈরী করেছিল। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই খসড়া চুক্তির বিভিন্ন ধারা নিয়ে আপত্তি জানায় এবং এই খসড়া চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ অমান্য, অভদ্র আচরণ, পর্ষদের অফিস ও কোয়ার্টারগুলির অভ্যন্তরে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গুন্ডামী প্রভৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত ৩৩ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ জারী করলে ইউনিয়ন এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানায়। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই এই সমস্ত মামলার কয়েকটি নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ পর্ষদ কয়েকটি পুলিশী মামলা ছাড়া অন্যান্য মামলাগুলি প্রত্যাহার করতে রাজি থাকলেও ইউনিয়ন তাদের দাবীতে অনড় থাকে। ইউনিয়ন একই সঙ্গে পর্ষদের বার্ষিক আয়ের ১৬% পরিমাণ বোনাস হিসাবে দাবী করে। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এই দাবী মানতে আইনত অপারগ ছিল কারণ ১৯৬৫ সালের বোনাস আইন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তবে আইনী জটিলতা এড়ানোর জন্য পর্ষদ ঘুরপথে তার কর্মচারীদের বোনাস আইনের ধারা অনুযায়ী ‘বিশেষ পেমেন্ট’ হিসাবে ৪% দিতে রাজি হয়েছিল।[৬১] এই সময়েই পর্ষদ উদ্বৃত্ত কর্মীদের ছাঁটাই করার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অভিযোগ তুলেছিল। পর্ষদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানানো হয় যে ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে প্রায় ৩০০০ মাস্টার রোল ওয়ার্কচার্জড কর্মী পর্ষদের বিভিন্ন বিভাগে উদ্বৃত্ত থাকলেও পর্ষদ তাদের ছাঁটাই করেনি। নতুন নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে প্রায় ১০০০ উদ্বৃত্ত কর্মীকে ইতিমধ্যেই নিয়মিত চাকুরে হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। পর্ষদের ঘোষিত নীতি অনুসারে উদ্বৃত্ত সমেত সমস্ত মাস্টার রোল কর্মীকেই পর্যায়ক্রমে নিয়মিত কর্মী হিসাবে অধিগ্রহণ করা হত। পর্ষদের পক্ষ থেকে ১৯৬৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৬০০-র বেশী মাস্টার রোল কর্মীকে গ্রেডেড স্কেল মঞ্জুর করা হয়েছিল বলে জানানো

হয়েছিল। এর পাশাপাশি পর্ষদ ১৯৬৮ সালের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম রক্ষণাবেক্ষণ অর্ডিনান্সের কথা উল্লেখ করে কর্মচারীদের এই বে-আইনী ধর্মঘটের প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। এইরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে পর্ষদ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। যেসকল কর্মচারী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবে না তারা এবং 'ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স', 'সিভিল এমার্জেন্সী ফোর্স' এবং সেনাবাহিনীর প্রয়োগবিদরা সকলে মিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার চেষ্টা করবে বলে পর্ষদ থেকে জানানো হয়।[৬২] এমতাবস্থায় ১৮ই সেপ্টেম্বর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারী ইউনিয়ন তাদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও ১০ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই অনশন পুলিশি হস্তক্ষেপে প্রত্যাহার করা হয় বলে ইউনিয়ন বিবৃতি পেশ করে।[৬৩] এর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ পর্ষদের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে জানায় যে কর্তৃপক্ষের শ্রমিক বিরোধী নীতি ও কোচবিহারের ১৬ জন এবং কল্যাণীর ১ জন মাস্টার রোল কর্মীকে পুনর্বহালের দাবীতে ঐদিন সকাল ৬টা থেকে বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রায় ১৭ হাজার কর্মী ধর্মঘটে নেমেছিল। জনসাধারণ যাতে পর্ষদের উপর চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী মানতে বাধ্য করে তার জন্য পরিমল বাবু দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান।[৬৪] রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী ইউনিয়নের ধর্মঘটের প্রথম দিনে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে নিযুক্ত টেকনিক্যাল স্টাফের সত্তর শতাংশ কর্মচারী বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত, নন টেকনিক্যাল স্টাফের তিরিশ শতাংশ কর্মরত। জলঢাকা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উপস্থিতির হার ছিল মাত্র পাঁচ শতাংশ এবং এর ফলস্বরূপ ওখানে সাময়িক টেকনিশিয়ানদের দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চালু রাখা হয়েছিল বলে জানা যায়। দুর্গাপুর, ব্যান্ডেল, অশোকনগর, হাবড়া, বনগাঁ ও মুর্শিদাবাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছিল। তবে ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র থেকে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল বলে জানা যায়।

সামগ্রিকভাবে ধর্মঘটের প্রথম দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল। পর্ষদের পরিচালকমন্ডলী কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করলেও, ইউনিয়ন, কর্তৃপক্ষের হুমকী ও দমনমূলক নীতিকে অগ্রাহ্য ও তার বিরোধিতা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[৬৫] ২০শে সেপ্টেম্বর কর্মচারীদের ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক ছিল বলে পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল। পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী এস. দত্ত মজুমদার জানান যে, কর্মচারীদের উপস্থিতির হার বাড়লেও বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করায় আটটি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও তার মধ্যে ছয়টি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ আবার চালু করা গিয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছিলেন।[৬৬] বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীদের ধর্মঘটের ৪র্থ দিনে, ২২শে সেপ্টেম্বর পুলিশ ব্যারাকপুর অঞ্চল থেকে ৪ জন এবং ব্যান্ডেল থেকে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী দত্ত মজুমদার এক বিবৃতিতে জানান যে একজন ধর্মঘটী যন্ত্রপাতিসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এইরকম কঠিন পরিস্থিতিতে ক্রমে সামগ্রিক ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলী ও অন্যান্য জেলার বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয় যে, একাধিক জায়গায় লাইন চালু করার পরও নাশকতামূলক কাজ হয়েছিল এবং সেই কারনেই বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ দাবী করে যে বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্রে কর্মচারীদের উপস্থিতির হার প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ। যদিও ইউনিয়নের সম্পাদক পরিমল দাশগুপ্ত সেই দাবী সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে কর্মচারীদের ধর্মঘটের সাফল্য দাবী করে, কর্মচারীদের কাছে তাদের দাবী আদায় না হওয়া অবধি এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান।

পর্ষদের এক মুখপাত্র জানান যে, ২২শে সেপ্টেম্বর (রবিবার) হুগলীতে বহু জায়গায় বারবার বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ঠিক করলেও তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। মাখলা-আরামবাগ লাইনের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, মধ্যমগ্রাম ও বসিরহাট লাইনেও বিদ্যুৎ সরবরাহ দীর্ঘক্ষণ বন্ধ ছিল। গোবরডাঙ্গায় প্রায় ৪৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার পর তা পুনরায় রবিবার চালু হয়েছিল। রানাঘাট-বনগাঁ, চাকদহ ও শ্রীরামপুর লাইনে পুনরায় সংযোগ ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে হিন্দমোটর, লিলুয়া, ডায়মন্ড হারবার, বারাসাত, ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর, রহড়া ও সোদপুর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত চালু ছিল।[৬৭] ধর্মঘটের ফলে প্রথম তিনদিন নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি এবং তার আশেপাশের সকল এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছিল।[৬৮] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ২৩শে সেপ্টেম্বরও (সোমবার) বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, আটটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। নাশকতামূলক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রান্সমিশন লাইনে পুলিশি প্রহরা বৃদ্ধি করাও হয়েছিল। হাবড়া-বারাসাত এবং মাখলা-আরামবাগ ট্রান্সমিশন লাইন সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। পর্ষদের তরফ থেকে এক মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, গতকাল রাত পর্যন্ত পুলিশ ২০ জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে। জলপাইগুড়িতে ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষতি করার সময় ২ জন ধর্মঘটী কর্মীকে জনসাধারণ হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সোদপুর, ডায়মন্ড হারবার, বিরাট, হাবড়া, বারাসাত ও মাখলা অঞ্চলে ব্যাপক নাশকতামূলক কাজ হয়েছিল বলে জানা যায়।

ঐ সময়ে শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয় যে, এপ্রিল মাসের প্রতীকী ধর্মঘট থেকে শুরু থেকে ১৯ দফা দাবী নিয়ে তাদের এই

আন্দোলন চলছে। তবে এর মধ্যে (১) সাসপেনশন, চার্জশীট, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার এবং কর্মীদের ঐ সময়ের পূর্ণ বেতন প্রদান, (২) ছাঁটাই না করার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, (৩) বোনাসের ফয়সালা, (৪) যুক্তফ্রন্ট-এর আমল থেকে ইউনিয়নের উপর একতরফা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার যে অবমাননাকর শর্ত চাপানোর চেষ্টা চলেছে তা প্রত্যাহার এই চারটি দাবীর উপর ইউনিয়ন মীমাংসায় রাজী ছিল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, পর্ষদ যুক্তিহীনভাবে বোনাসের পঞ্চাশ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করছে। ইউনিয়নের তরফ থেকে পর্ষদের খামখেয়ালীপনার সমালোচনা করা হয় ও অত্যাধিক অর্থ ব্যয় এবং কম পরিমাণ আয়ের জন্য পর্ষদকে দায়ী করা হয়। অপরদিকে পর্ষদ তার পূর্বের অবস্থানে অনড় থেকে জানায় যে, পর্ষদ ছাঁটাই না করার নীতি আগে থেকেই গ্রহণ করেছিল এবং অস্থায়ী কর্মচারীদেরকে চাকুরীতে স্থায়ী হিসাবে নেওয়া হয়েছে। সাসপেনশনের ক্ষেত্রে পর্ষদ জানিয়েছিল যে, ১২ জনের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত চলছে, তাদের ছাড়া বাকিদের সাসপেনশন আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বোনাসের ব্যাপারে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ তাদের আইনত অপারগতা জানিয়ে বলেছিল যে, বোনাসের বদলে 'বিশেষ পেমেন্ট' হিসাবে অতিরিক্ত চার শতাংশ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। জনৈক পর্ষদ মুখপাত্র ধর্মঘট চলাকালীন নাশকতামূলক কাজকর্মের জন্য ইউনিয়নের কর্মচারীদেরই দায়ী করেছিলেন।[৬৯] ধর্মঘটের পঞ্চম দিনে বিদ্যুৎ পর্ষদের ইউনিয়নের ১৬ জন কর্মীকে নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[৭০] ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী এস. দত্ত মজুমদার এক বিবৃতিতে জানান যে, লেবার কমিশনারের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও পর্ষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দুইটি ইউনিয়ন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটির সরকারি স্বীকৃতি প্রত্যাহিত হয়েছিল এবং অপরটির কোন স্বীকৃতিই ছিল না। তাই পর্ষদ, রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের সাথে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। অপরদিকে এইসময়ে

রাজ্য সরকার ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে 'সাবোতাজ' বা অন্তর্ঘাতের অভিযোগ আনে। কলকাতা-ব্যান্ডেল সরবরাহ লাইনে 'সাবোতাজ' হওয়ার ফলেই কলকাতার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। বারাসাত সাবস্টেশনের ট্রান্সফরমারের ক্ষতি করার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়। বোমাবাজীর জন্যও ইউনিয়নকেই দায়ী করা হয়। বিদ্যুতশিল্পের এই ধর্মঘট চলাকালীন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। যত দিন গড়িয়েছিল ধর্মঘটের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উত্তরবঙ্গের জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৪৩৪ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১৩২ জন কাজে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। নদীয়ার হরিণঘাটা থানার মোহনপুরের সরকারি খামারের ধান ক্ষেতের বৈদ্যুতিক তার কাটতে গেলে দু'জন ধর্মঘটী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার উত্তর চব্বিশ পরগণার খড়দার একজন ধর্মঘটী, কাজে যোগদানে ইচ্ছুক কর্মচারীদের বাধা দিতে গেলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে বারাসাত পুলিশ চারজন ধর্মঘটী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছিল। বসিরহাটের ভবানীপুরে বৈদ্যুতিক তার কাটতে গেলে দু'জন কর্মচারীকে স্থানীয় জনসাধারণকে হাতেনাতে ধরে এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গৌরীপুর ও জোকায় পরিস্থিতি সাধারণ থাকলেও মেদিনীপুর, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, অশোকনগর, হাবড়া, বসিরহাট, টাকি ও হাসনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ২৪শে সেপ্টেম্বর অবধি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। বিদ্যুৎ পর্ষদের জনৈক মুখপাত্র এক বিবৃতি পেশ করে জানায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি ষ্টেশন এবং সকল সাবস্টেশনে নিয়মমাফিক কাজ চলেছিল কিন্তু ধর্মঘটীদের সাবোতাজের দরুণ ব্যারাকপুর-বারাসাত, মাখলা–সিঙ্গুর-তারকেশ্বর এলাকার একাংশ, মাখলা-উলুবেড়িয়া, খড়্গপুর-হিজলী-মেদিনীপুর, আলিপুরদুয়ার-হ্যামিল্টনগঞ্জ, ঘুম-কার্সিয়াং, মহিনগর-সোনারপুর, বেহালা-বিড়লাপুর এবং পুরুলিয়া-আনারা লাইনের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। সাইকেলের চেন কিংবা তার জুড়ে আইসোলেটরগুলির ক্ষতি করা, ট্রান্সফর্মারের তেল বার করা কিংবা কনডাকটারগুলো কেটে নেওয়ার মত বিভিন্ন

পন্থার মাধ্যমে 'সাবোতাজ' করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ব্যান্ডেলে 'সাবোতাজ'-এর ফলে বৈদ্যুতিক ট্রেন কুড়ি মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল রঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যুৎ পর্ষদের ধর্মঘটী শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আনা 'সাবোতাজ' ও নাশকতার অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবী করেন। তিনি আরও বলেন যে, কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের উপর হিংসা ও উৎপীড়ন করলে তা শ্রমজীবী সমাজকে আরও বেশী করে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলবে। উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায় যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক শ্রী সুধীন কুমার ইউনিয়নের ধর্মঘটের স্বপক্ষে গিয়ে বলেন যে, এই ধর্মঘটের ফলে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে ১৯৫৮ সালে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের স্বীকৃতি এই ধর্মঘটের অজুহাতে বাতিল করা হয়েছিল। সুধীন কুমার এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানান। মীমাংসার দিকে না গিয়ে, পর্ষদের, ধর্মঘটীদের পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে মোকাবিলা করার পন্থারও বিরোধিতা করেন তিনি। পুলিশ এই সময়ে ৫০ জনের বেশী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে এবং ব্যান্ডেল, উত্তরবঙ্গ, ব্যারাকপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মঘটীদের বাড়ি বাড়ি হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ও অনড় মনোভাবের প্রতি নিন্দা জানিয়ে সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ কর্মীদের এই ন্যায্য সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসতে বলেন।[৭১] ২৫শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের সপ্তম দিনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল দাশগুপ্ত (নকশালপন্থী বলে পরিচিত) এক বিবৃতি দিয়ে জানান যে, পর্ষদ যদি (১) বিনাশর্তে সাসপেনশন অর্ডার, চার্জশীট প্রভৃতি প্রত্যাহার, (২) মাস্টার রোল কর্মচারীদের ছাঁটাই না করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, (৩) বোনাস সংক্রান্ত ন্যায়সঙ্গত চুক্তি এবং (৪) বিরোধ মীমাংসার প্রশ্নে ইউনিয়নের উপর অসম্মানজনক শর্ত আরোপ না করে, তাহলে ইউনিয়ন সম্মানজনক

ভাবে মীমাংসার জন্য প্রস্তুত। তিনি আরও বলেছিলেন যে, জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে শুধুমাত্র পর্ষদ নয় তারাও যথেষ্ট ভাবিত এবং দ্রুত মীমাংসা হলে দুর্গাপূজার আগে বিদ্যুৎ সরবরাহ আগের মত সচল রাখার জন্য তারা বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে জানা যায় যে, বাম কমিউনিস্ট নেতা শ্রী জ্যোতি বসু ২৫শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধর্মবীরের সঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীদের ডাকা ধর্মঘট নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রমদপ্তর থেকে এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করা হয়নি।

পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী দত্ত মজুমদার সাংবাদিকদের জানান যে পুলিশি সক্রিয়তার ফলে 'সাবোতাজ'-এর ঘটনা তুলনামূলক ভাবে আগের থেকে কমেছে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কার্সিয়াং ও ঘুমের মধ্যবর্তী স্থানে ট্রান্সমিশন টাওয়ার ও ফীডার লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল এবং জোকা-আমতা, জোকা-মহিনগর লাইনে 'সাবোতাজ'-এর খবর পাওয়া গিয়েছিল। ২৪শে সেপ্টেম্বর মালদার ট্রান্সমিশন লাইন সারানোর পর পুলিশ পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে এযাবৎ গ্রেপ্তার হওয়া মোট কর্মীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫২।[৭২] পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে এবং ইউনিয়ন ক্রমাগত বিভিন্ন ভাবে পর্ষদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ৪ঠা অক্টোবর নদীয়ার গয়েশপুরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একটি ট্রান্সমিশন টাওয়ার কেটে ফেলায় নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনার অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পর্ষদের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে 'বৃহত্তম নাশকতামূলক কাজ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পর্ষদ আরও জানায় যে, ৩রা অক্টোবর রাত ১১:৩০টা নাগাদ গয়েশপুরের ব্যান্ডেল-ধর্মপুর (নদীয়া) ১৩২ কিলোভোল্ট লাইনের ট্রান্সমিশন টাওয়ারের দুটি স্তম্ভ করাত দিয়ে কেটে ফেলার ফলে ৬০ ফুটের বেশী উঁচু টাওয়ারটি ভেঙ্গে পড়ে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ টাওয়ারটির মাধ্যমে পর্ষদ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। আপৎকালীন

পরিস্থিতিতে পর্ষদ সি.ই.এস.সি থেকে বিদ্যুৎ ধার নিয়ে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে। আদিসপ্তগ্রাম-সোনারপুর লাইন থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে রেলওয়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল। কর্ড রোড সাবস্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে এবং ফারাক্কা থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা পর্যন্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুর্গাপুর-ব্যান্ডেলের ৬৬ কিলোভোল্ট লাইনটিও নাশকতামূলক কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রী সুখময় পাল এক বিবৃতি পেশ করে দাবী আদায় না হওয়া অবধি এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। যদিও সেইসময় পর্ষদের বক্তব্য অনুসারে বিভিন্ন ষ্টেশন ও দপ্তরে যোগদানকারী কর্মচারীদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে জানা যায়। বর্ধমানে ৩৯ জন, ব্যান্ডেলে ও জলঢাকায় ১৫ জন, জলপাইগুড়িতে ৪০ জন ও মাকড়দহে ২৭ জন যোগ দিয়েছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন সংবাদপত্রগুলির প্রতিবেদন অনুযায়ী গয়েশপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি দেখেছিল। ইতিমধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে কড়া হাতে বিষয়টি সামলানোর নির্দেশ দিলে পুলিশ ৩৫ জন ধর্মঘটী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। শুধুমাত্র তাই নয়, নাশকতামূলক কাজ হতে দেখলে পুলিশকে গুলি চালানোর অনুমতি ও নির্দেশ দেওয়া হয় বলেও জানা গিয়েছে।[৭৩] ইতিমধ্যেই পর্ষদ ধর্মঘটী কর্মীদের এক বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের জন্য ৭ই অক্টোবর অবধি সময় দিয়েছিল। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ না হলে পর্ষদ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বলে জানায়।[৭৪] পর্ষদের এই হুঁশিয়ারির ফলে ৩রা অক্টোবর বিকেল অবধি ৩৯৭ জন কর্মচারী পুনরায় কাজে যোগ দেয় বলে জানা যায়। এর মধ্যে চাঁপাডাঙ্গা কনস্ট্রাকশন সাবডিভিশনে ১৪৫ জন কাজে যোগ দিয়েছিলেন বলে পর্ষদ বিবৃতিতে পেশ করে। ধর্মঘটী কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের এই মিথ্যা প্রচার আদতে ধর্মঘটীদের মনোবল ভাঙার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে ইউনিয়ন দাবী করে। ওয়ার্কার্স

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার বিষয়টিকে নাকচ করে দিয়ে বলা হয় যে, আজ পর্যন্ত পর্ষদের মোট ১৭০০০ কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১০০০ জন কর্মরত। পর্ষদ, উত্তরবঙ্গের ৩৫% কর্মী পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার কথা বললেও, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক এই দাবী নস্যাৎ করে জানান যে, বিগতদিনে উত্তরবঙ্গে ৫ জন কর্মীও পুনরায় কাজে যোগ দেয়নি। ইউনিয়ন, পর্ষদকে কটাক্ষ করে এক বিবৃতি পেশ করে যে, কর্মীদের প্রতি পর্ষদের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, মাকড়দহে ১৩২ কিলোভোল্টের লাইনটি ধর্মঘটী পক্ষের দু'জন সহকারী লাইন্সম্যান, একজন মজদুর এবং একজন খালাসী নষ্ট করার চেষ্টা করলে স্থানীয় মানুষ তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।[৭৫] ৫ই অক্টোবর পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কৃষ্ণনগর বহরমপুর সংযুক্তকারী ৬৬ কিলোভোল্টের লাইনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বেথুয়াডহরির কাছে টাওয়ারের একটি স্তম্ভ কেটে ফেলে লাইন বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। পাশাপাশি ব্যারাকপুরের নিকট কালিয়ানিবাস সাবস্টেশনে বিদ্যুতের তার কেটে দেওয়ায় এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। পুরুলিয়া, ঝালদা অঞ্চলের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে ঝালদা, জয়পুর ও টুলিন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে জানা যায়। শিলিগুড়িতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ডিজেল সেট চালিয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-এর অফিস ও শহরতলীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক পরিমল দাশগুপ্ত বিবৃতি দিয়ে জানান যে, পর্ষদ নিজেরাই সরবরাহ হ্রাস, নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও যন্ত্রপাতি ধ্বংসের কাজ করে ইউনিয়নের উপর দোষ চাপাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ধর্মঘটের স্বপক্ষে সমর্থন জানিয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্যুৎ কর্মীরা বিশেষ তার বার্তা পাঠিয়েছিল।

পরিমল দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীর কাছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপ দাবী করেছিলেন।

ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় যে, প্রায় ৯০% এর বেশী কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন। অপরদিকে পর্ষদের বিবৃতি অনুযায়ী ৬ই অক্টোবর অবধি জলঢাকাতে ৪৩ জন, শিলিগুড়িতে ৩০ জন, হ্যামিলটনগঞ্জ সাবস্টেশনে ৩০ জন, ব্যান্ডেলে ১০ জন, কল্যাণ কন্সট্রাকশন ও ডিসেরগড় সাবস্টেশনে ১৫ জন করে কর্মচারী নতুন করেনির্মাণের (কন্সট্রাকশান) কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত ২৪-২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন পর্ষদকে প্রায় ২৫০০০ কিলোওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল।[৭৬] ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে খবর আসে যে ২৯শে সেপ্টেম্বর জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শিলিগুড়ি আগত ৬৬ কিলোভোল্ট পাওয়ার লাইনের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। সেই সময়ে ঐ লাইন মেরামত করার জন্য এক ইটালিয়ান ফার্মকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ঐ বছর দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর সন্ধ্যা থেকে শিলিগুড়ি শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়ে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হয়েছিল। ২রা অক্টোবর, বিদ্যুৎ পর্ষদের উত্তরবঙ্গ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এ. কে. গাঙ্গুলি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে, অতিদ্রুত এই লাইন সংস্কার করে শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি আরও জানান যে কুমারী জঙ্গলের চাপরামারীতে তার আগের দিন নাশকতামূলক কাজের ফলে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, বানারহাট অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় ১৮ ঘন্টা বন্ধ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৈদ্যুতিক তারে কাউকে নাশকতার কাজ করতে দেখা গেলে দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার তাকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৭] ৭ই অক্টোবর পর্ষদের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল

যে, ৬ই অক্টোবর বিকেল থেকে জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন ষ্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে। ওদলাবাড়ি ও কোচবিহার পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল বলে জানা গিয়েছিল। অপরদিকে পর্ষদের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার শেষ দিনে অর্থাৎ ৭ই অক্টোবর বিভিন্ন অফিসে ৮০-১০০% এবং হেড অফিসে ৭২% কর্মচারী কাজে যোগ দিয়েছিল বলে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ দাবী করেছিল। যদিও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কর্মীরা বিগত ১৯ দিন ধরে কঠোরভাবে ধর্মঘট চালিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বন্যা বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ড. কে এল রাও এর সঙ্গে পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী দত্ত মজুমদারের আলোচনা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই আলোচনায় ধর্মঘটীদের প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল।[৭৮] ক্রমশ এই ধর্মঘট তার তীব্রতা হারাতে থাকে। ৯ই অক্টোবর পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী দত্ত মজুমদার দাবী করেন যে, অল্প কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া কর্মীরা সর্বত্র পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছে। তিনি দাবী করেন, গত ২১ দিন ধরে চলা এই “বেআইনি” ধর্মঘট কার্যত বানচাল হয়ে গিয়েছে। ব্যান্ডেল এবং ডিসেরগড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সকল কর্মচারীদের কাজে যোগদান করেছেন। ধর্মঘট আহ্বানকারী ইউনিয়ন দুটির বারোজন কর্মকর্তাও পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছেন বলে জানা যায়।[৭৯] এমতাবস্থায় ইউনিয়নের কাছে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল বলে মনে হয় না। ১০ই অক্টোবর বর্ধমানের কাছে একটি লাইন নষ্ট করে দেওয়ার ফলে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন থেকে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে কলকাতায় বিদ্যুতের অভাব দেখা গিয়েছিল। কলকাতাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এই চেষ্টা করা হয়েছে বলে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি সিঙ্গুরে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের ক্ষতি করতে গেলে স্থানীয় লোকেরা দুর্বৃত্তটিকে হাতেনাতে ধরে

ফেলে।[৮০] ১০ই অক্টোবর রাতে, পর্ষদের হিজলী-মেদিনীপুর সরবরাহ লাইনে নাশকতার ফলে সমগ্র মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচল দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পরিমল দাশগুপ্ত এটিকে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পর্ষদের অপপ্রচার বলে বিবৃতি পেশ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পর্ষদ সমাজবিরোধী ব্যক্তি ও ঠিকাদারের লোক নিযুক্ত করে এই সকল নাশকতামূলক কাজ করেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী অভিজ্ঞ টেকনিক্যাল কর্মী ছাড়া কাজকর্ম স্বাভাবিক করা পর্ষদের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি জনস্বার্থে, ইউনিয়নের প্রতি সম্মানজনক শর্তে ধর্মঘট মেটাতে আগ্রহী।[৮১]

পর্ষদের এক মুখপাত্র দাবী করেন যে, শ্রমিক কর্মচারীদের উপস্থিতির হার স্বাভাবিক ছিল এবং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি নিজেও কাজে যোগ দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী বিমলেন্দু দস্তিদার এবং সহসম্পাদক শ্রী প্রণব ঘোষ এক বিবৃতি দিয়ে জানান যে, পর্ষদের ১৭০০০ কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৮০০০ কর্মী উত্তরবঙ্গে কর্মরত এবং এদের মধ্যে ৯০% কর্মী এখনও দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। হাওড়া, বর্ধমান, বহরমপুর, খড়্গপুর ও কলকাতার বিভিন্ন বিভাগে এখনও ৬৫% কর্মচারী ধর্মঘটরত বলে তিনি জানান। তিনি পর্ষদের এই বিবৃতিকে মিথ্যা অপপ্রচার ও বিভ্রান্তমূলক বলেন। ১১ই অক্টোবর উত্তরবঙ্গের বন্যা ও পর্ষদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য বাংলার মানুষের দুর্গতির কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ওয়ার্কসমেন ইউনিয়ন তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী শরদিন্দু দত্ত মজুমদার ওয়ার্কসমেন ইউনিয়নের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে স্বাগত

জানিয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, সকল কর্মী শান্তিপূর্ণ ভাবে এই 'বেআইনি' ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন এবং এখন কাজে যোগ দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে পর্ষদ কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।[৮২] ১৩ই অক্টোবর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল দাশগুপ্ত এক বিবৃতি পেশ করে বলেছিলেন যে, আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এবং উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যায় সম্পূর্ণ রূপে বিপর্যস্ত জনজীবনের কথা মাথায় রেখে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ কর্মীর অসুবিধাজনক পরিস্থিতি তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে অনুঘটকের কাজ করেছে। তিনি সর্বত্র কর্মীদের কাজে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘদিন ধরে চলা ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছিল।[৮৩] এরপরও ১৪ই অক্টোবর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি পেশ করে ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর পর্ষদের প্রতিহিংসামূলক আচরণের সমালোচনা করা হয়। ধর্মঘট প্রত্যাহার হওয়ায় কর্মীরা কাজে ফিরতে গেলে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ নানা অছিলায় তাদের হেনস্থা করছে বলে ইউনিয়নের তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়। গৌরীপুর, সাঁওতালডিহির কলকাতা অফিস, হাওড়া, ব্যান্ডেল প্রজেক্ট বা কলকাতার হেড অফিস অকারণে কর্মীদের যোগদানে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল। ইউনিয়ন, এর তীব্র বিরোধীতা করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরদিকে ধর্মঘট চলাকালীন বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল, তা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নেয়। পাশাপাশি বন্যা বিধ্বস্ত জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে যান বলে পর্ষদের তরফ থেকে জানান হয়।[৮৪] ইতিমধ্যেই, জলপাইগুড়ি টাউনের বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে দুটি ডিজেলচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র নিয়ে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের একদল অফিসার ও টেকনিশিয়ান

চন্দ্রকোণা থেকে জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।[৮৫] ধর্মঘট থেমে গেলেও ইউনিয়ন কর্মীদের আন্দোলন যে পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তা কিন্তু নয়, ১৬ই অক্টোবর, দার্জিলিং জেলে বন্দী পর্ষদের ৬ জন কর্মচারী রাজনৈতিক মর্যাদার দাবী জানিয়ে ২৪ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন করেছিল।[৮৬] ১৮ই অক্টোবর দুর্গাপুর প্রকল্পের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী এ. কে. দত্ত দুর্গাপুরে অনুষ্ঠেয় পূর্বাঞ্চলীর বিদ্যুৎ পর্ষদ অপারেশন কমিটির দশম সম্মেলনে বিদ্যুৎ কর্মী ও অফিসারদের সবধরনের ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে উঠে জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, আঞ্চলিক বিদ্যুৎ পর্ষদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি খুব সহজেই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এবং দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরাও এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন।[৮৭]

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুত্যশিল্প এরূপ টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেলেও দেশীয় স্তরে কিন্তু বিদ্যুৎ বা অনুসারী শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। স্বনির্ভর না হলেও উৎকর্ষের প্রশ্নে ভারতীয় বিদ্যুতশিল্প খুব অল্প সময়েই আন্তর্জাতিক মানচিত্রে নিজের স্থান করেনিতে পেরেছিল। ১৯৬৮-৬৯ অর্থবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রথম বিশ্বের দেশে ভারতীয় সংস্থাদ্বারা বিদ্যুৎবাহী তারের টাওয়ার রপ্তানির কথা জানা যায়।[৮৮] আবার সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের (মিশরে) আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ৩০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ৪০ কিমি দীর্ঘ ৩৩ কিলোভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তারের যোগান দিয়েছিল বলে জানা যায়। ঐ প্রতিষ্ঠানই তার পাতবার কাজ তদারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের শিক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।[৮৯] ইয়াসুন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড নামক মাদ্রাজের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মালয়েশিয়ার জাতীয় বিদ্যুৎ বোর্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী রপ্তানির দায়িত্ব পেয়েছিল। ঐ কোম্পানি ইতিপূর্বে তাঞ্জানিয়া,

কুয়েত, সুদান প্রভৃতি দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ট্রান্সফর্মার রপ্তানি করেছিল এবং পরবর্তীতে কুয়েতে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন বসানোর কাজ করে।[৯০] ১৯৭০ সালের মার্চ মাস অবধি ভারতবর্ষের ৪.০১ লক্ষ জন কর্মচারী সরকারি ও ৪০ হাজার জন কর্মচারী বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন, জল, গ্যাস ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন ক্ষেত্রর সাথে যুক্ত ছিলেন।[৯১]

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মিলন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ভেঙে গিয়ে সন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে অন্য একটি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন এবং পঙ্কজ ব্যানার্জী ও লক্ষ্মী বসুর নেতৃত্বে এনএলসিসি ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। একই সময়ে জনৈক উমাশঙ্কর রায়, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সিপিআই ও আরএসপি সমর্থকদের নিয়ে নতুন করে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন শুরু করেছিলেন। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে অরবিন্দ ঘোষ ও প্রণব ঘোষ নামক দুইজন কর্মচারী 'রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' নামেই দুটি পৃথক দল গড়েন। অপরদিকে এইসময়ে মনোরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন। সুখময় পাল ছিলেন এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের কাছে বামফ্রন্ট সরকারের আত্মসমর্পণের অভিযোগে এই দলটি ভেঙে ১৯৭৯ সালে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এর নেতৃত্বে ছিলেন ভূপতি দাশগুপ্ত, পীযূষ দেব, বিতান মজুমদার মহাশয় প্রমুখ। ইতিমধ্যেই ১৯৭১ সালে ইউনিয়ন স্থানীয় বেকারদের পর্ষদে চাকুরীর দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুললে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মিসায় জেলে ভরা হয়। পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ক্ষমতায় আসার পর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্যে বেশ কয়েক হাজার অ্যাডহক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।[৯২] ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করলে

ইউনিয়ন এর প্রবল বিরোধিতা করে। আন্দোলনের ফলে সরকার ইউনিট প্রতি ১ পয়সা দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

সমকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। লোডশেডিং এর সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। সাথে সাঁওতালডিহি-র কনভেয়ার বেল্ট ভেঙ্গে যাওয়া সমস্যাকে আর বাড়িয়ে তোলে। ১৯৭৮ সালের ৭ই জানুয়ারি সহকারী প্রকৌশলী সুজিত রায় একটি যন্ত্র পরিচালনা করতে গিয়ে অসাবধানতাবসত নিকটবর্তী এক শ্রমিককে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিন বিকেল বেলা নাগাদ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্য কমল ঘোষ নামক একজন চার্জম্যান ঐ প্রকৌশলীকে হামলা করেন। এই ঘটনার তদন্তের জন্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষ বিশেষ কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটি তাদের অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পেশ করলে দেখা যায় যে সুজিত রায় নির্দোষ ছিলেন। কমল ঘোষের এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলে কর্তৃপক্ষ মনে করে এবং এই ঘটনাকে কর্মচারীদের উচ্ছৃংখলতা ও নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপক অভাব হিসাবে গণ্য করেছিল। এই ঘটনার রেশ কাটার আগেই ৭ই ফেব্রুয়ারি উৎপাদন কেন্দ্রের ইনটেক পাম্পে কিছু সমস্যা দেখা যায়, যা মেরামত করতে গেলে দেখা যায় যে প্যানেল ওয়্যারিং এবং নিয়ন্ত্রণ বর্তনীর বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল। আবার ৮ই জুন একটি পাল্‌ভাইজার মিল বিকল হয়ে গেলে, মিলের কাছে একটি বড় লোহার টুকরো আবিষ্কৃত হয়। একই সঙ্গে ড্যাম্পারের ভুল সংযোগ ও কয়লা হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের তারগুলি কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এর পাশাপাশি শ্রমিকদের একাংশের গুরুতর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অবহেলা, নিজেদের ইচ্ছামত কাজে যোগদান ও কাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, উৎপাদন যন্ত্রের অসাবধানী পরিচালনা, কাজে ফাঁকি দিয়ে সেগুলিকে জমিয়ে রেখে অধিকালে (ওভারটাইম)

সেগুলিকে করা, কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য অবজ্ঞা এবং হঠাৎ ওয়াকআউট ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই সকল ঘটনাবলী সাঁওতালডিহি প্রকল্পের কাজকে স্থিমিত করে দিয়েছিল যার প্রভাব সমগ্র বিদ্যুতশিল্পেই অনুভূত হয়েছিল। এই সকল ঘটনা রাজ্য সরকার অন্তর্ঘাতের চোখে দেখেছিল এবং পরবর্তী সময়ের যে কোন শ্রমিক অসন্তোষকেই কঠোর হাতে দমন করেছিল। বলা বাহুল্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকার সাঁওতালডিহিতে পুলিশ মোতায়েন করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৩ই জুন শ্রমিকদের মিছিলের উপর পুলিশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছিল।[৯৩] ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার অন্তর্ঘাতের তত্ত্বকে সামনে এনে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ঘাটতির সমস্যার দায় এড়াতে চেয়েছিল। শুধুমাত্র সরকারই নয় সিপিআইএম-র নেতৃত্বাধীন বিদ্যুৎ কর্মচারীদের ইউনিয়নও অন্য রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 'অন্তর্ঘাত'-র অভিযোগ এনেছিল।[৯৪] ১৯৭৭ সালে যখন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনরত তখন কিন্তু সিপিআইএম-র নেতৃত্বাধীন বিদ্যুৎ কর্মচারীদের ইউনিয়ন এতে যোগদান করেনি। বলা বাহুল্য, বেশীরভাগ কর্মচারীই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষে ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিপিআই(এম) এর মদতপুষ্ট সি.আই.টি.ইউ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে সংখ্যালঘু ছিল। কংগ্রেসের আইএনটিইউসি এবং পরিমল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীদের মধ্যে তুলনামূলক বেশী প্রভাবশালী ছিল। অপরদিকে তৎকালীন প্রশাসক (আই এ এস) শ্রী এস এম মুর্শেদও এই সমস্যার জন্য শ্রমিক বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মকে দায়ী করে প্রশাসকদের ও পর্ষদের হাতে আরও বেশী করে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদানের দাবী করেছিলেন। ১৯৭৮ সালের শুরুতে তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী পি রামচন্দ্রন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করেনিলেও শ্রমিকদের ভূমিকা নিয়ে কিন্তু কোন মন্তব্য তিনি করেন নি। তিনি এই সমস্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎমন্ত্রীর উদাসীনতাকে দায়ী করেছিলেন। সাঁওতালডিহির এই ঘটনা নিয়ে ১৯৭৮ সালের মে মাসে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, বিদ্যুতের পর্ষদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।[৯৫]

এমতাবস্থায় ৭ই জানুয়ারির ঘটনা নিয়ে পর্ষদের প্রকৌশলী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার যে বিভেদ ছিল তা নিরসনে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সচেষ্ট হলেও কমল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা পড়লে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। ইউনিয়ন অনুধাবন করতে পারে যে শ্রমিক ও প্রকৌশলীদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অচিরেই ইউনিয়ন আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিল। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অন্তর্ঘাতের অভিযোগ প্রত্যাহারই তাদের এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে তাদের পক্ষ থেকে এটাও জানানো হয়েছিল যে বয়লার, টারবাইন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগে কর্মরত সকল শিক্ষানবিশ প্রকৌশলীরাও এই আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার সাঁওতালডিহির কাজ চালু রাখার জন্য ৫৩ জন সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করেছিল। যদিও এই নিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা ফ্রন্টিয়ারের সম্পাদক তিমির বসু ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। এই ৫৩ জন 'সুদক্ষ' কর্মচারীরা আদতে পূর্বে ছাঁটাই হওয়া সিটু সমর্থক, যাদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য ওখানে পাঠানো হয়েছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন।[৯৬] এইরূপ পরিস্থিতিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিচালকদের পরিচালনা ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই সময়ে প্রকৌশলীদের দ্বারা প্রস্তুত করা এক রিপোর্টে রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির পরিকল্পনাগত ত্রুটিকে দায়ী করেছিল।[৯৭] এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্যোগে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুতের সরবরাহ ও বণ্টনের নিরিখে দ্বিখণ্ডিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।[৯৮] রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রকৌশলীরা এই সিদ্ধান্তের

বিরোধিতা করেছিলেন। এর কিছুদিন পর তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী এ. বি. গনি খান চৌধুরী, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করার জন্য বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৯৯] সাঁওতালডিহির এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সাঁওতালডিহির মুখ্য প্রকৌশলী শ্রী আর. এন. বসু পদত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার পদে শ্রী ডি. পি. রায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই শ্রী ডি. কে. রায়কে জেনারেল সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১০০] সাঁওতালডিহির বিপর্যয় এবং কর্মচারী ও প্রকৌশলীদের মধ্যেকার বিবাদ সম্পর্কিত তদন্তের জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি শ্রী এন সি বসু কয়েকজন আধিকারিক নিয়ে সাঁওতালডিহি যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।[১০১] কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখর সিং, সাঁওতালডিহির ইউনিটগুলির ক্রমাগত বিপর্যয়ের বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[১০২] অপরদিকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিচালন বোর্ডের মেয়াদ ছিল ১৯৮৩ সালের ২০শে আগস্ট অবধি। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো থেকে দুর্নীতি দূর করে, বিদ্যুতশিল্পের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বোর্ডের মেয়াদ বাড়ানোর একেবারেই পক্ষপাতী ছিল না। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ১৯৮৩ সালের ২৮শে এপ্রিল বোর্ডের সভাপতি শ্রী এন সি বসু ও অন্যান্য তিনজন সদস্যকে মহাকরণে ডেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া হিসাবে সম্বোধন করেছিলেন।[১০৩] তিনি বিদ্যুৎ পর্ষদের পরবর্তী সভাপতি হিসাবে শ্রী অংশুমান ঘটকের নাম ঘোষণা করেছিলেন।[১০৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নিয়ে বিগত ৬ বছরের মধ্যে ৩ বার পর্ষদের সভাপতি পরিবর্তিত হয়েছিল।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাঁওতালডিহি প্রসঙ্গে সাবোতাজ এর তত্ত্ব সামনে এনেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে একদিকে 'নকশাল' ও অন্যদিকে কংগ্রেসিরা এই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই সকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কর্মচারীদের প্রকৃতিগতভাবে অসামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে মনে করেন।[১০৫] যদিও সাঁওতালডিহিতে যে অন্তর্ঘাতের কথা বলা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ নিয়মতান্ত্রিক তদন্ত চালাতে এবং অপরাধীদের ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল যা এই 'অন্তর্ঘাত'-র তত্ত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। এমনকি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মকাণ্ডে 'নকশাল'-দের জড়িত থাকার যে অভিযোগ এনেছিলেন তাও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যদিও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে শ্রমিক অসন্তোষ না কি যান্ত্রিক ত্রুটি এই সমস্যার জন্য দায়ী তা তার কাছে স্পষ্ট ছিল না। তিনি বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তৃপক্ষকে তুলোধোনা করে বলেন যে কোন আধিকারিকই এই সমস্যার দায়ভার নিতে অস্বীকার করে এবং একে অপরকে দোষারোপ করেন।[১০৬] কিন্তু সমসাময়িক 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় এই বিষয়ে মন্তব্য করা হয় যে দেশের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা ভালো।[১০৭] সাঁওতালডিহির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী সংগঠন ইউনিট ছিল অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন যারা ১৯৭৭ সালে কিছু দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করে, কিন্তু সি পি এম চালিত ইউনিয়ন এই সংগ্রামকে অস্বীকার করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে। তৎকালীন পরিস্থিতি বিচারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী সংসদ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন এবং রক্ষনাবেক্ষন বিভাগের ৯০% কর্মচারী সহ বিদ্যুৎ পর্ষদের বেশিরভাগ কর্মীই এদের সদস্য। তাই কর্মচারী সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত এদেরকে উপেক্ষা বা এদের সাথে আলোচনা না করে নেওয়া অনর্থক।[১০৮] ১৯৮২ সাল অবধি এই সমস্যা চলতে থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের অবস্থা সংকটপূর্ণ ছিল বলে মনে করা হয়।[১০৯] বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস শাসনকালে যে সমস্ত অ্যাডহক কর্মচারী পর্ষদে

নিয়োজিত হয়েছিল তাদের ১৪ জনের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযোগের ভিত্তিতে ছাঁটাই করে। টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর বিরোধিতা করে বিদ্যুৎ পর্ষদের সদর দপ্তর অভিযান করে। পুলিশ কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করে। অপরদিকে ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালডিহির ঘটনায় সাবোতাজের অপরাধে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ১২ জন সদস্যকে বরখাস্ত করেছিল এবং সরকারের তরফ থেকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন ধরণের আন্দোলন বা বিক্ষোভ হলে কর্মচারীদের বেতন কাটা যাবে।[১১০] এরূপ অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী বি আর দাশগুপ্ত , রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পে কমিটির সভাপতিকে একটি চিঠি লিখে যাবতীয় সংশোধিত বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯ থেকে চালু করার দাবি জানান।[১১১] অপরদিকে বিদ্যুৎ পর্ষদের সেক্রেটারি শ্রী এস এন মেনন ও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বি আর দাশগুপ্তের মধ্যে হওয়া এক মিটিংয়ে ইউনিয়নের তরফ থেকে সভাপতি বি আর দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক বিতান বিহারী মজুমদার ,সম্পাদক কুমুদ রায় ও অন্যান্যদের বরখাস্ত রদ করার অনুরোধ জানানো হয়। পর্ষদ এর তরফ থেকে এই নিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।[১১২]

১৯৮৪ সালে প্রস্তুত করা এক রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্যুতশিল্পে পশ্চিমবঙ্গে লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার এর পেশাদারী শ্রেণীতে প্রায় ৪৩.২৮ শতাংশ কর্মী অফিসার পদস্থ, দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে ১৭.২৪ শতাংশ কর্মী প্রযুক্তিগত শাখায়, ২০.৬৯ শতাংশ কর্মী অপ্রযুক্তিগত শাখায় এবং ১৩.৭৯ শতাংশ কর্মী অদক্ষশ্রেণীভূক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। পেশাদারী শ্রেণীভুক্ত কর্মী যারা সদর দপ্তরে কাজ করতেন তাদের মধ্যে ১৩.৭৪ শতাংশ আধিকারিক, ৮.২৫ শতাংশ প্রযুক্তিগত ও ৭.৮২ শতাংশ অপ্রযুক্তিগত পরিদর্শন কর্মী,

৮.৪৬ শতাংশ প্রযুক্তিগত ও ৪৮.২৩ শতাংশ অপ্রযুক্তিগত দক্ষ শ্রমিক, ১.৪৮ শতাংশ অর্ধ দক্ষ শ্রমিক, ১৯.০২ শতাংশ অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে নথিভুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। পেশাদারী শ্রেণীতে ফিল্ড অফিস কর্মী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ৫২৯ জন অফিসার, ১৪৯৬ জন পরিদর্শক, ১০০২৪ জন দক্ষ শ্রমিক, ৯৮৩০ জন অদক্ষ শ্রমিক, ২৬৭১ জন অদক্ষ শ্রমিক মিলিয়ে মোট ২৪৫৫০ জন কর্মী কাজ করতেন।[১১৩]

বামফ্রন্ট আমলে বিদ্যুৎ পর্ষদে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশান এর জন্ম হয়। প্রায় প্রতিটা পদের বা শ্রেণীরই নিজস্ব সমস্যা তুলে ধরার জন্য অ্যাসোসিয়েশান গঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এমনই এক অ্যাসোসিয়েশান ছিল আই টি আই পাশ কর্মচারীদের। বিদ্যুৎ পর্ষদে প্রায় ৩০০০ আইটিআই পাশ কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। অন্যান্য স্থায়ী কর্মীদের থেকে এদের হয়রানি ও সমস্যা ছিল অনেক বেশী। ১৯৮৬ সালে নিজেদের দাবী দাওয়া পর্ষদের সামনে তুলে ধরার জন্য তারা ব্যান্ডেলে এক কেন্দ্রীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। তাদের মূল দাবিগুলো হলো তাদের দক্ষ শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়া এবং সমান পরিমাণে বেতন এবং পদ প্রদান করা। এই সমস্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা ১৯৮৬ সালের অগাস্ট মাসে কলকাতার সদর দপ্তর অভিযান করার পরিকল্পনা নেয় এবং সেই পরিকল্পনা সফল করার জন্য বিভিন্ন জেলায় জেলায় কর্মীসভা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই কনভেনশনে।[১১৪] ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা এবং শ্রমিকস্বার্থ সম্বন্ধীয় সুবিধাদির বিষয়ের পুনর্বিন্যাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা নবনিযুক্ত বেতন কমিটির কাছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন নিগমের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পর্ষদ ইউনিয়ন স্মারকলিপি জমা দেয়। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন ১লা এপ্রিল ১৯৮৮ থেকে শ্রমিক পিছু ন্যূনতম ১৪৩০.২৫ টাকা দাবি

জানিয়েছে।[১১৫] পর্ষদ এর সকল ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে যে সমন্বয় লক্ষ্য করা গেছে এরকম নয়। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বেতন কমিটির কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করে যে উক্ত কমিটি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। তারা দাবী করে যে তৎকালীন সরকার সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন এই মর্মে প্রচার করছে যে গঠিত বেতন কমিটি তাদেরই আবেদনের ফল। এর পাশাপাশি এই স্মারকলিপির মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের নামমাত্র বেতন বৃদ্ধির বিরোধিতাও তারা করেছে।[১১৬] **১৯৮৮** সালের **১৪ই** ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ স্টাফ ইউনিয়নের ডাকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের কয়েক হাজার কর্মচারী সল্টলেকের সেচ ভবনের সামনে দেড়শ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা, সাঁওতালডিহি ও ব্যান্ডেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ বিদ্যুৎ পর্ষদ এর হাজার হাজার কর্মী পদ সংকোচন সহ ২৪ দফা অমীমাংসিত দাবির সমর্থনে জমায়েত করেন। কর্মীদের এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ কো-অর্ডিনেশন এর সভাপতি শ্রী গুরুদাস দাশগুপ্ত, সারা ভারত বিদ্যুৎকর্মী ফেডারেশন পূর্বাঞ্চল কমিটির সম্পাদক শ্রী হিমাংশু দাস এবং এ আই টি ইউ সি-র নেতা অধ্যাপক শ্রী অমলেন্দু গাঙ্গুলী। সাংসদ শ্রী গুরুদাস দাশগুপ্ত তার ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের পুঁজিবাদী মানসিকতার সমালোচনা করেন।[১১৭] ইতিমধ্যে বক্রেশ্বরে, ৬৮২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।[১১৮] এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ এক অন্য মাত্রায় পৌঁছেছিল। রাজ্য সরকার এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল। বামফ্রন্ট **১৯৮৮** সালের **১৭ই** সেপ্টেম্বর বক্রেশ্বরে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের দাবী নিয়ে বন্‌ধ্‌ ঘোষণা করেছিল।[১১৯] শুধুমাত্র তাই নয়, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে রক্তদান কর্মসূচী, একদিনের বেতনদান প্রভৃতি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন সময়ে রাজ্য

সরকার লকআউট, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সমস্যায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং বক্রেশ্বর প্রকল্পকে ঘিরে তাদের রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল বললে ভুল হবে না।

১৯৯৫ সালের ১৯-২১শে ফেব্রুয়ারি ব্যান্ডেল শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ শিল্পে ব্যাপক হারে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ করালে বিদ্যুৎ কর্মীরা তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভোগে। সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে আগামী বছরগুলোতে বিদ্যুৎ পর্ষদ এর ক্ষেত্রে নতুন কোনো বিনিয়োগেরও আভাস পাওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে এই সম্মেলনে শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া তুলে ধরে। বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে ফেলার যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সরকার গ্রহণ করেছে তার বিরোধিতা করে এবং পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প ও প্রস্তাবিত সাগরদিঘী প্রকল্পের কাজ বিদ্যুৎ পর্ষদ এর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি সম্মেলন থেকে উঠে আসে। বিদ্যুৎ পর্ষদ এর স্বশাসন ফিরিয়ে দেওয়া এবং পর্ষদের কর্মীদের ওপর শোষণ অন্যতম মূল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এই সম্মেলনের।[১২০] এর কয়েক বছর পর ওয়াকার্স ইউনিয়ন, শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও পাওয়ারমেন্স ইউনিয়ন মিলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়ীজ জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরাম গঠন করে। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালের এক সভায় তারা ১৯৯৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঐ একই দিনে তারা সদরদপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেবে বলেও জানা যায়।[১২১] ১৯৯৬ সালের শুরুতেই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একটি অত্যন্ত জঘন্য ঘটনা সামনে আসে। পূর্বে কোন কর্মচারী মারা গেলে ক্ষেত্রবিশেষে তার পরিবারের কেউ, নারী কিংবা পুরুষ, সেই চাকরি পেত। পর্ষদ ১৯৯৬ সালের ৫ই জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (বিজ্ঞপ্তি নং- ৫৩৪০) মৃত কর্মচারীদের বদলে কোন না

নারী কর্মীকে নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত জানায়। ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বিতান বিহারী মজুমদার এই বিজ্ঞপ্তির তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে নারী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের দায়বদ্ধতাকে সম্মান জানিয়ে পর্ষদের কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন এই আদেশ বাতিল করতে। তিনি এই মর্মে মহিলা কমিশনেও চিঠি পাঠান।[১২২] ছিয়ানব্বই সালের শুরুর দিকে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এর বিভিন্ন জেলা দপ্তর গুলি থেকে বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য বিভিন্ন দাবীদাওয়া ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিসে আসতে থাকে। ন্যূনতম ৪০ টাকা বেতন বৃদ্ধি,[১২৩] সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ,[১২৪] চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যূনতম ২৪ টাকা বেতন[১২৫] কিংবা 'বিশেষ রাম্মাম ভাতা' ২২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার[১২৬] মতো বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদর দপ্তরে এসে পৌঁছায়। বলাবাহুল্য এই সব দাবি-দাওয়ার ওপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রীয় ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কমিটি পর্ষদের বেতন কমিটির সামনে তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া পেশ করে। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১৯৯৬ সালের ২৮শে জুন, পর্ষদের পে কমিটির কাছে বেতন সংক্রান্ত স্মারকলিপি জমা দেয়। পূর্বে পর্ষদে প্রায় ১৩ ধরনের বেতনক্রম চালু ছিল। তার বদলে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ৫ দফা পে স্কেল চালু করার পক্ষে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। এই পে স্কেল গুলি হল অদক্ষ, অর্ধ দক্ষ, দক্ষ, উচ্চদক্ষ বিশেষভাবে দক্ষ এবং এদের বেতনক্রম সর্বনিম্ন ২৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ১২৭১০।[১২৭]

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ, অনুসন্ধান ও চর্চা বেশ কিছু দিন যাবত চলে আসছে। শুরুর দিকের শ্রমিক সংক্রান্ত যাবতীয় লেখারই প্রধানত দুইটি দিক ছিল, একটি হল, শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ও তার বিবর্তনের ইতিহাস এবং আরেকটি হল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ইতিবৃত্ত।[১২৮] উপরোক্ত আলোচনা থেকে

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিক সমাজ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। অন্যান্য শিল্পগুলির থেকে এই শিল্প চরিত্রগত ভাবে আলাদা হওয়ার দরুণ এর শ্রমিক শ্রেণীর বিন্যাসও অন্যরকম। বিদ্যুতের চাহিদা যত বেড়েছে তাল মিলিয়ে বেড়েছে নতুন উৎপাদনকেন্দ্রের সংখ্যা, যা এক বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। এর সাথে সাথেই ছিল অনুসারি শিল্পগুলিতে হওয়া কর্মসংস্থান। এই শিল্প জন্ম দিয়েছিল নতুন নতুন জীবিকার এবং এই শিল্পের মাধ্যমে 'হোয়াইট কলার্ড' এবং 'ব্লু কলার্ড' শ্রমিকের সহাবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে থাকার ফলে এই শিল্পে সংগঠিত ইউনিয়ন গড়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব দেখা গেলেও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে কিন্তু শ্রমিক বিক্ষোভ বা ধর্মঘটমুক্ত। এইরূপ নরমপন্থী মনোভাবের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল যে বিদ্যুৎ সরবরাহের অত্যাবশ্যকতার জন্য কর্পোরেশন ও সরকার যেকোনো প্রকার আন্দোলনকেই প্রথম থেকেই কঠোর হাতে দমন করত। পাশাপাশি কর্পোরেশন সুচারু ভাবে দ্রুত কিছুটা অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া মিটিয়ে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। বিদ্যুতশিল্পের বেসরকারিকরণও এইরূপ অসংগঠিত শ্রমিক সমাজের অন্যতম কারণ। একথা ভুললে চলবে না যে ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় শ্রমিকদের উপর চলত ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকানা নির্বিশেষে শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী শোষণ। রুশবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপকে রাজদ্রোহিতা হিসাবে গণ্য করত।[১২৯]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আমাদের দেশে ঘটে গিয়েছে সেই সকল বিষয়ে বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের অবস্থান, তাদের রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যুতকর্মীরা অত্যন্ত

রাজনৈতিক ভাবে সচেতন এক শ্রেণী। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সামাজিক ক্ষেত্রেও কিন্তু শ্রেণীবিভাজন এক বিশেষ গুরত্ব বহন করে চলে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত পিতৃতান্ত্রিক ও লিঙ্গবৈষম্যযুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পর্ষদের উচ্চপদে মহিলা কর্মীদের বিশেষ উল্লেখ না পাওয়া বা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মহিলাকর্মী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারী করা। তবে উপাদানের অভাবে বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে জাতপাত বা সাম্প্রদায়িকতাবাদ, ঠিকা কর্মী ও স্থায়ী কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রের লিঙ্গবৈষম্যগত সমস্যা বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকদের একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণী হয়ে উঠতে কতটা সহায়ক বা বাধা সৃষ্টি করেছিল সেই বিষয়ে সঠিকভাবে জানা যায় না। ঠিকা বা অস্থায়ী কর্মীদের প্রতি কর্পোরেশন ও ইউনিয়নের মনোভাব কিরূপ সেই নিয়েও গবেষণার বিস্তর সুযোগ আছে। আগামীদিনে এই গণকৃত্যক ক্ষেত্রের শ্রমিক সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক চরিত্র নিয়ে আরো বিশদে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সূত্রনির্দেশ

১. পরিমল দাশগুপ্ত, মার্কসীয় অর্থনীতির সূত্র (কলকাতা: প্রিন্টার কর্নার প্রাঃ লিমিটেড, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২), পৃ. ১১-১৩।

২. তদেব।

৩. তদেব।

৪. কার্ল মার্কস, মজুরি শ্রম ও পুঁজি (মস্কো:প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯), পৃ. ৮-১২।

৫. দাশগুপ্ত, মার্কসীয় অর্থনীতির সূত্র, পৃ-২০।

৬. তদেব, পৃ-২৫।

৭. রণজিৎ দাশগুপ্ত, "শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা," নেওয়া হয়েছে 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,' নির্বাণ বসু সম্পাদিত (কলকাতা: সেতু, ২০১৩), পৃ.১-৩।

৮. অমল দাস, "ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাসের বর্তমান সঙ্কট ও সম্ভাবনা," নেওয়া হয়েছে 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,' নির্বাণ বসু সম্পাদিত (কলকাতা: সেতু, ২০১৩), পৃ.১৫-১৬।

৯. দাশগুপ্ত, "শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা, পৃষ্ঠা – ৮-৯।

১০. তদেব।

১১. দাস, "ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাসের বর্তমান সঙ্কট ও সম্ভাবনা", পৃ.১৮-১৯।

১২. নির্বাণ বসু, "বাংলার শ্রমিক চর্চার ইতিবৃত্তঃ বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতা" নেওয়া হয়েছে 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,' নির্বাণ বসু সম্পাদিত (কলকাতা: সেতু, ২০১৩), পৃ.২৯।

১৩. তদেব, পৃ-৩০।

১৪. তদেব, পৃ-৩৩।

১৫. তদেব, পৃ-৩৫।

১৬. তদেব।

১৭. তদেব, পৃ-৩৬।

১৮. তদেব।

১৯. দীপিকা বসু, “বাংলায় আধুনিক শিল্প শ্রমিকের জন্মঃ কৃষক থেকে শ্রমিক,” নেওয়া হয়েছে ‘বাংলার শ্রমশক্তি,’ রঞ্জিত সেন সম্পাদিত (কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০০০), পৃ-১৩।

২০. অমল দাস, “বাংলার শ্রমশক্তি- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা,” নেওয়া হয়েছে ‘বাংলার শ্রমশক্তি,’ রঞ্জিত সেন সম্পাদিত (কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০০০), পৃ-৭৮।

২১. যারা কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত তাঁদের Blue Collared বলা হয় এবং যারা অকায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত তাঁদের White Collared বলা হয়। বিস্তারিত- নির্বাণ বসু, “বাংলার শ্রমিক চর্চার ইতিবৃত্তঃ বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতা” নেওয়া হয়েছে ‘অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,’ নির্বাণ বসু সম্পাদিত (কলকাতা: সেতু, ২০১৩), পৃ.২৯। আরও- ‘By the term white collar employees we specifically mean the clerical and supervisory employees in industrial concerns, mercantile firms, central and state and semi government offices.’- Anuradha Kayal, Organisation and movement of white collar employees of West Bengal in the Post-Colonial Period (1947-77), PhD Thesis, Kolkata:2013, P-1.

২২. Suvobrata Sarkar, Domesticating Electricity; Growth of Industry, Utilities and Research in Colonial Calcutta’, The Indian Economic and Social History Review 52, No. 3, (2015): P-363.

২৩. অমিতাভ রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, (কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৩), পৃ-১২।

২৪. নির্বাণ বসু, "প্রাক-স্বাধীনতা কলকাতার একটি গণকৃত্যক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনঃ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-একটি সমীক্ষা" নেওয়া হয়েছে 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,' নির্বাণ বসু সম্পাদিত (কলকাতা: সেতু, ২০১৩),পৃ.২৬৪-৬৫।

২৫. "গোলযোগ মীমাংসার প্রচেষ্টা," যুগান্তর, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, পৃ-৭।

২৬. তদেব।

২৭. "দেশপ্রিয় পার্কে জনসভা" যুগান্তর, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, পৃ-৭।

২৮. বসু, "প্রাক-স্বাধীনতা কলকাতার একটি গণকৃত্যক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন, পৃ.২৬৪-৬৫।

২৯. Nirban Basu, 'Gandhi, Gandhians and Labour; The Bengal Scenario, 1920-1947', Rivista Di Studi Sudasitaci III, 2008, P-21.

৩০. নির্বাণ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৭।

৩১. Anonymous, "Calcutta Electric Supply Corporation Worker's Conference," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No- XLIV-No.-11, Calcutta (10th August, 1946): P-320.

৩২. Anonymous, "Tramways and Electric Supply Workers Threatened Strikes; Both Referred to Adjudication," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No- XLV-No.-7, Calcutta (18th January, 1947): Pp.172-74.

৩৩. Anonymous, "Electric Supply Worker's Union," The Calcutta Municipal Gazette, Vol No- XLVII-No.18, Calcutta (20th March, 1948): P-354.

৩৪. Ministry of Water Resources, Central Water Commission, ‘‘Ambedkar’s Contribution to Water Resources Development,” A Research Project by Central Water Commission, New Delhi, 1993, P-132.

৩৫. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-২২।

৩৬. Ministry of Home Affairs, Central services, “Non-Indian of Mr. J. L. Potocki, a polish National as workshop superintendent under the Damodar Valley Corporation – Ministry of workers, mines and power,” File No :- 36/82/C.S, 1950, National Archives Of India.

৩৭. Ministry of Home Affairs, Central services, ‘‘Non-Indian - Appointment of Mr. S. C. Wang as Head Operator (Tractor) in the Damodar Vally Corporation,” Central services, File No :– 36/28 – C.S, 1950, National Archives Of India.

৩৮. Ministry of Home Affairs, Central services, ‘‘Non-Indian – Appointment of Mr. S. C. Kai, a Chinese National as Operator grade IIIFile No :- 36/68–C.S, 1950, National Archives Of India.

৩৯. Ministry of Home Affairs, Central services, “Non-Indian – Appointment of Mr. G. H. Ballin German as Mechanic Engineer in the Damodar Valley Corporation under Ministry of work, mines and power,’’ File No :- 36/63-C.S, 1950, National Archives Of India.

৪০. Ministry of Home Affairs, Central services, “Proposal from the Ministry of works, mines and power for – of Mr. K. S. Rajagopalon as Assistant in a provisionally permanent vacancy and also the question of seniority of assistants in that Ministry,” File No.- 37/1-N.G.S, 1950, National Archives Of India.

৪১. Ministry of Home Affairs, Establishments Section, Government of India, “Classification of Posts as ‘Selection’ and ‘Non-Selection’ in the office of the Central Electricity Commission-Criterion Regarding”, File No.-12/6/50-Ests, National Archives of India, 1950, P-2-3.

৪২. বিশ্বজিৎ হালদার, প্রসঙ্গঃ বিদ্যুৎ, পৃ-৮-৯।

৪৩. Ministry of Home Affairs, Central services, ‘‘Non-Indian – appointment of Mr. J. R. Roberts as Mechanic Engineer in Damodar Valley Corporation,” File No :- 36(77)-C.S/C, 1952, National Archives Of India.

৪৪. Ministry of Home Affairs, Central services, ‘‘Non-Indian of Mr. Byram Steep–American Concrete specialist in the Central Water & power Commission–Hirakund Dam Project–Ministry of Irrigation & Power,” File No : 36(66) – CS(C), 1952, National Archives Of India.

৪৫. Ministry of Home Affairs, Central services, ‘‘Non-Indian of Dr. J. S. Savage in the Central water and power Commission in connection with the design of Hirakund and kakarpur Dam projects, Ministry of NR & SR,” File No : 96(8) – CS(C), 1952, National Archives Of India.

৪৬. রায়, বাংলার বিদ্যুত-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ-১৪।

৪৭. হালদার, প্রসঙ্গঃ বিদ্যুৎ,পৃ-৮-৯।

৪৮. দেবাশীষ মিত্র, শ্রম-আইন ও ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র ; সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা (কলকাতা: যোজনা, এপ্রিল ২০১৫), পৃ.১৬-১৯।

৪৯. A.B Bardhan, Trade Union foundation ; Lecture Notes (New Delhi: AITUC Publication,1986), P-56.

৫০. তদেব, পৃ-৩১।

৫১. "শ্রমিক শিক্ষা পর্ষদ," যুগান্তর, ১লা আগস্ট, ১৯৬৭, পৃ-৪।

৫২. শ্রী স্বপন দাস কর্তৃক প্রেরিত 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি, ২৮.১০.২০১৫, শ্রী বিতান মজুমদারের (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, পৃ-৪।

৫৩. Ministry of Labour, Labour Bureau, "Report on Survey of Labour Conditions in Electrical Machinery Factories in India," Employment and Rehabilitation, 1965, Nehru Memorial Museum & Library, P-2.

৫৪. Ministry of Labour, Labour Bureau, 'Report on Survey of Labour Conditions in Electric Light and Power Stations', Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, 1965-66, Nehru Memorial Museum & Library, Pp-1-6.

৫৫. তদেব, পৃ-৮-২৯।

৫৬. তদেব, পৃ-৪৮।

৫৭. স্টাফ রিপোর্টার, "রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের গণ-অনশন," যুগান্তর, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৬।

৫৮. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের গণ-অনশন চলছে," যুগান্তর, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-২।

৫৯. "অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ অর্ডিন্যান্স," যুগান্তর, শনিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৬০. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ কর্মীদের গণ-অনশনের কর্মসূচী সমাপ্ত," যুগান্তর, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

৬১. "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ-এর বক্তব্য," যুগান্তর, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

৬২. "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ-এর বক্তব্য," যুগান্তর, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৯।

৬৩. "বিদ্যুৎ কর্মীদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার," যুগান্তর, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৩।

৬৪. স্টাফ রিপোর্টার, 'বিদ্যুৎ পর্ষতের ১৭ হাজার কর্মীর আজ থেকে ধর্মঘট', যুগান্তর, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৩।

৬৫. স্টাফ রিপোর্টার, "রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের ধর্মঘট,"যুগান্তর, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৩।

৬৬. স্টাফ রিপোর্টার, "রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের ধর্মঘটের ২য় দিন," যুগান্তর, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

৬৭. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ পর্ষদের ৬ জন ধর্মঘটী কর্মী গ্রেপ্তার," যুগান্তর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা – ১।

৬৮. "নিউ ব্যারাকপুরে অচলাবস্থা," যুগান্তর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৫।

৬৯. স্টাফ রিপোর্টার, "সোমবারও কয়েকটি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত," যুগান্তর, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৯।

৭০. স্টাফ রিপোর্টার, “রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ১৬ জন কর্মী গ্রেপ্তার,” যুগান্তর, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৯।

৭১. স্টাফ রিপোর্টার, “পুজোর আগে বিদ্যুৎ পর্ষদ ধর্মঘট মীমাংসার আশা,” যুগান্তর, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৭২. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ কর্মচারী ধর্মঘট আলোচনার কথা,” যুগান্তর, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ-৫।

৭৩. স্টাফ রিপোর্টার, “গয়েশপুরে বৈদ্যুতিক টাওয়ার বিধ্বস্ত : তিনটি জেলা অন্ধকার,” যুগান্তর, ৫ই অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ-১।

৭৪. “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিবৃতি,” যুগান্তর, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৩।

৭৫. স্টাফ রিপোর্টার, “কাজে যোগ না দিলে বিদ্যুৎ কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা,” যুগান্তর, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৫।

৭৬. স্টাফ রিপোর্টার, “বৈদ্যুতিক লাইনে আরও অন্তর্ঘাতি কাজের অভিযোগ,” যুগান্তর, ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৭৭. “জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পে নাশকতামূলক কাজ,” যুগান্তর, ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৮।

৭৮. স্টাফ রিপোর্টার, “ধর্মঘটী বহু বিদ্যুৎ কর্মীর কাজে যোগদান,” যুগান্তর, ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

৭৯. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ ধর্মঘট কার্যত বানচাল,” যুগান্তর, ১০ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৮০. স্টাফ রিপোর্টার, “আবার বিদ্যুৎ লাইন ধ্বংসের চেষ্টা,” যুগান্তর, ১১ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৮১. স্টাফ রিপোর্টার, “নাশকতামূলক কাজের ফলে মেদিনীপুর বিদ্যুৎহীন”, যুগান্তর, ১২ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৫।

৮২. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়নের ধর্মঘট প্রত্যাহার,” যুগান্তর, ১২ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৮৩. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ ধর্মঘট সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত,” যুগান্তর, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-১।

৮৪. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার,” যুগান্তর, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

৮৫. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা চেষ্টা,” যুগান্তর, ১২ই অক্টোবর, ১৯৮৬, পৃ-৫।

৮৬. নিজস্ব প্রতিনিধি, “বিদ্যুৎ পর্ষদের ৬ জন কর্মীর জেল অনশন,” যুগান্তর, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-৭।

৮৭. নিজস্ব প্রতিনিধি, “বিদ্যুৎ কর্মীদের প্রতি আবেদন,” যুগান্তর, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ-২।

৮৮. ‘ধনধান্যে’, বর্ষঃপ্রথম সংখ্যাঃ১৬, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭০, পৃ-১৯।

৮৯. ‘ধনধান্যে’, বর্ষঃপ্রথম সংখ্যাঃ২০, ৮ই মার্চ, ১৯৭০, পৃ-২০।

৯০. “৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী রপ্তানি,” ধনধান্যে, বর্ষঃপ্রথম সংখ্যাঃ২০, ৮ই মার্চ, ১৯৭০, পৃ-১৩।

৯১. “কলোম্ব পরিকল্পনাঃ দাতা ও গ্রহীতা হিসাবে ভারতের ভূমিকা,” ধনধান্যে, নিউ দিল্লী, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২৫শে জুলাই, ১৯৭১, পৃ-২৫।

৯২. শ্রী স্বপন দাস কর্তৃক প্রেরিত ‘অনীক’ পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি, ২৮.১০.২০১৫, বিতান মজুমদারের (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, পৃ.৭-৮।

৯৩. Adhir Chakravarty & Timir Basu, “Operation Santaldih”, Economic and Political Weekly, Vol 13 No. 40, October 7 1978, P-1685.

৯৪. ‘Power Trouble’, Current Topics, The Times of India, 22nd September 1977, P-6.

৯৫. Special Correspondent, ‘Bengal plan to streamline working of power units’, The Times of India, 25th May 1978, P-7.

৯৬. Adhir Chakravarty & Timir Basu, “Operation Santaldih”, P-1686.

৯৭. শুভদীপ দাস, “পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের সঙ্কট ও শ্রমিক অসন্তোষঃ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (১৯৬৫-১৯৮৫ খ্রি.)”, নেওয়া হয়েছে ‘ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ষষ্ঠ খণ্ড’, ময়ূখ দাস সম্পাদিত, (বারুইপুর;পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর ২০২০), পৃষ্ঠা-১৮৭।

৯৮. ‘A Long-overdue Reform’, The Times Of India, 11th April 1980, P-6.

৯৯. 'U.K. experts may examine power system in Bengal', The Times Of India, 23rd July 1981, P-7.

১০০. স্টাফ রিপোর্টার, "সাঁওতালদি'র বিপর্যয়ের নেপথ্যে", দৈনিক বসুমতী, ৬৯ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃ-৪।

১০১. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ উৎপাদনের কিছুটা উন্নতি হয়েছে", দৈনিক বসুমতী, ৬৯ বর্ষ ১৪১ সংখ্যা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ-১।

১০২. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎঃ সাহায্য করতে কেন্দ্র প্রস্তুত", যুগান্তর, ৪৬ বর্ষ ২০৮ সংখ্যা, ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ-৩।

১০৩. স্টাফ রিপোর্টার, "রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হল", যুগান্তর, ৪৬ বর্ষ ২১৪ সংখ্যা, ২৯শে এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ-১।

১০৪. Special Correspondent, "Four Bengal power officials axed", The Times of India, 30th April 1983, P-13.

১০৫. Gautam Bhadra, West Bengal - The Political Economy of Load-Shedding-I, (Calcutta: Frontier, 15th July, 1978), Pp.5-7.

১০৬. Anonymous, "No Management at Electricity Board, Says Basu," The Statesman, 23rd April 1979, P-3.

১০৭. Gautam Adhikari, "Learning to Live in the Dark," The Hindu, 28th March 1979, P-5.

১০৮. নিজস্ব প্রতিনিধি, "সাঁওতালদি বিপর্যয়", আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৪ই জানুয়ারি ১৯৭৮,পৃ-৩।

১০৯. “Power Situation Remains Critical”, The Statesman, 21nd July1982, P-3.

১১০. “Current Topics: Belated Firmness Auspicious Moment,” The Times of India, Calcutta, 5th Feb 1983, P-4.

১১১. Letter from B. R. Dasgupta (President, WBSEB Technical Workers Union) to Chairman, Pay Committee, WBSEB, Dt. 30th Nov 1982 (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

১১২. Record Notes of meeting held with WBSEB Technical Worker’s Union in presence of Secretary on 03.02.1983. (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

১১৩. IAMR Report No. 5/1983-84, Manpower in the Power Sector, Volume 3 : Transmission , Distribution and Rural Electrification, I.A.M.R Sectoral Studies, New Delhi, November 1986, Pp.38-49.

১১৪. খসড়া প্রস্তাব, “আই টি আই পাশ বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের কেন্দ্রীয় কনভেনশন,” ৮ই জুন ১৯৮৬, পৃ.১-৫।

১১৫. “বেতন কমিটির নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি,” হাতিয়ার, ৭ম বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ-১।

১১৬. “আমাদের কথা,” বিদ্যুৎ বার্তা, নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃ-৩।

১১৭. “১৪ই ডিসেম্বর সফল বিদ্যুৎ ভবন অভিযান,” একতা, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃ-১।

১১৮. Planning Commission, Department of Power & Energy, Government of India, “Bakreshwar T.P.S. Stage-I (3 X 210 MW)”, File No. – I-26(9)/1/85-P&E, 1985, National Archives of India, P-11.

১১৯. ‘এই বন্ধ্‌-এর আহ্বান কতটা আন্দোলনমুখী’, গণদাবী, ৪১ বর্ষ, বুলেটিন নং-২, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ-১।

১২০. “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,” বিদ্যুৎ বার্তা, অক্টোবর ১৯৯৪- মার্চ ১৯৯৫, পৃ-৫।

১২১. Minutes of The Constituent Unions Met, West Bengal State Electricity Board Employees’ Joint Action Forum, 19.12.1995 (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

১২২. Letter from Bitan Mazumdar (Assistant Secretary, WBSEB Workers’ Union) to The Chairman, WBSEB; Dt. 02/02/1996, (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

১২৩. Letter from Divisional Secretary, Jaldhaka Division Committee, WBSEB Workers Union to The Office Secretary, WBSEB Workers’ Union, 1st April 1996 (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

১২৪. যোগেশ রায় (মালদা জেলা কমিটি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) কর্তৃক প্রেরিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদকের প্রতি, ১লা এপ্রিল ১৯৯৬ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার (জুনিয়ার) শ্রী গোপাল মুখার্জি-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

১২৫. গোপাল মুখার্জি (হাওড়া জেলা কমিটি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) কর্তৃক প্রেরিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদকের প্রতি, ৩০শে মার্চ ১৯৯৬ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার (জুনিয়ার) শ্রী গোপাল মুখার্জি-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

১২৬. Letter from Sumanta Bhowmik (President, WBSEB Workers Union) to The Office Secretary, WBSEB Workers' Union, 1st April 1996 (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

১২৭. Memorandum on behalf of West Bengal State Electricity Board Workers' Union before The Pay Committee, Annexure-II, 28TH June 1996, P-5.

১২৮. রণজিৎ দাশগুপ্ত, "শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা", নেওয়া হয়েছে, 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস', নির্বাণ বসু সম্পাদিত,(পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু প্রকাশনী: কলকাতা,২০১৩), পৃ-২।

১২৯. সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস; ১৮৩০-১৯৭০, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, ১লা মে, ১৯৭৫), পৃ-২২৪।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও অচিরাচরিত শক্তির আগমন

বিদ্যুতায়ন যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্বরূপ। কোন উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে গড়ে তুলতে হলে যে কোন শক্তি সম্পদকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। শক্তি সম্পদ বলতে আমরা সমস্ত রকম জৈব ও অজৈব শক্তির সম্পদকে বুঝি, এগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদিকে বাণিজ্যিক শক্তিসম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। বিদ্যুতের ব্যবহার শক্তিসম্পদ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নত দেশের তুলনায় কম হলেও যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানচিত্রে পরিবর্তন আনতে এটি একটি কার্যকরী সম্পদ হিসেবে পরিগনিত হয়। আবার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিক দিয়ে বিদ্যুতায়নের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শিল্প, বাণিজ্য ও গৃহস্থালির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এক অপরিহার্য উপাদান হলেও এর চরিত্র কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন। শিল্প বা বাণিজ্যে বিদ্যুৎ অপরিহার্য এবং এগুলো মূলত শহরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কিন্তু গৃহস্থালিতে বিদ্যুতের ব্যবহার কোনও ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদিও গৃহস্থালির ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অপরিহার্য হলেও তা আজও সহজলভ্য বা সহজপ্রাপ্য নয়। ভারতে স্বাধীনোত্তর পর্বে বিদ্যুতায়ন ক্রমে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামে বিদ্যুতায়নের মূল লক্ষ্যই ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া। একবিংশ শতকেও ভারতের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুতের বন্টনের তারতম্য বেশ চোখে পড়ার মত, যা গ্রামের আর্থসামাজিক চিত্রকে শহরের থেকে ভিন্ন করে তুলেছে। বিদ্যুতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক উপকরণগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে সাময়িকভাবে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী যতটা উৎপাদন করা হচ্ছে, তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন

আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতগুলিকে গুরুত্ব দিতেই হয়, নচেৎ ভবিষ্যতে এর প্রয়োজন সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভবপর হবে না।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের পুনর্গঠন কমিটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দৃঢ়তার মূল ভিত্তি হিসাবে শিল্পায়নকে চিহ্নিত করে এবং এর অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে অবিচ্ছেদ্য ও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের যোগানের কথা উল্লেখ করে। পুনর্গঠন কমিটি বিদ্যুতের ব্যবহারের তিনটি মূল ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল গ্রামীণ অঞ্চলগুলির ও কৃষিজ যন্ত্রপাতির বিদ্যুতায়ন। এই কমিটি অনুমান করেছিল গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ছাড়া গ্রামের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কৃষিজ সমৃদ্ধি অসম্ভব। একটি আভ্যন্তরীণ হিসাব পেশ করে এই কমিটি দেখায় যে ভারতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ২-৫০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ২২০০টি গ্রাম ছিল এবং এই সকল গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হলে অতিরিক্ত ৪.৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা সৃষ্টি হবে। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও কৃষিক্ষেত্রের সহায়ক যন্ত্রপাতির বিদ্যুতায়ন সমান্তরালগামী হওয়ায় বিদ্যুতের পর্যাপ্ত যোগানের সহযোগিতা কৃষিক্ষেত্রের সমৃদ্ধিকে বাস্তবায়িত করবে বলেও ধারণা করা হয়েছিল।[২] স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিত ও সুদৃঢ় করা। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা তুলনামূলক বেশি এবং এই বিপুল চাহিদার যোগানের জন্য ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুতের উৎপাদন ও সুষম বন্টনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ভারতের মত গ্রামীণ কৃষি নির্ভর দেশের আর্থসামাজিক পটভূমিকা উন্নত করতে হলে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ এক অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ ছিল। বিদ্যুতকে কৃষির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক মুখ্য উপাদান হিসাবে পরিগনিত করা হয়, যা গ্রাম্য অর্থনীতির উন্নয়নেও সহায়ক হয়ে উঠবে। বৈদ্যুতিন জলসেচের সুবিধার সাথে সাথে আরও বেশি সংখ্যক জমিকে কৃষির

আওতায় আনা ও শস্য উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ফলে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থায় 'সবুজ বিপ্লবে'র জোয়ার আনা সম্ভব। বলা বাহুল্য এর ফলে কৃষকরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়েই লাভবান হবে তা নয়, বিদ্যুতের ব্যবহার গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করবে। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নতুন কর্মসংস্থান, শিল্প সম্ভাবনা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান উন্নয়নেও সহায়ক হবে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে মানবসম্পদের আদান-প্রদান হ্রাস পাবে এবং নতুন আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমেরিকার মত উন্নত অকৃষিপ্রধান দেশে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ধারণা কিন্তু বহু আগে থেকেই চলে আসছে। ১১মে ১৯৩৫ সালে এক্সিকিউটিভ অর্ডার-৭০৩৭ অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতে গ্রামীণ অঞ্চলের বিদ্যুতায়নের জন্য রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান অ্যাডমিনিস্ট্রেশান গঠিত হয়েছিল এবং এর ঠিক এক বছরের মধ্যে ১৯৩৬ সালের ২৯শে মে এই সংস্থা আমেরিকার লোয়া অঞ্চলের বিদ্যুতায়নের উদ্দেশ্যে প্রথম দুইটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ মঞ্জুর করেছিল।[৪]

বিদ্যুতশক্তির বহুমুখী কর্মক্ষমতা গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছিল বিকল্পহীন। পরিকল্পনা রূপায়ণকারীরা কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করেছিল যার ফলস্বরূপ পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই ভারতের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারি নীতি অনুযায়ী, যদি কোন গ্রামের রাজস্ব সীমানার অভ্যন্তরে যেকোনো কারনেই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, তবে সেই গ্রামকে বিদ্যুৎ শক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাম হিসাবে গণ্য করা হবে। প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে সমগ্র ভারতের মাত্র ০.৫৩% গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছিল। ১৯৫১ সালে মাত্র ২১০০০ বিদ্যুতচালিত পাম্পসেট কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুর সময়ে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ২৩০০ মেগাওয়াট, যার মধ্যে মাত্র ৬০০ মেগাওয়াট ছিল সরকারি

উদ্যোগে এবং বাকি ১৭০০ মেগাওয়াট ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রের উৎপাদন। ৫ বছর পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই উৎপাদন ক্ষমতা ১১১৮ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪১৮ মেগাওয়াট হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৬-১৯৬১) বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূর্বের তুলনায় আরও ৩৫০০ মেগাওয়াট করা হয় যার মধ্যে ২১০০ মেগাওয়াট জল এবং ১৪০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ। যদিও এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি, প্রায় ১৩০০ মেগাওয়াট পিছিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমা শেষ হয়। তবে সংখ্যার হিসাবে বিদ্যুতায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র ৪০৪১টি শহর ও গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল, দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে গিয়ে তা দাঁড়ায় ২৩,৯৬৯ টি শহর ও গ্রামে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য ভারী শিল্পের উন্নতির বিষয়ে তৎপর হয়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস অবধি ভারতবর্ষের ৫০ হাজারের বেশী জনসংখ্যাযুক্ত ১৮৪টি শহর ও গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে ১০০০০ এর কম জনসংখ্যা বহুল ৩৩৬৮৫টি গ্রাম ও শহরে যা মোট সংখ্যার মাত্র ৩.৮% অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভবপর হয়েছিল।[৫]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। মূলত এর উদ্দেশ্য ছিল শহরতলী ও গ্রামের ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিকল্পনানুসারে, যে সমস্ত জেলায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা আছে বা ব্যবস্থা করা সম্ভব, সেই সমস্ত অঞ্চলে তহসিলদার এবং কৃষি, শিল্প, রাজস্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের সাথে যুক্ত জেলা আধিকারিকগণের সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছিল। এই জেলাভিত্তিক পরিকল্পনাগুলিকে, রাজ্য সরকারের সমগ্র রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করার

কথা বলা হয় যাতে গ্রাম্য বিদ্যুতায়ন অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সমান তালে চলতে পারে। যদি কোন প্রান্তিক অঞ্চলে ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিস্থাপন করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করা প্রয়োজন বলে এই পরিকল্পনায় বলা হয়। এই সময়ে সারা দেশে ২৫ থেকে ১০০ কিলোওয়াটের ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গঠন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় এই ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ডিজেল চালিত অল্টারনেটরের থেকে বেশি লাভজনক হবে বলে মনে করা হয়েছিল। এগুলি চালু বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে কোনরকম বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। এই সময়ে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজকে সহজতর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করার পরামর্শ দেয়। বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির পক্ষে এই পরামর্শ মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। এর কারণ ছিল মূলত দুটি, যথা- প্রথমত, গ্রিড পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয়, যা সর্বত্র উপলব্ধ ছিল না। দ্বিতীয়ত, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি ব্যবসায়িক কারণে শহর ও শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে, যেগুলি দ্রুত লোড নিতে সক্ষম সেই সমস্ত স্থানে, বিদ্যুৎ বন্টনে বেশি আগ্রহী ছিল। যদিও রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবের মত কিছু কিছু রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদ এই সংরক্ষণের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সামান্য লাভ রেখে গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদনের মত জনমুখী নীতি অনুসরণ করলেও এই সংরক্ষণের নীতির প্রশ্নে সহমত পোষণ করেনি।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্ধপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব এই সমস্ত রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের বৃদ্ধির জন্য প্রচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার কোনো পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়নি বা পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নত

ও উন্নয়নশীল গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের বিদ্যুৎ ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য প্রায় ১০০ ফুট পর্যন্ত সার্ভিস লাইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যেসকল গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থকরী দিক দিয়ে লাভজনক ছিল সেইসকল অঞ্চলগুলিকেই প্রাধান্য দিত।[৭] ১৯৬৫ সালের পর থেকে মাদ্রাজ ও মহীশুর ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। প্রাথমিক ভাবে বেশিরভাগ রাজ্যেই গ্রামীণ পরিসরে বিদ্যুতায়নের বিষয়টিকে কার্যকরী করে তোলার অনুকূল সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু রাজ্যে তাৎক্ষণিক সাময়িক কিছু পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলেও স্পষ্টতই সেগুলিতে পরিকল্পনার অভাব দেখা গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের কাজ বাস্তবায়ন করাকে আরও দুষ্কর করে তুলেছিল। নিবিড় বসতিযুক্ত শহরাঞ্চলে, বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা তুলনামূলক সহজ কাজ কিন্তু গ্রাম্য অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদাসম্পন্ন অঞ্চলগুলি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের কার্যকরী হওয়া এবং সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তবে এই সময়ে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য আলাদা করে কোন পরিষদ বা সমিতি গঠিত হয়নি। জেলা উন্নয়ন পরিষদের উপরই গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি এলাকায় ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থা ,সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত ঋণ ও সুযোগ-সুবিধা, উন্নত বীজ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মতো ক্রিয়াকলাপের জন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করেছিল।[৮] পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রদায় উন্নয়ন বিভাগ (কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) কৃষিকার্যের বরাদ্দ থেকে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করত যা মূলত ঋণ হিসেবে বিবেচিত

হত। সম্প্রদায় উন্নয়ন বিভাগ, বিদ্যুৎ পর্ষদকে যে ঋণ দিত তার শর্তাবলী ও সুদ অন্যান্য রাজ্য সরকারি ঋণের মতই ছিল। উন্নয়ন বিভাগ, কোন ব্লকের জন্য যে পরিমাণ অর্থ অনুমোদন করত ব্লকের নাম সমেত তার সম্পূর্ণ খতিয়ান বিদ্যুৎ পর্ষদকে জানিয়ে দিত। বিদ্যুতায়নের জন্য বরাদ্দ এই অর্থ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্লকের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে এই শর্তে, সম্প্রদায় উন্নয়ন বিভাগ ১৯৫৫-১৯৬১ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে প্রায় ৯৫.৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল। তবে খুবই আশ্চর্যজনক যে, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সম্প্রদায় উন্নয়ন বিভাগ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩তে কোন ঋণ দেয়নি। যদিও তথ্যের অভাবে এর কারণ জানা যায়নি।

অপরদিকে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে কোন লাভজনক প্রকল্প হিসাবে দেখত না। তাই পঞ্চায়েতগুলিকে বিদ্যুতায়ন রূপায়ণের বা বণ্টনের দায়িত্ব প্রদান করলে তা তাদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠবে বলে অনুমান করেছিল। পঞ্চায়েতের থেকে বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারেও পর্ষদ আগ্রহী ছিল না। পর্ষদের মতানুসারে পশ্চিমবঙ্গের বেশীরভাগ গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল না এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলি জনসাধারণের সার্বিক ব্যবহারের স্বার্থেও বিদ্যুৎ পরিষেবা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিল। পর্ষদ তাই পঞ্চায়েতের থেকে আলাদা করে বিদ্যুতায়নের জন্য কোনও অনুদান বা ঋণ দেওয়া সম্ভবপর নয় বলেই ধরে নিয়েছিল।[৯] তবে পঞ্চায়েতের থেকে না হলেও গ্রামীন বিদ্যুতায়নের বিষয়ে গ্রামের মানুষদের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক অনন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই রকম বহু উদাহরণ আছে যে জমির মালিকরা, বিশেষ করে কৃষিজ মরসুমের সময়ে, তাদের জমিতে বিদ্যুতের তারবাহী খুঁটি বসাতে বাধা দিয়েছিলেন। যার ফলে, পর্ষদ, বহু প্রকল্পের সময় চার থেকে প্রায় আট মাস পিছিয়ে দিতে বা বেশী

খরচ করে অন্যভাবে লাইন ঘুরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল। এইসকল ক্ষেত্রে পর্ষদের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে এবং তাদের ঐচ্ছিক শ্রমদানের মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। পাশাপাশি এই ধরণের সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুতের কার্যকরী বণ্টন এবং সামগ্রিকভাবে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক উন্নয়নের গতিকেও দ্রুততর করা সম্ভবপর হত। তবে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের সবথেকে বড় সহযোগিতা ছিল সরবরাহিত বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে বিদ্যুতায়নের আসল উদ্দেশ্যকে সফল করা।[১০]

১৯৬৫-৬৭ সালের খরা ভারতকে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। একমাত্র খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই এই নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম ছিল। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্যই জরুরি হয়ে পড়ে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ধারণা। চারিত্রিক দিক থেকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুতায়ন কিন্তু শহরাঞ্চলের বিদ্যুতায়নের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতাময় এক প্রকল্প ছিল। গ্রামে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের ব্যয়, শহরাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি এবং ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষে তার ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই বিদ্যমান রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি গ্রামাঞ্চলে অনেক কম খরচে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভর্তুকি প্রদানে উদ্যোগী হয়। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি এই ভর্তুকির জন্য প্রয়োজনীয় ঘাটতি মেটাতে শিল্প-কারখানায় বর্ধিত মাশুল এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের থেকে প্রয়োজনীয় অনুদানের আশা করলেও বাস্তবিকভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদানের কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি স্বাভাবিক নিয়মে এমনিই সরকারের পক্ষ থেকে এক বিপুল পরিমাণে অনুদান লাভ করে।[১১] এই সমস্যা দূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিত্ব এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ছাড়াও গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সঠিক রূপায়ণ ও প্রসারের জন্য এক পৃথক ও স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। রাজ্য

বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির আর্থিক দুরবস্থা যাতে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে প্রভাবিত না করে তাই ১৯৬৯ সালের ২৫শে জুলাই কেন্দ্রীয় স্তরে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন তৈরি করা হয়েছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম মূলত তৈরি হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের প্রকল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য। ভারত সরকার, বৈদেশিক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির থেকে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করা ছিল এই নিগমের মূল উদ্দেশ্য। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম প্রাথমিকভাবে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসার ও কৃষিকাজে যুক্ত পাম্পসেট ও নলকূপগুলির বিদ্যুতায়নের উপর জোর দিয়েছিল। এই সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।[১২] ভারত সরকারের সেচ এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনে প্রায় ১০ কোটি টাকা 'অথরাইজড ক্যাপিটাল' ও ৯ কোটি টাকা 'পেডআপ ক্যাপিটাল' নিয়ে এই কর্পোরেশন যাত্রা শুরু করে। কর্পোরেশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী বি ভেঙ্কটাপাইয়া এবং পরিচালন অধিকর্তা হলেন শ্রী এ সি বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৩] এই সংস্থার কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তির বিস্তার ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত পাম্পসেট ও নলকূপগুলির বিদ্যুতায়নের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, সরকারি দপ্তর ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমবায়গুলিকে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি না থাকার দরুণ, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিগম তার অধীনে অগ্রণী প্রকল্প হিসাবে ৫টি গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে, যথা- কর্ণাটকের হুকেরী (অক্টোবর,১৯৭০), অন্ধ্রপ্রদেশের সিরকিল্লা (নভেম্বর,১৯৭০), গুজরাটের কোডিনার (জানুয়ারি,১৯৭১), মহারাষ্ট্রের মূলা প্রাভারা (মার্চ,১৯৭১) ও উত্তরপ্রদেশের লখনউ (মার্চ,১৯৭১)।[১৪] এই প্রকল্পগুলি রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের অধীনে, আমেরিকার ন্যাশনাল রুরাল

ইলেকট্রিক কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন ও ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশেনাল ডেভেলপমেন্ট (US AID)-র সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছিল।[১৫]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখা যেতে থাকে। যদিও ১৯৭০-৭১ এর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুতের যোগানের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ অপর্যাপ্ততা দেখা যায় যার ফলে সমসাময়িককালে ও তার পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যুতের সহজলভ্যতা দেখা যায় না, বরং চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের মার্চ মাস অবধি সমগ্র ভারতে ৫,৬৬,৮৭৮ টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ৯০,২৫৮ টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া এবং ১৩.৫৩ লক্ষ পাম্পসেটের মধ্যে ৫.১৩ লক্ষ পাম্পসেটের বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়েছিল। অপরদিকে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন অত্যন্ত জরুরী উপকরণ ছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে ১৩০ মিলিয়ান টন শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, যা একমাত্র ব্যাপক কৃষিকাজের ফলেই সম্ভব এবং জলসেচের প্রয়োজনীয় পাম্পগুলির বিদ্যুতায়ন এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭% মানুষ কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত এবং তারা তাদের নিজের দেশের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর পর শস্য বিদেশে রপ্তানিও করে। পাশাপাশি জার্মানিও অত্যন্ত কমসংখ্যক কৃষকদের নিয়ে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় স্বনির্ভর। ভারতবর্ষের ৮০% মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত হলেও পাঞ্জাব ছাড়া অন্য কোন রাজ্যের উৎপাদন আশানুরূপ ছিল না।[১৬] ১৯৭১ সালের মার্চ মাস অবধি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ১৩টি নগর ও ৪৩৪টি গ্রামে,[১৭] হাওড়া জেলার ২৭টি নগর ও ১১১টি গ্রামে[১৮] এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ২২২৬টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ৪৮টি গ্রামে বিদ্যুতায়নের কথা জানা যায়।[১৯] এদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বুরয়ান থানার অন্তর্গত ৮টি গ্রামে, শামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৭টি গ্রামে, সুতি থানার অন্তর্গত ৩টি, লালগোলা থানার অন্তর্গত ১টি গ্রামে, ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত ৩টি গ্রামে, মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত ২টি গ্রামে, জিয়াগঞ্জ

থানার অন্তর্গত ১টি গ্রামে, কান্দি থানার অন্তর্গত ৫টি গ্রামে, ভরতপুর থানার অন্তর্গত ৩টি গ্রামে, বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ২টি গ্রামে, বেরহামপুর থানার অন্তর্গত ৮টি গ্রামে, হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত ১টি গ্রামে, নওদা থানার অন্তর্গত ২টি গ্রামে, ডোমকল থানার অন্তর্গত ৫টি গ্রামে বিদ্যুতায়নের কথা জানা যায়।[২০]

রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন সংস্থার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকেই গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সর্বনিম্ন স্তরে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কো-অপারেটিভ তৈরি করা হয়। এই কো-অপারেটিভের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা ও নীতিগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য উপরোক্ত সংস্থানিক কাঠামো বৃহৎ পরিসরে গঠিত হলেও, জাতীয় স্তরের সমস্ত নীতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রী পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন নির্ধারণ করত। রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন গঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা এবং মূলধনের যোগান দেওয়া। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার, বৈদেশিক সরকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রদত্ত মূলধনের সঠিক কার্যকারিতা নির্ধারণ করা ছিল তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।[২১] পরবর্তীকালে ক্রমশ এই কর্পোরেশনের কর্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা, গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদির সাথে সাথে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করাও এর অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এই সংস্থার কর্মপরিসর যত বৃদ্ধি পায় ততই কিন্তু তার কাজের গতি শ্লথ হতে থাকে। যার ফলস্বরূপ ক্রমশ কর্পোরেশান কর্তৃক গ্রামীণ অঞ্চলে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় যে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহের যে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তা ব্যাহত হতে থাকে। এর পাশাপাশি ধীর গতিতে হলেও কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও

মুনাফার ওপর গৃহস্থালির বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না পরিকল্পনাকারীদের কাছে গৃহস্থালির কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার এক অতিআধুনিকতার সংজ্ঞা হিসেবেই প্রতিভাত হতে থাকে। সেচ ও শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ পাওয়ার ইকোনমি কমিটিতে, বিদ্যুতকে একটি প্রাথমিক চাহিদা হিসেবে দেখা হয়েছে এবং এর দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথা-গৃহস্থালিতে আলোকিতকরণ ও কৃষিজ উৎপাদন এবং বিকল্প শক্তি সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে।[২২] পরবর্তীকালে অরণ্যের বিনাশ, কৃষির স্বল্পবিস্তার, চিরাচরিত জ্বালানির অদক্ষ ব্যবহার, ১৯৭৩ এর আরব কর্তৃক পেট্রোলিয়ামের রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিভিন্ন আর্থসামাজিক বিপর্যয় গৃহস্থালির বিদ্যুতায়নকে কৃষি উৎপাদনের বিকাশের উপর আরো বেশি করে নির্ভরশীল করে তোলে। রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি কৃষির জন্য ব্যবহৃত পাম্পগুলির বৈদ্যুতিকরনের কাজে জড়িত ছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল। এই সকল অনুন্নত অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পের উন্নয়ন করার জন্য গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়।[২৩] এর সাথে সাথেই আর্থিকভাবে অনুন্নত অঞ্চল, হরিজন বস্তি, উপজাতি গ্রামগুলির বিদ্যুতায়নের প্রকল্পে কিছু বিশেষ ছাড় দিয়ে গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারও রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে।রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের সাথে, চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে থাকে।সংগৃহীত অর্থ, কর্পোরেশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কো-অপারেটিভগুলিকে কিছু ফেরতযোগ্য ঋণ ও কিছু অনুদান হিসাবে সরবরাহ করে। প্রকল্পের মূল্যায়নের গুরুত্ব বিচার করে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের ব্যাপ্তিতে এই ঋণ প্রদান করা হত এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা

পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময়ও দেওয়া হত। তবে একথা অনস্বীকার্য, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এর জন্য যে জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তাতে সমগ্র ভারতের সকল গ্রাম ও সকল পাম্পসেট বিদ্যুতায়ন করতে কমপক্ষে কুড়ি বছর সময় লাগত। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ অবধি ভারতের ১ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য গ্রামাঞ্চলের নিকটবর্তী বৈদ্যুতিক গ্রীড থেকে সংবহন ও বন্টনের লাইনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[২৪] চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এর জন্য ৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হলেও পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ১০.৫০ কোটি টাকা করা হয়।[২৫] এই প্রসঙ্গে যোজনা আয়োগের বিদ্যুৎ বিভাগীয় প্রধান শ্রী বি এন বালিগা এক রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এর কর্মসূচি প্রশংসনীয় নয়, এমনকি তা তার প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের থেকেও কম। তিনি আরও জানান যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী এবং এই বিষয়ে বেশ কিছু মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। আশার কথা এই ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার খুব দ্রুত তাদের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংশোধন করে, বৃহৎ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রস্তুতি নিতে অগ্রসর হয়।[২৬]

১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনে জমা দিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাশ করানো। বিভিন্ন পরিকল্পনার অনুসন্ধান ও তার মানোন্নয়ন করাও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাজের আওতার মধ্যে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও

প্রকল্পগুলো সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উপর এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির অন্যতম মূল কাজ। সমগ্র বার্ষিক বরাদ্দ থেকে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হতো। এর পুরোটাই যে অনুদান ছিল তা কিন্তু নয় এরমধ্যে বেশ কিছুটা ফেরত যোগ্য ঋণ থাকত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর ১৯৭২-৭৩ এর রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে সমগ্র পুঁজির মাত্র ১০ শতাংশ বা তারও কম ঋণ প্রদান করা হয়।১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তার কার্যনির্বাহের জন্য ঋণ নেয়। এই ঋণের ৪৭% রাজ্য সরকারের, ৩২% সর্বসাধারণ ঋণ, ১০% জীবন বীমা নিগম থেকে নেওয়া। এর মধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কিছু অংশ ব্যয় করলেও, কর্পোরেশান থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট অর্থই গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। কর্পোরেশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পাশাপাশি রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কো-অপারেটিভগুলিকেও প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে। এই ক্ষেত্রেও প্রকল্পের মূল্যায়নের গুরুত্ব বিচার করে ঋণ প্রদান করা হত এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হত।[২৭]

রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের গোড়ার দিকে পাওয়ার ইকোনমি কমিটি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে গণবিপ্লবে পরিণত করার কথা বলে। এটি আমেরিকা ও দক্ষিণ জার্মানির অনুকরণে গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ধারণা ভারতবর্ষে একেবারে নতুন না হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।বলা বাহুল্য সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রামে বিদ্যুতায়নের উপরই রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের সাফল্য নির্ভরশীল ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫-৮১ সালের মধ্যে প্রায় ১৪ হাজারের বেশি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় যা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রাম সংখ্যার প্রায় ৩৮%।[২৮] এই রাজ্যে

প্রতি বর্গ কিমিতে প্রায় ৬৫২০৮ কিলোওয়াট শক্তির ব্যবহার হয় যা শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতে পাঞ্জাবের পর পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী করে তুলেছিল।[২৯] এর মধ্যে ভারতবর্ষে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সমীক্ষা থেকে জানা যায় ১৯৬৮-৬৯ সালের থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে বিদ্যুতায়নের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার (১২.৭%) জাতীয় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হারের (২৫%) তুলনায় বেশ কম ছিল।[৩০] পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালে মোট গ্রামগুলির মধ্যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পরিমাণ ছিল ৬.৪% এবং ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২২.৬%। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত যোজনা নামক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৯৬৬টি গ্রাম ও ১৫৬১টি পাম্প/টিউবওয়েল সেটের বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হয়েছিল।[৩১] যদিও এই পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কারণ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ২৭৭টি গ্রাম এবং ৫০টি টিউবওয়েলের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল।[৩২] এই কর্পোরেশন ১৯৭১ সাল অবধি ৯৩টি বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প মঞ্জুর করেছিল। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশন ১১৭২টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ৫১০৯টি বৈদ্যুতিক পাম্পসেট চালু করা এবং ১১৪৪৩টি গ্রামীণ উদ্যোগে বিদ্যুতের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে পাঁচটি বৃহৎ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ৩১৩.৯০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। গ্রামীণ এই বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হলে চাষের কাজে এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পগুলোতে বিদ্যুৎ পৌঁছান সম্ভবপর হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।[৩৩] ইতিমধ্যে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে একটি ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে ২০৭টি মৌজা ও অপর দুটি হল মালদহ জেলার পঞ্চাশটি এবং দার্জিলিং জেলার চল্লিশটি গ্রামের বৈদ্যুতিকরনের প্রকল্প। সুন্দরবন গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনার অধীনে ২০৭টি মৌজার জন্য এই কর্পোরেশান ৯১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা প্রকল্প মঞ্জুর করেছিল।[৩৪]

অপরদিকে মালদহ ও দার্জিলিং-এর গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বন বিভাগ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে ১ লক্ষ শাল গাছের খুঁটি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[৩৫] এর আগে কর্পোরেশন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনাও অনুমোদন করেছিল বলে জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সবকয়টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১৬৮৮টি মৌজা এবং ৮৬৬৭ অগভীর নলকূপ ও ৬০টি রিভার লিফট ইরিগেশন পাম্পের বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন এই পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিল।[৩৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শক্তি মন্ত্রকের দ্বারা নিয়োজিত এক কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৩৮০৭৪ টি এবং মোট জনসংখ্যার ৭৫%-র বেশি মানুষ এই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ৩৮৬টি গ্রামে বিদ্যুতের সুব্যবস্থা ছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৬৭, ৩৬৭ এবং ৬৭৪টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস অবধি পশ্চিমবঙ্গের ২৪৩৩টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছিল যা মোটের মাত্র ৬.৫%। পরবর্তীকালে ১৯৬৬-৬৯ সালের মধ্যে আরও ৮৩৯ টি গ্রামে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই কাজে গতি পায় এবং ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৯২২৭ টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় যা মোট গ্রামের ২৪%। পশ্চিমবঙ্গের ৫৮% গ্রামে লোকসংখ্যা ছিল ৫০০ জনের কম এবং এরূপ মাত্র ১১.২% গ্রামে ১৯৭৪ সালে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। অপরদিকে জনসংখ্যা ৫০০ জনের থেকে বেশি এইরূপ ৩০.৫% গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

এই প্রবণতা অমূলক বা অবৈজ্ঞানিক নয় কারণ জনসংখ্যা যত বেশী হবে গ্রাহক সংখ্যাও তত বেশী হবে এবং সমানুপাতিক হারে বিদ্যুতের চাহিদাও তত বৃদ্ধি হবে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

১৯৭৪ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩৬.৭% মানুষের কাছে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ ছিল। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি ১৫০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৩১টি হরিজন বস্তিতে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার কিন্তু সমান ছিল না। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মালদা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও ২৪ পরগনা জেলার পাম্পসেট ও নলকূপ বৈদ্যুতিন করার পরিমাণ ছিল অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশী। অপরদিকে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস অবধি কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মত জেলার মোট গ্রাম সংখ্যার কুড়ি শতাংশেরও কম গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ০.৭% কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস অবধি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে মাত্র ৪৯৯টি কৃষিকার্যে ব্যাবহারের জন্য বিদ্যুতের সংযোগের দরখাস্ত জমা পড়েছিল।[৩৭] পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের এমন ধীর গতির অন্যতম কারণ ছিল গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের প্রতি সরকারের আগ্রহের অভাব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য বরাদ্দ ছিল ১.২২ কোটি টাকা যা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.৩০ কোটি ও ০.৬০ কোটি টাকা। ক্রমে সরকার গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করলে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ১৯৬৬-৬৯, এই তিন বছরের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ২.৬৬ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২.৯৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন- হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলে শিল্পের আধিক্য বেশী থাকায় এর নিকটবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া অন্যান্য জেলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এইসকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংবহনের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাঠামো প্রস্তুত ছিল যা এই অঞ্চলের বিদ্যুতায়নের প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলেছিল। উত্তরবঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে এই সুবিধা ছিল না এবং শিল্পের আধিক্য না থাকায় বিদ্যুতের চাহিদাও ছিল সীমিত। অপরদিকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষিকাজ অনেকবেশি ছিল প্রকৃতিনির্ভর অর্থাৎ বৃষ্টি ও নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। ফলস্বরূপ কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি বা বৈদ্যুতিন পাম্পসেট বা নলকূপ ব্যবহার ততটা জনপ্রিয় হয়নি যা প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদাকে প্রভাবিত করেছিল। তবে একথাও ঠিক যে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সংস্থা ছিল না, যার ফলে বিজ্ঞানসম্মত ও গ্রামীণ চাহিদা অনুযায়ী কোন প্রকল্প গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল।[৩৮]

কেন্দ্রীয় জলসেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের উদ্দেশ্যে সংসদের সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রণামূলক কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি নির্মাণ করা হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে বিদ্যুতায়নে পিছিয়ে পড়ার কারণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে এই কমিটি আগ্রহ প্রকাশ করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে ন্যূনতম প্রয়োজনের তালিকায় রাখা হয় যাতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির সম্পদকে সুচারুভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০% গ্রামীণ জনগণকে বিদ্যুতের সুবিধা দানের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের, চতুর্থ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের প্রসারের গতি প্রশংসাজনক হলেও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে কোন উন্নয়ন ঘটেনি বলে জানা যায়। এই বিষয়ে সংসদে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই সময়ে প্রতিটি অনগ্রসর অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে আর্থিক, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পদকে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।[৩৯] এই সমস্যাগুলির পাশাপাশি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রচণ্ড বেকার সমস্যা মেটানোর জন্য গ্রামীণ বিকাশ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোদ্যোগের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সম্প্রসারণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্য সরকার ১০,০০০ গ্রামের বৈদ্যুতিকরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, অবশিষ্ট গ্রামগুলির বৈদ্যুতিকরণ সময় সাপেক্ষ এবং বিদ্যুৎশক্তির অভাবে যাতে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত না হয় তাই নিকটবর্তী অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতশক্তি আমদানী করার পরিকল্পনাও করেছিল।[৪০]

ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী গনি খান চৌধুরী রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগিয়েছে বলে দাবী করেছিলেন। তিনি হিসাব পেশ করে দেখিয়েছিলেন যে গত এক বছরে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০০০ নতুন মৌজা এবং ১৬০০ গভীর নলকূপ ও ১৩০০ অগভীর নলকূপের বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এর মধ্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশন ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দিয়েছে বলেও তিনি দাবী করেছিলেন।[৪১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে বহুস্থানেই অনৈতিক ভাবে গ্রাম সংলগ্ন হরিজন বস্তিগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হত। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার, রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনকে হরিজন

বস্তির বিদ্যুতায়নের বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪টি রাজ্যের ৭৫টি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৮৬১৭ টি হরিজন বস্তিতে ও ৪৯৫২৩ রাস্তার আলোর বন্দোবস্ত করার জন্য জন্য ১৯৭১-৭৪ সালের মধ্যে হরিজন বস্তিতে বিদ্যুতায়নের জন্য প্রায় ৩.৬৭ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয় ও তার মধ্যে ২.৫ কোটি টাকা ঋণ নির্বাহ করা হয়।[৪২] এছাড়াও কর্পোরেশান ১৯৭৩ সালের মে মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন এজেন্সি (স্মল ফার্মার্স ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সি) -র অধীনস্থ ক্ষেত্রে ১০৬টি এবং কৃষি দফতরের অধীনস্থ ক্ষেত্রে ৬০টি প্রকল্প মঞ্জুর করে। যেগুলি রূপায়ণের জন্য ৩-৫ বছর সময়কাল লাগবে বলে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[৪৩] পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের সাথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উৎপাদিত বিদ্যুৎ বণ্টন ও সরবরাহের কাজে প্রয়োজনীয় ই.সি.গ্রেড অ্যালুমিনিয়ামের অভাব এই সঙ্কটকে আরও গভীর করে তুলেছিল। এই উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহে নিযুক্ত একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।[৪৪] ১৯৭৪ সালের ২৯শে এপ্রিল রাজ্যসভায় বিদ্যুৎ এবং সেচমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের শোচনীয় অবস্থার কথা স্বীকার করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই জটিল সম্যসার সমাধানের জন্য কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।[৪৫]

অপরদিকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন শহরের বিদ্যুতায়নের তুলনায় অনেক জটিল প্রকৃতির এবং প্রকল্পের সাফল্যের মাঝখানে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব এই ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা বহু চেষ্টা করেও দূর না করতে পারার ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গুলিকে

মাঝেমাঝেই কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুতায়নের জন্য সচেষ্ট হলেও ১৯৭৪-৭৫ সালে বিভিন্ন রাজ্যের মোট চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হতে দেখা যায়। কর্পোরেশন প্রদত্ত ঋণের সঠিক রূপায়ণ না হওয়া এই ঘাটতির অন্যতম কারণ। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পিত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার অভাব এই সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এই সমস্যাকে আরো গভীর করে তুলেছিল বলে অনুমান করা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পঁচিশটি নতুন রুরাল কো-অপারেটিভ নির্মাণের কথা বলা হয়েছিল যা রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করবে।[৪৬] পঞ্চম যোজনায় ভারতব্যাপী ১৫ লক্ষ পাম্পসেট ও ১ লক্ষ ১০ হাজার গ্রাম বিদ্যুতায়নের জন্য ১০৯৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল যার মধ্যে ২৭২.৩৩ কোটি টাকা নূন্যতম চাহিদা কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল।[৪৭] চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৪ সাল অবধি পূর্বাঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের প্রসার ছিল ২২.৬% শতাংশ যা দেশের মধ্যে একাদশ স্থান অধিকার করেছিল। রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালে চারটি প্রকল্প ১৯৭১-৭২ সালে ৮টি প্রকল্প, ১৯৭২-৭৩ সালে ১৮টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আপিল করে। যদিও এর মধ্যে ১৯৭২ সাল অবধি ১৭টি প্রকল্পের প্রায় ৩৯২ লক্ষ টাকা অনুমোদন বকেয়া ছিল।[৪৮] চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবঙ্গের ৬৫৩৫টি পাম্পসেটের বৈদ্যুতিকরনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।[৪৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বাদ দিয়ে ১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল (পিক লোড) ৬৮৩ মেগাওয়াট।[৫০] ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটে বিদ্যুৎ সংকট মেটানোর জন্য বর্তমান প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়ণের তাগিদে ১২১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত হয়। তৃণমূল স্তরে

আরও বেশী সংখ্যক মানুষের কাছে বিদ্যুতের সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে বৈদ্যুতিকরনের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন রাজ্য পরিকল্পনার অন্তর্গত হলেও কেন্দ্রীয় বাজেটে বিশেষভাবে এই উপলক্ষে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত হয়।[৫১]

১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঘোষণা করেছিলেন যে অতিশীঘ্র পশ্চিমবঙ্গের আরো ৫৭৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। এই ঘোষণা কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল কারণ ১৯৭২ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুদিনের মধ্যেই চতুর্থ পরিকল্পনাকালীন ১০০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করলেও তা বাস্তবিকভাবে সফল হয়নি। যদিও পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের শেষে এর কারণস্বরূপ রাজ্যের তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান যে কেন্দ্রের থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা সময় মতো না পৌঁছানোর জন্য বৈদ্যুতিকরণের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়নি। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বিগত দিনে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সংস্থার প্রায় ৩৯টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল এবং সেই সংক্রান্ত মোট ২৩.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারিত হলেও, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে মাত্র ১১.৩৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে পর্ষদ ৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানোর পরিকল্পনা করলেও কর্পোরেশন ৬৫ কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি হয়নি এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই বরাদ্দ আরো কমিয়ে ২৭ কোটি টাকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৫২] পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের বাজেটে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ও স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেশি বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছিল।[৫৩] পশ্চিমবঙ্গের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১২৪৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে জল ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য ৫০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। সর্বভারতীয় স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে পশ্চিমবঙ্গেও

কৃষি, বিদ্যুৎ, সেচ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে পরিকল্পনা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তর, বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে, তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাধারণ উন্নয়ন মূলক প্রয়োজনে বিদ্যুতের লভ্যতা ও বণ্টনের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন দিকগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ এর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ পরিকল্পনা রচনা করার উপদেশ দিয়েছিল। একই সাথে পরিকল্পনা খাতে কত টাকা ব্যয় হবে ও পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলির হিসাব প্রস্তুত করারও নির্দেশ দিয়েছিল।[৫৫] অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য গ্রামাঞ্চলে ঘনঘন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হত যা রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাজে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. বি. এ. গনি খান চৌধুরী জানিয়েছিলেন যে বিদ্যুতের ঘাটতির জন্য এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকার গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত সার্ভিস ষ্টেশন ও সরবরাহ এবং বণ্টনের জন্য নতুন লাইন স্থাপন করে এই সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছিল।[৫৬]

গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮ কোটি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৫ কোটি, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫৩ কোটি, ১৯৬৬-৬৯ ত্রৈ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৩৭ কোটি, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮১৯ কোটি, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৮) ৮৪২ কোটি এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৬৯৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন গঠনের প্রথম ১০ বছরের মধ্যে ভারতের প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল।[৫৭] ১৯৭১ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৩৮০৭৪। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে এর মধ্যে মাত্র ৩৮৬টি গ্রামে বিদ্যুতের সংযোগ ছিল। ১৯৭৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি এই বিদ্যুতায়নের হার গিয়ে দাঁড়ায় ১২৬০২ টি গ্রামে, যা মোট গ্রামের সংখ্যার মাত্র ৩৩.১%। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এর

হার বৃদ্ধি করার জন্য কমিটি ও সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের ওপর জোর দিতে বলা হয়।[৫৮] ইতিমধ্যে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমবায় সমিতি গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ১৯৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বর, সিঙ্গুরে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিদ্যুৎ সমবায় সমিতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল। হুগলী জেলার সিঙ্গুর-হরিপাল ব্লকের এই সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিগমের উদ্যোগে এবং আর্থিক সহযোগিতায় গঠিত হয়েছিল। এই সমবায় সমিতির উপর ২৫৭টি মৌজার বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যদিও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫৪টি মৌজার বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করেছিল। এই সমবায় সমিতি অবশিষ্ট মৌজাগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পায় ।প্রাথমিক ভাবে এই সমিতি ১.৮৭ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যার মধ্যে ১.২ কোটি টাকা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশন ঋণ হিসাবে দিয়েছিল। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশন দেশের ১২ টি রাজ্যে এই ধরনের ১৬টি গ্রামীণ বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি গঠনের সহায়তা করেছিল।[৫৯] এইসময়ে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান কর্পোরেশান ১৯টি রাজ্যের প্রায় ৫০০-র বেশী নতুন গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের জন্য ঋণ ও অনুদান মিলিয়ে ১১৬ কোটি টাকার বেশী মঞ্জুর করে।[৬০] পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চলগুলির গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এর হার একেবারেই আশানুরূপ ছিল না। পার্বত্য অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং কুটির শিল্প গুলি রক্ষার্থে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন অসম্ভব রকমের প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র তাই নয় পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে ভারী শিল্পের দেখা মিলত না সেই সকল অঞ্চলে বৃহদাকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করে তোলার ফলে আঞ্চলিক কর্মসংস্থানেরও সুযোগও এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পার্বত্য অঞ্চলের বৃহদাকার এবং ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার সুযোগ থাকলেও ১৯৮০ সালের জুন মাস পর্যন্ত

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার ৫৩৬টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্ভবপর হয়নি।[৬১] প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ফারাক্কায় ৩২১ কোটি টাকার অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ফারাক্কার এই বিশাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি সারা পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রতিবেশী রাজ্যের জনজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাবে। ফারাক্কার এই অতিকায় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও উত্তর ভাগের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল।[৬২]

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক ও ডিজেল পাম্প (১৯৫৩-১৯৭৯)						
						সব হিসাব হাজারে
	১৯৫৩-৫৪	**১৯৬০-৬১**	**১৯৬৫-৬৬**	**১৯৭০-৭১**	**১৯৭৫-৭৬**	**১৯৭৮-৭৯**
বৈদ্যুতিক পাম্প সেটের সংখ্যা	৩৯	১৯৬	৫০৯	১৪১৭	২৭৯২	৩৬০০
ডিজেল চালিত পাম্প সেটের সংখ্যা	১০৭	২৩০	৪৭১	১৩৭৭	২১৭৮	২৭০৪

৪.১.ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনার্জি পলিসি, ১৯৭৯ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে

উপরোক্ত তালিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৯৫৩ থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সাল অবধি ভারতবর্ষের প্রায় ৩৬ লক্ষ বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত ছিল। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধিত চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই সময়ে সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নতুন বিশদফা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮০-৮১ সালের তুলনায় ১৯৮১-৮২ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন আনুমানিক ৯% বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় ১০.৯% মত। সারা দেশে যে ৪০ লক্ষ কৃষি পাম্পসেট বসানো হয়েছে সেগুলি ২৫-৩০% দক্ষতায় কাজ করে বলে জানা যায়।[৬৩] ১৯৮২ সালে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড় ছিল ৫১.১%। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ৪২.৭৬% গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল যা সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় কম ছিল। মালদা ও নদীয়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার কম ছিল। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত বিশদফা কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৯০ সালের মধ্যে সমস্ত

গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যা পূরণ করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কার্যত অসম্ভব ছিল। এর সাথেই যুক্ত হয়েছিল খরার দরুণ খারিফ শস্যের ঘাটতি মেটাতে সেচসেবিত অঞ্চলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব, যা এই কাজকে আরও কঠিন করে তোলে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে লগ্নির অভাবের সাথেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বণ্টনের প্রযুক্তিগত সমস্যা গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের গতি হ্রাস করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামের দিকে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি যাওয়া গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের প্রকল্পগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।[৬৪] যদিও এত অন্তরায় সত্ত্বেও ১৯৮২-৮৩ সালে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম কাজের গতি দ্রুততর করে। যার ফলস্বরূপ ঐ বছরে সারা ভারতে প্রায় ৪৮ লক্ষ সেচের পাম্প এবং টিউবওয়েলের বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভবপর হয়। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে এবং প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি হরিজন বস্তিতে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।[৬৫] গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩%। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৪ সাল অবধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল মোট গ্রামের ৬২%। ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত কুড়ি দফা কর্মসূচীতে পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির বিদ্যুতায়নের উপরও জোর দেওয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে এইরূপ মাত্র ১৮% গ্রামে বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত ছিল। নতুন এই উদ্যোগ সফল হলে এই পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৩১% এরূপ গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্ভবপর হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।[৬৬] অপরদিকে কৃষিকার্যে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫১ সালে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৩%। ১৯৬৩-৬৪ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৫.৪%। ১৯৭৭ -৭৮ পুনরায় তা বেড়ে হয়েছিল ১৪.৬% এবং ১৯৮০-৮১ সালে এই পরিমাণ আরও বেড়ে ১৭.২৩%

হয়েছিল। এই ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা দেখে বোঝা যায় যে ১৯৮৩ -৮৪ সালে কৃষিকার্যে বিদ্যুতের প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পাবে। রবি শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণকারী রাজ্যগুলিতে কৃষিকার্যে ব্যবহারের জন্য অন্তত দিনে ১০ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই ব্যবস্থা নিয়মিতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এই সব রাজ্যের পরিদর্শনে গিয়েছিল।[৬৭] গ্রামাঞ্চলে এই বর্ধিত বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প নিয়েছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল সকল গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা। জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে বায়ু, সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহারের দিকে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করা এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল। শক্তি দপ্তরের অপ্রচলিত জ্বালানি উৎস বিভাগ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিগম এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে যৌথভাবে এই প্রয়াসে অংশগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। সার্বিক এই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিয়ে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো।[৬৮]

১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রান্নার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহারের চল একেবারেই ছিল না অথচ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ০.৪৮% মানুষ রান্নার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার করত যা তৎকালীন সময়ে ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। সংখ্যার নিরিখে এটি অত্যন্ত কম মনে হলেও ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের কাছে এই সচেতনতা ছিল দুর্মূল্য। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৩.৪% মানুষ গৃহস্থ বাড়ি আলোকিতকরণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার করত, যা এই সময়ের সর্বভারতীয় গড়ের (১৪.৮৭%) থেকে বেশ কিছুটা নীচে ছিল। শুধুমাত্র তাই নয় এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের ৫৩.০৪% মানুষ গৃহস্থবাড়ি আলোকিতকরণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার করত।[৬৯] ষষ্ঠ যোজনাকালের শেষে অবধি

পশ্চিমবঙ্গের ১৯,১০০ টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন এবং ৩৩,৬৯০ টি পাম্পসেটের বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪৪.০৮% মৌজার বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন হয়েছিল।[৭০] সমসাময়িক সময়ে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার মাধ্যমে কর্পোরেশন তার ফারাক্কাস্থিত অতিকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তৈরি ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৬০০ মেগাওয়াট যার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল।[৭১]

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে গ্রামীণ অঞ্চলে চিরাচরিত বিদ্যুৎ সরবরাহ সব ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখেনি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের হার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র সমান ছিল না। যার ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। কিছুটা সেই তাগিদেই গ্রামাঞ্চলে চিরাচরিত পদ্ধতির বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে ছোট অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের তাগিদ অনুভূত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বিপুল প্রারম্ভিক অর্থব্যয় এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সরবরাহের অনিশ্চয়তা। গ্রামীণ মানুষের এই প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই সমাজভিত্তিক বনসৃজন ও জৈব গ্যাস প্রকল্পের কাজ সুসংহত করার প্রচেষ্টা সরকারি তরফে দেখা গিয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ের বিশদফা কর্মসূচীর মাধ্যমে এই ভাবনার উপর জোর দেওয়া হয়। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎসকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তর আনা সম্ভবপর হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে অন্যতম সফল উদাহরণ হল- শক্তি দফতরের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর নিকট গাজিয়াবাদ অঞ্চলের আছিজা গ্রামে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ।

জাতীয় গ্রিড ব্যবস্থার সাথে কোনওরকম সংযোগ ছাড়াই ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ঐ গ্রামে প্রথম আলো জ্বলেছিল।[৭২] ভারতবর্ষে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজে নিযুক্ত রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশান কর্পোরেশন গড়ে ওঠার পর ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত দেশের ৩ লক্ষ ৯০ হাজার গ্রামকে বিদ্যুতশক্তির আওতায় আনা হয়েছিল। ঐ সময়ে দেশব্যাপী ৬১ লাখের কিছু বেশী বিদ্যুৎ শক্তি চালিত পাম্পসেট কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত ছিল। সমগ্র দেশের ৬৭.৭৪% গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্ভবপর হয়েছিল। সারা দেশজুড়ে শুধুমাত্র বিদ্যুতচালিত পাম্পসেটগুলির দ্বারা চার লাখ হেক্টরের মত জমি চাষ করা হয়েছিল।[৭৩] ১৯৮৬ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫% মানুষ গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করত এবং সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ২০% মানুষের কাছে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ‘বিলাসিতা’ ছিল। বলাবাহুল্য ভারতের সামগ্রিক যে বিদ্যুতের সমস্যা ছিল তা অবশিষ্ট ৮০% জনসংখ্যার মধ্যে সীমিত ছিল। মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় বেশ খানিকটা কম এবং উৎপাদনকেন্দ্রগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিলম্ব এই সমস্যাকে আরও গভীরতর করে তুলেছিল।[৭৪] আশির দশকে প্রতিবছর গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম গড়ে প্রায় কুড়ি হাজার গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসে যার ফলস্বরূপ ১৯৮৬ সালে বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা বেড়ে হয় ১,৯০,২১০টি, যা দেশের সমগ্র গ্রামগুলির মধ্যে মাত্র ৩৩% ছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৮১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৪,০০০ গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছিল, যা তৎকালীন সমগ্র গ্রামের ৩৮% ছিল। নিগমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৮৬ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৪২৬২টি গ্রামের বিদ্যুতায়নের জন্য নিগম আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যদিও ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে ১৪২৬৩টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করেছিল বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। এই একই সময়ে ১,৮৫,৮৩,২৬৫ জন গ্রামীণ মানুষকে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছিল

বলে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল।[৭৫] তবে এর পাশাপাশি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে ঘিরে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনারও উল্লেখ পাই। ১৯৮৪ সালের বিধানসভায় গোঘাট অঞ্চলের বিধায়ক শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক তৎকালীন বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত মহাশয়কে গোঘাট অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন নিয়ে কটাক্ষ করেন। তিনি জানান যে গোঘাট গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি আছে, বিদ্যুৎ পরিবাহী তারও টানা আছে কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে। প্রবীর সেনগুপ্ত এর প্রত্যুত্তরে জানান যে প্রথম অবস্থাতেই গোঘাট গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি যাওয়ার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা সম্ভবপর হয়নি। এই প্রকল্প পুনরায় নবীকরণের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আশা করা যায় যে আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে এই অঞ্চলের কাজ পুনরায় শুরু হবে।[৭৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম উভয় সংস্থাই গ্রাম্য বিদ্যুতায়নকে গ্রামীণ পরিসরে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এদের বার্ষিক উন্নতির হিসাব হত প্রতিবছর কতগুলি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হল তা নিয়ে কিন্তু গ্রামে বিদ্যুৎ এর সঠিক ব্যবহার ঘটছে কিনা বা গ্রামের কতগুলি গৃহস্থ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে সেই ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৮ সালে গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে 'কুটির জ্যোতি পরিকল্পনা' গ্রহণ করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন মূলত জাতীয় গ্রিড ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল কিন্তু কিছু কিছু প্রান্তিক অঞ্চল যেগুলি জাতীয় গ্রিডের থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অসুবিধাজনক সেসকল অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রিড-বিযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল। এই গ্রিড-বিযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ মূলত অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এই ব্যবস্থাকে আরও পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউবেল এনার্জি রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি গড়ে উঠেছিল। মূলত জৈবগ্যাস ও সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার সাথে যুক্ত ছিল এই

সংস্থা। জৈবগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য সরকারি উদ্যোগে ঐ অঞ্চলে আলাদা বাগান প্রস্তুত করা হত। এই ক্ষেত্রে মাসের শেষে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া ছাড়া সাধারণ জনগণের কোন ভূমিকা বা অংশীদারিত্ব ছিল না।[৭৭] এই সংস্থা আবার নিজের অধীনে বেশ কিছু সমবায় সমিতি ও সমিতি গঠন করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৯৭ সালের জুন মাসে অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা রুরাল এনার্জি কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এটি মূলত একটি জৈবগ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। প্রায় ১০০০ গৃহস্থ বাড়িতে এই উৎপাদনকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার ছোটমোল্লাখালী অঞ্চলেও এইরূপ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। সমসাময়িক সময়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে সাগরদ্বীপ রুরাল এনার্জি ডেভেলাপমেণ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল একটি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ বেশ কয়েকটি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় যথা- ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমলপুর, ১৯৯৮ এর অক্টোবর মাসে মৃত্যুঞ্জয়নগর, ১৯৯৮ এর মে মাসে খাসমহল ও গায়েনবাজার এবং আগস্ট মাসে মহেন্দ্রগঞ্জ প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ২০০৩ সালের মধ্যে উত্তর হারাধনপুর, মন্দিরতলা, বাগডাঙ্গা, বালিয়াড়া প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলিকভাবে বিদ্যুতের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ছোট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউবেল এনার্জি রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এইসকল সমিতি ও সমবায় সমিতিগুলির প্রাথমিক মূলধন যোগান দিয়ে ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইনি জটিলতা এড়ানোর জন্য এই সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোন মাসুল না নিয়ে তার পরিবর্তে 'অনুদান' গ্রহণ করত।[৭৮]

১৯৯৬ সালের জুন মাস অবধি দেশের ৫.৭৯ লক্ষ গ্রামের মধ্যে প্রায় ৮৭% (৫.০২ লক্ষ) গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারি নীতি

অনুযায়ী, যদি কোন গ্রামের রাজস্ব সীমানার অভ্যন্তরে যেকোনো কারনেই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, তবে সেই গ্রামকে বিদ্যুৎ শক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাম হিসাবে গণ্য করা হবে। যদিও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এনার্জি এই সংজ্ঞার পরিবর্তন সুপারিশ করেছিল। এই কমিটি সুপারিশ করে যে, যদি কোন গ্রামের রাজস্ব সীমানার অভ্যন্তরে জনমানব অধ্যুষিত অঞ্চলে যেকোনো কারণেই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, তবে সেই গ্রামকে বিদ্যুতায়িত গ্রাম হিসাবে গণ্য করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই প্রচলিত সংজ্ঞা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারি এই নীতি ভীষণভাবে অস্পষ্ট। এই সুপারিশ অনুযায়ী যদি কোন গ্রামের একটি বাড়িতেও বিদ্যুতের সংযোগ থাকে তবে সম্পূর্ণ গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে বলা ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সুপারিশ করে যে, একটি গ্রামের অন্তত ৫০% অধিবাসী যদি বিদ্যুতের সংযোগ নেয় তবেই সেই গ্রামকে বিদ্যুতায়িত গণ্য করা হোক।[৭৯] ইতিমধ্যেই বন্যা, ভুমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বহু বিদ্যুৎ সরবরাহিত গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী তার ও সরঞ্জাম চুরি করার ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন হয়ে যেত। এই সমস্যা বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭০৮টি গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের থেকে ১৭১টি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের নিজস্ব খরচে ১০০টি গ্রামের পুনঃবিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়ে সমগ্র ভারতে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার ৮৭% দেখানো হলেও মাত্র ৩১% গ্রামীণ গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার একেবারেই আশানুরূপ ছিল না।[৮০] গ্রামীণ গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পাম্পসেট ও নলকূপগুলিকে বৈদ্যুতিন করে কৃষি উৎপাদনে জোয়ার আনা ছিল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য

সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের মোট ১৪৫ লক্ষ পাম্পসেটের মধ্যে ১৯৯৬ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রায় ১১১ লক্ষ বা মোট সংখ্যার ৭৬% পাম্পসেটের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই যে এইক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের গড় বিদ্যুতায়নের মাত্রার থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে ছিল। এই সময় অবধি পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ১৯% পাম্পসেটের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও এর পিছনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পাম্পসেটগুলির ত্রুটি নির্দেশ করে নির্মাতাদের প্রতি আঙুল তুলেছিল।[৮১] অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত ও অন্যান্য আঞ্চলিক প্রশাসনিক সংস্থার পরিচালনায় গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি সাধন ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সময়মত বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়া ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম চুরি কমানোর জন্য আঞ্চলিক প্রশাসনিক সংস্থাগুলির সংযুক্তিকরণ অত্যন্ত জরুরী ছিল। তখনও অবধি গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে দেশ জুড়ে প্রায় ৪১টি সমবায় সমিতি চালু করলেও তার মধ্যে ৩৪টি সক্রিয় ছিল।[৮২] গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ সালে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল মাত্র ৩.৯% পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে গিয়ে এই ব্যবহার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৯%। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এই উন্নয়ন চোখে পড়ার মত হলেও বাস্তবিকভাবে তা কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কিছুটা কম ছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন একদিকে যেরকম কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন আনতে সক্ষম হয়েছিল তেমনই শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্ষম ছিল। নীতিগত সমস্যাই এই ক্ষেত্রে মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিষয়টিকে গ্রামীণ উন্নয়ন এমনকি সমগ্র বিদ্যুৎ পরিকল্পনার থেকেও পৃথক হিসাবে দেখা হয়েছিল। সরকারের ন্যূনতম পরিষেবা প্রদান প্রকল্প থেকে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিষয়টি বাদ দেওয়া গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিয়ে সরকারের মনোভাবকে স্পষ্ট করে তোলে। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন চরিত্রগতভাবে এতটাই অলাভজনক ছিল যে এই প্রকল্পগুলির ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণও করা

হত না। এই অব্যবস্থা সরাসরি সাধারণ উপভোক্তাদের অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল। কিছুটা বাধ্য হয়েই গ্রামীণ মানুষরা বিকল্প শক্তির উৎসের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল। আলো জ্বালানোর বা ঘর আলোকিতকরণের জন্য কেরোসিন তেল বা পাম্পসেট চালানোর জন্য ডিজেল, গ্রামের মানুষদের এই প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করেছিল। ১৯৯৬ সাল অবধি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ৪০০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। জাতীয় গ্রিড ব্যবস্থা থেকে এই সকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর না হওয়ার দরুণ স্থানীয় অচিরাচরিত উৎসের মাধ্যমে বিদ্যুতের যোগান দেওয়াই একমাত্র বিকল্প ছিল।[৮৩]

অপরদিকে সিঙ্গুর-হরিপাল রুরাল ইলেকট্রিক কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৯৯৭-৯৮ সাল অবধি প্রায় ৭৫০০০ গ্রাহক ছিল যার মোট চাহিদা ছিল প্রায় ৫৫.৩ গিগাওয়াট আওয়ার্স। ২০০২ সালের মধ্যেই এই সংস্থা তাদের গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ছাপানো বিলের ব্যবস্থা করেছিল। মাসিক বিল জমা নেওয়ার জন্য গ্রাহকদের সুবিধার্থে স্থানীয় আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। শুধুমাত্র তাই নয় গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়ার জন্য সমবায়ের অধীনে পৃথক কল-সেন্টার ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। বকেয়া বিল জমা নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই সমবায় সমিতি এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লিখিত সময়কাল অবধি এই সমবায় সমিতি মোট বিলের পরিমাণের প্রায় ৯৫% আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। সময়মত বকেয়া বিল জমা না দিলে পরিষেবা বন্ধের মত কঠোর ব্যবস্থাও এই সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে নেওয়া হত বলে জানা যায়। তবে বিদ্যুতের শুল্ক নির্ধারিত হত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশনের নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী।[৮৪] পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের হার আশানরূপ না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের কাজে গতি আনার জন্য ১৯৯৮ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে। রাজ্য বিদ্যুৎ

পর্ষদ, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড প্রভৃতি সংস্থার সাথে গ্রামীণ অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বণ্টনের কাজ ভাগ করে নেওয়া ছিল এই নবনির্মিত সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এক বিপুল ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ড, পাশাপাশি উপভোক্তাদের সরবরাহিত বিদ্যুৎ ভর্তুকিযুক্ত ছিল অর্থাৎ সবরাহকারী সংস্থার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়া স্বাভাবিক ছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই গ্রামীণ প্রকল্পগুলি থেকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় করতে অপারগ ছিল। সরকার ভর্তুকি দিতে অস্বীকার না করলেও অনুদান যতটা সম্ভব কম দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশেনাল ডেভেলাপমেন্ট (USAID) এর অধীনে ইউএস ন্যাশনাল রুরাল ইলেকট্রিক কোঅপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশান (USNRECA) ভারতের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়।[৮৫]

ভারতে ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী ৩ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা - ১০০ কিলোওয়াট ,২ মেগাওয়াট ও ১৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ১৯৯৭-৯৮ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ৮টি সক্রিয় ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭.৯৮ মেগাওয়াট। ৯.২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এরূপ আরও ৭টি ক্ষুদ্র- অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চালু ছিল।[৮৬] সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ০.৯% কিন্তু ঠিক তার পরের বছর, অর্থাৎ ২০০১ সালের এপ্রিল থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস অবধি বিদ্যুতের ঘাটতি হয়েছিল ০.৫%।[৮৭] ২০০৩ সালের ৩১শে মার্চ অবধি সব ধরণের উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৪৭৮৪.৩৮ মেগাওয়াট[৮৮] এবং এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ৩৮২টি শহর ও ৩৭৯১০টি গ্রামের

মধ্যে ৩১৩৬৭টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল।[৮৯] তবে সর্বত্র এই পরিস্থিতি সমান ছিল না। ২০০৩ সালের ৮ই জুলাই মেদিনীপুরের ঘাটালের তৎকালীন বিধায়ক রতন পাখিরা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাজের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা কাজ করতে গড়িমসি করছে বলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।[৯০]

গৃহস্থবাড়িতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস (রেফারেন্স লেভেল ফোরকাস্ট)					
শতাংশের হিসাবে					
গ্রাম					
উৎস	**১৯৭৫-৭৬**	**১৯৮২-৮৩**	**১৯৮৭-৮৮**	**১৯৯২-৯৩**	**২০০০-০১**
কেরোসিন	৯১.৪	৮৪	৭৮.৮	৭১.৪	৫৩.৯
বিদ্যুৎ	৪.৪	১২.৯	১৯.৩	২৭.৬	৪৫.২
অন্যান্য	৪.৬	৩.১	১.৯	১	০.৯
সর্বমোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

৪.২.ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনার্জি পলিসি, ১৯৭৯ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে

গৃহস্থবাড়িতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস (রেফারেন্স লেভেল ফোরকাস্ট)					
শহর (শতাংশের হিসাবে)					
উৎস	**১৯৭৫-৭৬**	**১৯৮২-৮৩**	**১৯৮৭-৮৮**	**১৯৯২-৯৩**	**২০০০-০১**
কেরোসিন	৪২.১	৫৩	৬২.৩	৭৩.৮	৮৯.
বিদ্যুৎ	৫৩.৬	৪৫.২	৩৬.৯	২৫.৫	১০.৪
অন্যান্য	৪.৩	১.৮	০.৮	০.৭	০.৬
সর্বমোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

৪.৩ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনার্জি পলিসি, ১৯৭৯ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে

উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট যে ওয়ার্কিং গ্রুপের পূর্বাভাস অনুযায়ী একবিংশ শতকের গোড়ায় ভারতের প্রায় ৪৫% গ্রামে শক্তির উৎস হিসাবে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ একথা বললে ভুল হবে না যে ২০০১ সাল অবধি ভারতের ৪৫% গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে। যদিও গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে ১৯৯০-৯১ সালে ১৯৯০টি, ৯১-৯২ সালে ১৩২০টি, ৯২-৯৩ সালে ১১৬৯টি, ৯৩-৯৪ সালে ১৬২৩টি, ৯৪-৯৫ সালে

২২৮৬টি, ৯৫-৯৬ সালে ১২২৪টি, ৯৬-৯৭ সালে ১২৯০টি, ৯৭-৯৮ সালে ১২৬১টি, ৯৮-৯৯ সালে ১৪৬৮টি, ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৩৭৯টি, ২০০০-০১ সালে ১৩০১টি, ২০০১-০২ সালে ৯৭৯টি এবং ২০০২-০৩ সালে ১০৬০টি গ্রামীণ প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং এই প্রকল্পের অধীনে ৪১,২৩৮টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৬৯ থেকে ২০০৩ সাল অবধি গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে সর্বমোট ৩,০৪,৯৪২টি গ্রামের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছিল।[৯১] এতৎসত্ত্বেও ২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতের ৫৭.৯১ কোটি মানুষের কাছে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিল না, যা সমগ্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫.৪৪%।[৯২] বলাবাহুল্য এই জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষ। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজে গতি আনতে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০'র দশক থেকে বেশ কিছু বৃহৎ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে এই সকল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির উন্নয়ন। কেন্দ্রীয় সরকার, ২০০৩ সাল পর্যন্ত মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম, কুটির জ্যোতি প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা, অ্যাক্সিলারেটেড রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান প্রোগ্রাম, রুরাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই টেকনোলজি মিশন নামক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৯৩] মিনিমাম নীডস প্রোগ্রামের অন্তর্বর্তী গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে ভারতের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চল ও উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে নূন্যতম বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। বিদ্যুৎ মন্ত্রক ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগম এই দুই সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থমন্ত্রকের নীতি অনুসরণ করে দেশের উপজাতীয় অঞ্চলে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য ৫০-৫০ অনুপাতে স্বল্প সুদে ঋণদানের পন্থা গ্রহণ করেছিল। বিদ্যুৎ মন্ত্রক, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী এই অনুদান-ঋণ দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।[৯৪] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গৃহীত মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে সকল রাজ্যে গ্রামীণ

বিদ্যুতায়নের হার ৬৫%-র নীচে ছিল সেই সকল রাজ্যকে ১০০% ঋণ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৮-৮৯ সালে শুরু হওয়া কুটীর জ্যোতি প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা সমস্ত পরিবারকে অন্তত একটি ৬০ওয়াটের আলোর সংযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহযোগিতা সরকার যোগান দিয়েছিল। ২০০০-০১ সালে গৃহীত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্যোদয় যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য ১০% অনুদান ও ৯০% ঋণ প্রদানে উদ্যোগী হয়েছিল। ২০০২ সালে চালু হওয়া অ্যাক্সিলারেটেড রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের জন্য রাজ্যগুলিকে দেওয়া ঋণের সুদের উপর ৪% ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছিল। ঐ একই বছরে চালু হওয়া রুরাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই টেকনোলজি মিশনের মাধ্যমে ২০১২-র মধ্যে ভারতের সকল গ্রামীণ অঞ্চল ও গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।[৯৫]

স্বাধীনোত্তর ভারতের গাণিতিক, প্রাকৃতিক ও আর্থিক পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনই ছিল একমাত্র সংস্থা। বহুক্ষেত্রেই পরিকল্পনা কমিশন দেশের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সীমানাকে এড়িয়ে, শুধুমাত্র আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত সম্পদের উপর ভিত্তি করে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে প্রকল্প রচনা করেছিল। বিদ্যুৎশক্তি এইরূপ এক ক্ষেত্র যা বিভিন্ন বিষয়ের কারণে আন্তঃরাজ্য, রাজ্য-কেন্দ্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের অনুদান বা ঋণের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্বটি নিত্য-নৈমিত্যিক ঘটনায় পরিণত হয়। রাজ্যসরকার কর্তৃক গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বহু প্রকল্পই কেন্দ্রীয় সরকারের লাল ফিতের ফাঁসে পড়ে যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছিল।[৯৬] শিক্ষা যেমন মানুষের মানসিক বিকাশের প্রাথমিক উপাদান, তেমনই শিল্পের বিকাশের প্রাথমিক উপাদান হল বিদ্যুৎ। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মানবশ্রমের উপযুক্ত বিকল্প বৈদ্যুতিক শক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। একইভাবে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তারের মধ্যে দিয়েই গ্রাম-শহরের

মধ্যেকার অর্থনৈতিক পার্থক্য মেটানো সম্ভব ছিল। বিদ্যুৎ যেহেতু খুব সহজেই পরিবহণযোগ্য ও ব্যবহার করা তুলানামূলক সহজ তাই তা কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই পেশীশক্তির উপযুক্ত বিকল্প ছিল। কৃষিক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন পাম্পের ও নলকূপের ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে জোয়ার এনেছিল। পুনর্গঠন কমিটি কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের প্রসারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছিল।[৯৭] বিদ্যুৎ শক্তি শহর-শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। গ্রামীণ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি এক অত্যন্ত জরুরি উপাদান ছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিপুল খরচ ও উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক গঠনতন্ত্রের শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পোত্তর অর্থনীতিতে যে বিবর্তন, তা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য অনিবার্যভাবে অনুকরণীয় এক বিষয় ছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলির উত্তরণ তখনই সম্ভব যখন সুদূরপ্রসারী পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রান্তিক, গ্রামীণ ও অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন সাধিত হবে। একাধারে এই উন্নয়নের সুত্রপাত ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্য বিদ্যুতায়ন একান্ত প্রয়োজন।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমগ্র দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অন্যতম অনুঘটক। তাই অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মতই এই পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলিকে অত্যন্ত যুক্তিসহকারে বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই কর্মযজ্ঞ যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য পরিকল্পনা সঠিকভাবে রূপায়ণ না হলে বিদ্যুতায়ন আশু প্রভাব বিস্তারে অপারগ। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হল প্রাথমিকভাবে টাকার যোগান দেওয়া ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ। সময়ের সাথে সাথে

প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, চাহিদার সঠিক যোগান দেওয়ার উপরে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সাফল্য নির্ভর করেছিল।[৯৮]

গ্রাম্য এলাকায় গ্রামীণ উপভোক্তাদের থেকে কম শুল্ক গ্রহণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আর্থিক ক্ষতির অন্যতম মূল কারণ ছিল। এই লোকসান রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে তুলেছিল যা পরবর্তী গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পগুলির ভবিষ্যৎকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কেন্দ্রীয় সরকার ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের আর্থিক সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই 'আর্থিক সাহায্য' প্রকল্পের গুরুত্বের থেকে কেন্দ্র-রাজ্য রাজনৈতিক সমীকরণের উপর বেশী নির্ভর করত। এক্ষেত্রে গ্রামগুলির প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেল কিনা তার মূল্যায়ন হয়নি। আবার রাজ্যগুলিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এর উপর বিদ্যুতায়নের দায়িত্ব আরোপ করা হয়ে ছিল। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সূচনা হয় এবং গ্রাম্য বিদ্যুতায়ন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। গ্রাম্য বিদ্যুতায়ন মূলত কেন্দ্রের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয়েছিল। যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে আসেন তারা রাজ্য সরকারের অধীন কাজ করলেও কেন্দ্রের পরিচালনার কাজ করতেন।[৯৯] গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সেইসকল অঞ্চল সুবিধালাভ করে যেসকল অঞ্চলের মানুষ মূলত কৃষিকাজ নির্ভরশীল এবং শহুরে অঞ্চলের মানুষের থেকে মাথাপিছু রোজগার কম। যদিও একথা সত্য যে বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি অন্যান্য বহু আর্থ-সামাজিক বিষয়ই এই সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও গ্রামীণ উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা সেই রাজ্য বা দেশের সামগ্রিক বিদ্যুতব্যবস্থা এবং বৃহৎ অর্থনীতির অঙ্গ। যেসকল গ্রামীণ অঞ্চল

ইতিমধ্যেই একটি নির্দিষ্টমাত্রায় উন্নীত হয়েছিল সেইসকল অঞ্চলে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়েছিল।[১০০] গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা লক্ষ্যভিত্তিক না হয়ে চাহিদাভিত্তিক হলে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ছিল। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের, গ্রামীণ প্রান্তিক নিম্নআয়ের মানুষদের উপর, উন্নততর প্রযুক্তির খরচের বোঝা চাপানোর পরিবর্তে, বিদ্যুতশক্তির সুষম বণ্টন ও সরবরাহের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই এইসকল পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। গ্রামাঞ্চলে 'বিদ্যুতের গ্রাহক' গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা তথা গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমবায় সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় অংশীদার। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে এই স্বয়ংক্রিয় সমবায় সমিতি ব্যবস্থা অনেকাংশে কার্যকরী যা গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিগমের অগ্রণী প্রকল্পের সফলতার মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে। আর্জেন্টিনা, শ্রীলঙ্কা, আমেরিকা, ফিলিপিন্স, ব্রাজিল, কলোম্বিয়া, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল। ২০০৩ সালের দি ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টে স্বীকৃত রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ যোজনা সংবিধিবদ্ধ ভাবে আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করেছিল।[১০১]

এযাবৎ হওয়া প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ফলে অর্থনীতির কিছু অংশের পুনর্নির্মাণ করতে পারলেও বিদ্যুতায়নই একমাত্র উপাদান যা অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিকেই পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিদ্যুতায়ন দীর্ঘমেয়াদী কালে সমাজের পক্ষে ধনাত্বক এক উপাদান হলেও সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর এর প্রভাব বিভিন্ন হতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনকারী সংস্থাগুলি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের মত অলাভজনক প্রকৃতির প্রকল্পকে গুরুত্ব না দেওয়ায়, রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীন বিদ্যুতায়ন প্রতিটি সরকারের কাছেই প্রশ্নাতীতভাবে কাম্য ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রথমের দিকে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন নিয়ে যে নীতি নির্ধারণ করেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়, কারণ নীতি নির্ধারণের সময় গ্রামীণ এলাকাগুলির কোন শ্রেণিবিভাগ লক্ষ্য করা যায়নি। উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ আগে পৌঁছানো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত হলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে ব্যবসা বৃদ্ধির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে বিদ্যুতের মত অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। তাই অনুন্নত প্রান্তিক গ্রামগুলিও এইক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। আবার গ্রামের কোন অংশে বা কোন বাড়িতে আগে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন হবে সেই নিয়েও কোন নির্দিষ্ট রূপরেখার কথা জানা যায়নি। একথা সত্যি যে শুধুমাত্র বিদ্যুতায়ন কখনোই গ্রাম্যজীবনকে পরিবর্তন করতে পারে না, বা জীবিকার টানে গ্রাম থেকে শহরে পরিযান বন্ধ করতে পারে না। এমনকি বিদ্যুতায়ন ক্ষুদ্র পারিবারিক শিল্পগুলিকে বন্ধ হওয়া থেকেও প্রতিরোধ করতে পারেনি; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য বিদ্যুতের ব্যবহারের ফলে মানুষের গৃহস্থজীবনে পরিবর্তন এসেছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ফলে কৃষিকাজের পদ্ধতিতে বদল ঘটেছিল এবং পুরনো সামাজিক-আর্থিক বিন্যাস পুরোপুরি পরিবর্তিত না হলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এক নতুন রূপ লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। গ্রামে বিদ্যুৎ ভৌগলিক ভাবে পৌঁছে গেলেও বাস্তবে কতগুলো বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌছাল এবং সেইসব বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং হলেও তাদের ব্যবহারের ধরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে তবেই গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সফল হবে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতের মোট তৃতীয় বিশ্বের দেশের পক্ষে এই ক্রমান্বয় পর্যবেক্ষণ গুরুতর সমস্যার একটি বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শহরে বসবাসকারী মানুষের কাছে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের তুলনায় বিদ্যুৎ সহজলভ্য ছিল। আবার একথাও সত্য যে গ্রামীণ দুর্বল অর্থনীতির মধ্যে অবস্থিত প্রান্তিক

মানুষদের পক্ষে বিদ্যুতের ব্যবহারের মত এক অতি আধুনিক পণ্যের খরচ যোগানো ছিল এক অন্যধরনের চ্যালেঞ্জ। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন সরকারি জনমুখী প্রকল্প যার মাধ্যমে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের কাছে বিনা বা স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হবে। ভারতের ক্ষেত্রে গ্রামীন বিদ্যুতায়ন অনেক সম্ভাবনাময় হলেও দীর্ঘদিন এই বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাপক প্রভাব থেকে গ্রাম্য অর্থনীতি ব্রাত্য থেকে গিয়েছিল। বিদ্যুতায়ন, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের পিছনে অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল। ভারতের মতো দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক, তাই কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও একান্তভাবে কাম্য ছিল।

সূত্রনির্দেশ

১. Nirmala Banerjee, Demand for electricity (Calcutta: Centre for studies in Social Science, K P Bagchi Company, 1979), P-4.

২. Reconstruction Committee of Council, Government of India, “First Report on the Progress of Reconstruction Planning,” New Delhi, 1944, Pp-26-27, Retrieved from https://indianculture.gov.in/first-report-progress-reconstruction-planning-1944 on 21/05/2021.

৩. R. P. Bhagat, Rural Electrification and Development (New Delhi: Deep & Deep Publications, 1993), Pp. 4-5.

৪. Department of Agriculture, U S, “The Story of Cooperative Rural Electrification: Rural Lines,” Rural Electrification Administration, Miscellaneous Publication No. 811, Washington D.C., 1966, P.38. Retrieved from https://archive.org/details/rurallinesusasto811unit_1/mode/2up on 11/02/2021

৫. Office Of The Registrar General, “Electricity Supply In India And An Analysis Of Power Development During The Two Five Year Plan Periods (I95I-56 & 1956-6I),” Monograph No 6, Census Of India, Ministry Of Home Affairs, New Delhi, 1961, P-4.

৬. Planning Commission, Government of India, ‘‘Report on evaluation of The Rural Electrification Programme,” Programme Evaluation Organisation, New Delhi, 1965, Nehru Memorial Museum and Library, Pp.24-25.

৭. “Report on evaluation of The Rural Electrification Programme,’’Pp.36-44.

৮. “Report on evaluation of The Rural Electrification Programme,’’ Pp. 46-49.

৯. ‘‘Report on evaluation of The Rural Electrification Programme,’’ Pp.55-57.

১০. ‘‘Report on evaluation of The Rural Electrification Programme,’’ Pp.62-63.

১১. Leroy P. Jones and Edward S. Mason, “Role of economic factors in determining the size and structure of the public-enterprise sector in less-developed countries with mixed economies,” In Public enterprise in less-developed countries, edited by. Leroy P Jones (Cambridge University Press, 1982), Pp.37-38.

১২. Ministry of Irrigation and Power, Government of India, “Report of Power Economy Committee,” New Delhi (March 1971): P-66.

১৩. “পশ্চিমবঙ্গ পল্লী বৈদ্যুতিকরণ; নয়া প্রকল্পে ৩১৪ লক্ষ টাকা ঋণ লাভ,” ধনধান্যে, দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তদশ সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৭১,নিউ দিল্লী, পৃ-৯।

১৪. G.D. Kamalpur & R.Y. Udaykumar, People’s participation in rural electrification- A Successful Case, IEEE, 2008, Pp.946-49.

১৫. Ministry of Irrigation and Power, “Report of Power Economy Committee,” (March,1971), P-69, Retrieved from http://indianculture.gov.in/ report-power-economy-committee on 23/07/2021.

১৬. Ministry of Irrigation and Power, Government of India, “Report of Power Economy Committee,” New Delhi (March 1971): P-66.

১৭. Directorate of Census, District Census Handbook Nadia, Part X-C, Series 22, (Census, 1971), Government Printing, West Bengal, P-31.

১৮. Directorate of Census, District Census Handbook Howrah, Part X-C, Series 22, (Census, 1971), Government Printing, West Bengal, P-10.

১৯. Directorate of Census Operations, District Census Handbook Murshidabad, Alphabetical List Of Villages, Town And Village Directory And Primary Census Abstract, Part X-A & B, Series 22 (Census, 1971), Government Printing, West Bengal, 1977, Pp.52-173.

২০. তদেব।

২১. Bhagat, Rural Electrification and Development, P-5.

২২. Ministry of Irrigation and Power, Government of India, “Report of Power Economy Committee,” New Delhi (March 1971):Pp.1-2.

২৩. Planning Commission, “Estimates Committee (1974-75) (FIFTH LOK SABHA REPORT), Sixty-Ninth Report,” Development of Backward Areas, (New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1974), P-10.

২৪. Ministry of Irrigation and power, Government of India, “Report of Study Group-IV, Power Economy Committee,” New Delhi (1969): Pp-9-10.

Retrieved from http://indianculture.gov.in/report-study-group-iv on 21/05/21

২৫. Asok Mitra Papers, Fourth Five Year Plan (1969-1974),West Bengal, Sub File-194, 1970, Nehru Memorial Museum and Library, P-14.

২৬. Asok Mitra Papers, Fourth Five Year Plan 1969-1974- West Bengal, Pp.17-18.

২৭. Sarmila Bose, Money, Energy & Welfare, The State and the household in India's Rural Electrification Policy, (Delhi: Oxford University Press, 1993), P-65.

২৮. তদেব, P-68.

২৯. Bhagat, Rural Electrification and Development, P-315.

৩০. Ministry of Irrigation and Power, Estimates Committee (1973-74), E.C No. 772, Fifth Lok Sabha, Fifty-Sixth Report, (New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1974), P-81.

৩১. "গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ," ধনধান্যে, নিউ দিল্লী, তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃ-৬।

৩২. Ashok Mitra Papers, "Annual Plan 1972-73- West Bengal, Financial Resources for the Fourth Plan," Subject File No-717, (1972-73), Nehru Memorial Museum and Library, P-35.

৩৩. "পশ্চিমবঙ্গ পল্লী বৈদ্যুতিকরণ; নয়া প্রকল্পে ৩১৪ লক্ষ টাকা ঋণ লাভ," পৃ-৯।

৩৪. উন্নয়ন বার্তা, "সুন্দরবনের জন্য বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনা," ধনধান্যে, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১, নিউ দিল্লী, পৃ-২১।

৩৫. সুভাষ বসু, "সংবাদ পরিক্রমা-মালদহ," ধনধান্যে, তৃতীয় বর্ষ- ১,২ , ২৭শে জুন ১৯৭১, পৃ-১৯।

৩৬. উন্নয়ন বার্তা, সুন্দরবনের জন্য বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনা, পৃ-৯।

৩৭. Union Deputy Ministry of Energy, "Report of the Committee on Rural Electrification in Eastern States," Government of India, (March, 1975): New Delhi, Pp.33-35, Retrieved from http://indianculture.gov.in/report-committee-rural-electrification-eastern-states on 20/07/2021.

৩৮. "Report of the Committee on Rural Electrification in Eastern States," ibid, Pp.61-66.

৩৯. Ministry of Energy, Rural Electrification Corporation Limited, Department of Power, "Committee on Public Undertakings, 1974-75, Fifth Lok Sabha, Sixty Second Report" (New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1975), Pp.4-10.

৪০. বাণী গুপ্ত, "পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দূর করা কি সম্ভব?," ধনধান্যে, তৃতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৭১, নিউ দিল্লী, পৃ.৭ ও ১৮।

৪১. স্টাফ রিপোর্টার, "গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কাজ অনেক এগিয়েছে," যুগান্তর, ৩০শে জুন ১৯৭৩, পৃ-৭।

৪২. Ministry of Energy, Committee on Public Undertakings, 1974-75, Pp.37-38.

৪৩. Ministry of Agriculture, "Estimates Committee (1973-74), E.C No.-764, Fifth Lok Sabha, Forty-Ninth Report" (New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1973), P-23.

৪৪. স্টাফ রিপোর্টার, "গ্রামে বিদ্যুৎ প্রেরণ বন্ধ হতে চলেছে," যুগান্তর, ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-৩।

৪৫. বিশেষ সংবাদদাতা, "রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট ত্রাণে কেন্দ্রের সাহায্যের আশ্বাস," যুগান্তর, ৩০ শে এপ্রিল -১৯৭৪, পৃ-১।

৪৬. Ministry of Energy, Committee on Public Undertakings, 1974-75, Pp.53-70.

৪৭. "বিদ্যুৎ," ধনধান্যে, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা-১৭ ও ১৮, ১ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, নিউ দিল্লী, পৃ-১৫।

৪৮. Ministry of Energy, Committee on Public Undertakings, 1974-75, P-100.

৪৯. India Power Survey Committee, "Tenth Annual Electric Power Survey of India," Central Electricity Authority, Controller of Publications, New Delhi, 1977, Nehru Memorial Museum and Library, P-56.

৫০. India Power Survey Committee, 'Tenth Annual Electric Power Survey of India', P-43.

৫১. "কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৭৪-৭৫," ধনধান্যে, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা- ২১ ও ২২, ১ ও ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ-৫।

৫২. বিমান ব্যানার্জী, "পল্লী বিদ্যুতায়ন অনেক পিছিয়ে," ধনধান্যে, ষষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা-১৯/১, ১লা এপ্রিল ১৯৭৫, কলকাতা, পৃ-১১।

৫৩. শ্রী শঙ্কর ঘোষ (অর্থমন্ত্রী), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (১লা মার্চ, ১৯৭৬): পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, পৃ-১১।

৫৪. শ্রী গোপালদাস নাগ (অর্থমন্ত্রী), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, (২৫এ মার্চ, ১৯৭৭): পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, পৃ-২।

৫৫. সমাচার, "পল্লী বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন করার নির্দেশ," যুগান্তর, ২০শে জুলাই ১৯৭৬, পৃ-৫।

৫৬. স্টাফ রিপোর্টার, “গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্ন,” যুগান্তর, ২৯ শে জুলাই ১৯৭৬, পৃ-৫।

৫৭. Ministry of Energy, Department of Power, Government of India, “Report of the committee on Power,” New Delhi, (September, 1980): P-89, Retrieved from http://indianculture.gov.in/report-committee-power on 31/08/2020.

৫৮. তদেব, P-91.

৫৯. “পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গ্রামীন বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি,” ধনধান্যে, ত্রয়োদশ বর্ষ; ষোড়শ সংখ্যা, ১৬-২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ-২২।

৬০. “গ্রামের বিদ্যুতের জন্য ১১৬ কোটি টাকা,” ধনধান্যে, ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১ -৩১ শে জুলাই ১৯৮১, পৃ-২৬।

৬১. Planning Commission, Government of India, National Committee on The Development Of Backward Areas, “Report on development of Backward Hill Areas,” New Delhi, (March, 1981): P-55, Retrieved from http://indianculture.gov.in/report-development-backward-hill-areas-0 on 20/09/21.

৬২. বিশেষ প্রতিনিধি, “ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস,” ধনধান্যে, ত্রয়োদশ বর্ষ ; ষোড়শ সংখ্যা, ১৬-২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃ-১৫।

৬৩. সম্পাদকীয়, “বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে,” ধনধান্যে, ত্রয়োদশ বর্ষ, বিংশ সংখ্যা, ১৬-৩০শে এপ্রিল ১৯৮২, পৃ-১।

৬৪. সম্পাদকীয়, “গ্রামে বিদ্যুৎ- লক্ষ্য ও সাফল্য,” ধনধান্যে, চতুর্দশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, ১ - ১৫ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ-১।

৬৫. "গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ জোরদার," ধনধান্যে, চতুর্দশ বর্ষ একবিংশ সংখ্যা, ১ -১৫ই মে ১৯৮৩, পৃ-২০।

৬৬. "গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরন," ধনধান্যে, পঞ্চদশ বর্ষ; একবিংশ সংখ্যা, ১-১৫ই মে ১৯৮৪, পৃ-১।

৬৭. "রবি শস্যের জন্য বিদ্যুৎ," ধনধান্যে, পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১-১৫ই জুলাই ১৯৮৩, পৃ-১৪।

৬৮. "সার্বিক গ্রামীণ বিদ্যুৎ কর্মসূচি," ধনধান্যে, চতুর্দশ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১ - ১৫ ই জানুয়ারি, ১৯৮৩, পৃ-১৪।

৬৯. Department Of Statistics, Government of India, "Report On Source of Drinking Water and Energy Used for Cooking and Lighting," Thirty Eight Round, Number-336 (January-December, 1983): National Sample Survey Organisation, August 1988, New Delhi, P-11-15 retrieved from https://www.mospi.gov.in/web/mospi/reports-publications on 22/11/2021.

৭০. "পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ চিত্র," ধনধান্যে, ষোড়শ বর্ষ ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ সংখ্যা, ১-৩০শে জুন ১৯৮৫, পৃ-৩২।

৭১. "পশ্চিমবঙ্গের জন্য ফারাক্কা বিদ্যুৎ," ধনধান্যে, সপ্তদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, ১৬-৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ-১৯।

৭২. "গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প," ধনধান্যে, ষোড়শ বর্ষ; পঞ্চদশ ও ষোড়শ সংখ্যা, ১ - ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ-২৭।

৭৩. সম্পাদকীয়, "বিদ্যুৎ চিত্র," ধনধান্যে, উনবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৬-৩১শে জুলাই ১৯৮৭, পৃ-১।

৭৪. M. R. Bhagavan, "India's Energy Policy into the late 1980's," Economic and Political Weekly, VOL. XXI No. 44 & 45, (1-8th November, 19860): Pp.1951-53.

৭৫. Bose, Money, Energy & Welfare, Pp.66-68.

৭৬. Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly, 14th-21st September 1984, Vol.-82, Official Report, Eighty Second Session, West Bengal Secretariat Library, P-256.

৭৭. Lalith Gunaratne, "Rural Energy Services Best Practices," Prepared for United States Agency for International Development Under South Asia Regional Initiative for Energy, NEXANT SARI/Energy, Revised (May 2002): P. 7-4, Retrieved from https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACP543.pdf on 18/08/2021.

৭৮. Fredrick Karlson, "Rural Energy Services Legal And Regulatory Review," Prepared for United States Agency for International Development Under South Asia Regional Initiative for Energy, NEXANT SARI/Energy, (February, 2002): Pp. 5-12 - 5-16, retrieved from https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacu655.pdf on 18/08/2021.

৭৯. Ministry of Power, Government of India, Eighteenth Report, Standing Committee on Energy (1996-97), "Rural Electrification-Problems, Realities and Achievements', Eleventh Lok Sabha, (Lok Sabha Secretariat: New Delhi), Nehru Memorial Museum and Library, Pp-7-9.

৮০. তদেব, পৃ-১৪-১৮।

৮১. তদেব, পৃ-২১-২৪।

৮২. তদেব, পৃ-৩৫-৩৭।

৮৩. তদেব, পৃ-৫২-৫৬।

৮৪. Karlson, “Rural Energy Services Legal And Regulatory Review,” Pp.5-10- 5-11.

৮৫. তদেব।

৮৬. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, “Compendium of Environment Statistics, India 2003,” Central Statistical Organisation, New Delhi (May, 2005): P-124, retrieved on 22/11/2021 from https://www.mospi.gov.in/web/mospi/reports-publications

৮৭. তদেব, পৃ-১১৫।

৮৮. তদেব, পৃ-১১৩।

৮৯. তদেব, পৃ-১১৭।

৯০. Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly, March to July Session, 2003, Vol. 122, No. III, Official Report, Hundred Twenty-Second Session, West Bengal Secretariat Library, P-352.

৯১. Government of India, “Annual Report 2004-2005; Rural Electrification Limited,” New Delhi, (2005): Pp. 6-7, retrieved on 21/09/2021 from https://www.recindia.nic.in/uploads/files/ar2004-05.pdf.

৯২. Subhes C. Bhattacharyya, “Energy access problem of the poor in India: Is rural electrification a remedy?,” Energy Policy 34 (2006): Pp.3388.

৯৩. Dr. Pradeepta Kumar Samanta, “A Study of Rural Electrification Infrastructure in India,” IOSR Journal of Business and Management, Volume 17 Issue 2 Ver. IV, (Feb 2015): Pp. 57-58.

৯৪. Ministry of Power, Government of India, Ninth Report, Standing Committee on Energy (1998-99), “Rural Electrification-Problems, Realities and Achievements’, Twelfth Lok Sabha, (Lok Sabha Secretariat: New Delhi), Nehru Memorial Museum and Library, Pp.8-9.

৯৫. Samanta, “A Study of Rural Electrification Infrastructure in India”.

৯৬. Asok Mitra Papers, “Multilevel Planning”- Ashok Mitra Papers, Subject File No-716, 1972-73, Nehru Memorial Museum and Library Pp. 6-7.

৯৭. K.V.Karantha, Planning India’s Electrification, (Madras: K.V.Karantha, 1967) Pp-4-9.

৯৮. Mohan Munasinghe, “Rural Electrification in the Third World,” Power Engineering Journal, (July, 1990): P.201-202.

৯৯. Mohan Munasinghe, Rural Electrification for Development, Policy Analysis and Application (London & New York: Routledge, 1987), Pp. 2-5.

১০০. তদেব।

১০১. G.D. Kamalpur & R.Y. Udaykumar, ‘People’s participation in rural electrification- A Successful Case’, First International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology, IEEE, 2008, P-949.

সমাজ ও পরিবেশঃ প্রসঙ্গ বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের প্রবর্তন মানুষের জীবনকে মৌলিকভাবে রূপান্তরিত করেছিল। প্রথমদিকে, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বৈদ্যুতিক আলো উভয়ই আধুনিকতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হলেও শীঘ্রই বিশ্বের সর্বত্র একটি মৌলিক চাহিদা হয়ে উঠেছিল। ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি কলকাতায় যখন প্রথম ব্যবসা শুরু করে, তখন তারা বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্যুতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শঙ্কিত ছিল কিন্তু অচিরেই তাদের সমস্ত ভয় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছিল এবং বিদ্যুৎ সাধারণ মানুষের কাছে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যুৎ শহরের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই একটি ভয়ের বস্তু ছিল। শহরের নিম্নবর্গীয় মানুষের কাছে বিদ্যুৎ ছিল 'জিন'-র সমতুল্য এবং নতুন সংযোগ নেওয়ার খরচ ছিল ধর্তব্যের বাইরে। আবার উপরতলার মানুষদের মধ্যে ধারণা ছিল যে নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য তাদের দেওয়ালে একটি গর্ত করতে হবে এবং এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। যার ফলস্বরূপ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কিছু মানুষের বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ ছিল আবার কিছু মানুষ এর থেক দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। তবে মনে রাখতে হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলি কিন্তু গৃহস্থ বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়ার প্রত্যাশায় এদেশে ব্যবসা শুরু করেনি, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পক্ষেত্র এবং কলকারখানাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। শুরুর দিকে তাদের এই পরিকল্পনা বিশেষ ফলপ্রসূ না হওয়ায় ব্যক্তিগত পরিসরে, গৃহস্থালির কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল।[১] তবে একথা অনস্বীকার্য যে মানবসমাজে বিদ্যুতের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার, যেমন- আলোকসজ্জা, কৃষি, যোগাযোগ, চিকিৎসা এবং শিল্প, চরিত্রগতভাবে একে স্বতন্ত্র করে তোলে। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ নিজেই একটি শিল্প। বিশ্বের

অন্যান্য জায়গার মতো কলকাতাতেও বিদ্যুৎ প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল মূলত আলোকিতকরণের উদ্দেশ্যে। উৎপাদন এবং অন্যান্য শিল্প সংস্থাগুলির দ্বারা ক্রমে এর ব্যবহার পরিবর্তিত হতে থাকে। অচিরেই বিদ্যুত মৌলিক শহুরে সমস্যাগুলির জন্য একটি প্রতিষেধক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় যে এই যুগান্তকারী প্রযুক্তি বাঙালী কুক্ষিগত করেছিল কিভাবে? ঐতিহাসিকরা এই নিয়ে যে ভাবেন নি তা নয়, তবে তা কিন্তু বিদ্যুতের 'ব্যবহার' বা সামাজিক প্রভাবের ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

আমরা যে ইতিহাস অধ্যয়ন করে এসেছি তার উৎপত্তি মূলত ইংরেজদের ক্ষমতালিপ্সায়। পলাশি যুদ্ধের আগের ইতিহাসের ধাঁচ ছিল পৌরাণিক।[২] আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দেশভাগ ঐতিহাসিক মহলে যেরূপ চর্চিত, প্রযুক্তির ইতিহাস বা নির্দিষ্টভাবে বললে বিদ্যুতশিল্প বা এর সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমিকদের নিয়ে সেই আলোচনা একেবারেই স্বল্পচর্চিত। একথা বলাই যায় যে বিদ্যুতশিল্পের মত অতি প্রয়োজনীয় শিল্প নিয়ে আলোচনা উচ্চবর্গের বা নিম্নবর্গের কোন আলোচনাতেই স্থান করে উঠতে পারেনি। প্রযুক্তির ইতিহাস, এক সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার ধারা এবং তা অনেকাংশেই প্রযুক্তি কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তার আলোচনা। তবে প্রযুক্তির ব্যাপ্তি আরও গভীরে, তা পাশ্চাত্য থেকে যেমন প্রাচ্যে এসেছিল তেমনই প্রাচ্যের শহুরে কেন্দ্রিকতা থেকে প্রান্তিক গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল। একই সঙ্গে এই প্রযুক্তির অর্থনৈতিক প্রভাবের পাশাপাশি সামাজিক প্রভাবও আছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকদের আগ্রহ বরাবরই কোন জিনিস বা ঘটনার গুরুত্ব সন্ধানে ন্যস্ত ছিল। বহু ছোট কিন্তু প্রভাবশালী বিষয় (যেমন-নানা ক্ষুদ্রশিল্প) এই দৃষ্টিকে বিশেষ আকর্ষণ করেনি কখনই। সেলাইকল, সাইকেল, টাইপরাইটার, চালকল বিশেষ গুরুত্বর সঙ্গে

ঐতিহাসিকমহলে আলোচিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যুৎ আসার ফলে উল্লিখিত শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনই অন্যদিকে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে তা যদি হয় স্বাধীনোত্তর পর্বে তাহলে তা নির্দ্বিধায় অপ্রতুল বলা যায়। তাই ইতিহাস বহুসময়েই হয়ে ওঠে জীবনী বৃত্তান্ত বা রাষ্ট্রনৈতিক পালাবদলের আখ্যান। বিদ্যুতের ব্যবহার, সাধারণ মানুষ ও তার রোজকারের জীবনে এর প্রভাব কিন্তু কখনই ইতিহাস পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারেনি। ইতিহাসের পাতায় স্থান না পেলেও এই সকল বিষয় কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সাহিত্যের পাতায় স্থান করেনিয়েছিল যা পারতপক্ষে যুগ পরিবর্তনের এক অন্যন্য বাস্তব হিসাবে আমাদের সামনে উঠে এসেছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে স্বামীজি আমেরিকা ভ্রমণ কালে সেখানে বিদ্যুতের উপস্থিতি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর ভাই লিখছেন যে "স্বামীজীর এই সময়ে বিদ্যুতের উপর বড় আস্থা ছিল। আমেরিকাতে বৈদ্যুতিক কলকব্জা ও নানা প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি আশ্চার্যান্বিত হইয়াছিলেন। সর্বদাই তিনি বলিতেন, 'America is full of electricity' । তাঁহার এখন ইচ্ছা ছিল যে ভারতীয়গণ আমেরিকায় electricity শিক্ষা করিয়া ভারতে সেই ধারা প্রচলিত করিতে যত্নবান হউক। ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক কাজকর্ম চলিলে দেশের বহু কল্যাণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস।"[৩] স্বামীজি তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীজির বিদ্যুতের মত এক আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ থাকলেও ১৯০২ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখনও তাঁর সাধের বেলুড় মঠে বিদ্যুতের সংযোগ ছিল না। স্বামীজীর বিদ্যুতের প্রতি এই বিস্ময় মিশ্রিত দুর্বলতা বোধহয় আগামীদিনের বাংলার মানুষের প্রতিক্রিয়ার আগাম প্রতিচ্ছবি ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলেবেলার কথা লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন "তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ

দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ। মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্‌বুক।”[৪] পরে যখন গ্যাসের আলো আসে তখন কিছুটা একই ধরণের বিস্ময়তা ফুটে উঠেছিল রাধানাথ মিত্রের লেখায়।

কি বাহার গ্যাসের আলো।

বিজ্ঞান প্রভাবে বটে ভাল কীর্তি প্রকাশ হ'ল।

রাজধানী কলকাতা শহর এত দিনে জাঁকাইল।

পথে ঘাটে আসতে-যেতে, দিবারাতে ভাবনা গেল।

মরি কি কলকারখানা, তেল সলতে কিছু লাগে না,

ধোঁয়াতে জ্বলছে আলো, বাতির চেয়ে দেখতে ভালো।

সুচিকণ আলোকছটায় পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায়।

দিন-রাত্রির নাই ভেদাভেদ দেখেশুনে প্রাণ জুড়াল।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাকবি রাধানাথ মিত্র ছিলেন এই কবিতার রচয়িতা।[৫] ক্রমে গ্যাসের আলো যখন স্ট্রীট লাইটিং-র মূল উপকরণ হিসাবে নিজেকে বঙ্গসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তখন হুতোম লিখছেন, সন্ধ্যা হলেই পুরসভার মুটে বগলে মই নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটত পথে পথে আলো জ্বালতে।[৬] মই বেয়ে ল্যাম্পপোস্টে উঠে প্রথমে ন্যাকড়া বুলিয়ে পরিষ্কার করত আলোর শেডের কাঁচ। তারপর চাবি ঘুরিয়ে চালু করত গ্যাস। সব শেষে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাতো বাতি। এই স্ট্রীট লাইটিং বা রাস্তার আলো নিরাপত্তার পরিমাপের সূচক ছিল। গ্যাসের আলোর আগমনের পর কবি কলকাতার এইরূপ বর্ণনা

দিলেও তা পূর্ণতা পেয়েছিল বিংশ শতকে বিদ্যুতের আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঔপনিবেশিক বাংলা ও স্বাধীন বাংলায় বিদ্যুতের গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার ছিল একেবারেই ভিন্ন। ঔপনিবেশিক বাংলায় বিদ্যুতের বিস্তার, তার ধরণ ও বিস্ময়তা এবং তা সম্পর্কিত লেখালিখি বেশী ছিল আবার স্বাধীন বাংলায় কিন্তু এই বিস্ময়তা লক্ষ্য করা যায় না, বরং সেখানে অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল বিদ্যুতের অব্যবস্থা বা বৈদ্যুতিক গোলযোগ সংক্রান্ত লেখা। শুরুর দিকে বাংলায় বিদ্যুতের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া মিশ্র প্রকৃতির ছিল, একদিকে এই নতুন প্রযুক্তির প্রতি সাধারণ মানুষের ভয় ছিল আর অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও পথবাতির ক্ষেত্রে ক্রমে বিদ্যুৎ নিজের জায়গা করেনিতে পেরেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও পথবাতির ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার, বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ানোর অন্যতম এক পন্থা ছিল। ঊনবিংশ শতকের একদম শেষ লগ্নে এবং বিংশ শতকের শুরুতে বাংলার বেশ কিছু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে হ্যারিসন রোডে প্রথম বৈদ্যুতিক পথবাতি চালু হয়। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলে (বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) পরীক্ষামূলক ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ১৯ মে রাজভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তার কিছু দিনের মধ্যেই ১৯শে আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট হাতে টানা পাখার বদলে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আবার কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামের পরিবর্তে বিদ্যুতচালিত ট্রামের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে।[৭] ১৯০২ সালের ২৮শে মে তৎকালীন সরকার, ফোর্ট উইলিয়ামে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৫০০০ টাকা বরাদ্দ করেছিল।[৮] শুধুমাত্র তাই নয় সাধারণ মানুষের কাছেও এই আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বাছন্দ্যকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি মাসিক ভাড়ার চুক্তিতে বৈদ্যুতিক পাখা ভাড়া দেওয়া শুরু করেছিল। এই পাখা যে শুধুমাত্র সাধারণ

মানুষকেই স্বস্তি দিয়েছিল তা নয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির 'বেস-লোড'-র চাহিদাপূরণেও সহায়ক হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিংশ শতকের প্রথম দশকে আমেরিকাস্থিত সিংগার সুইং মেশিন কোম্পানি ব্রিটিশদের অবাধ বাণিজ্যনীতির সুবিধা নিয়ে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে বৈদ্যুতিক ফ্যান বিক্রয় করত।[৯] আবার বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিক্রয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষকে আলো ও শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে 'বিদ্যুৎ'-র পরিচয় করানোর জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির 'বিক্রয়িক' বা সেলসম্যান পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। আবার গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য খবরের কাগজে চটকদার বিজ্ঞাপন, ব্লটিং কাগজে বার্তা লিখে বিলি করার মত অভিনব কায়দায় প্রচারের উদাহরণও পাওয়া যায়। তবে এই আধুনিক প্রযুক্তির সবথেকে বড় জয় ছিল **১৯১১** সালে কালীঘাট মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত খবরের কাগজ পপুলার ইলেক্ট্রিসিটি Lights in a Hindu Temple শীর্ষক খবরে লিখেছিল 'This is looked upon as one of the greatest victories modern electrical progress has won in India, for up to a very short time ago, no one believed it possible to obtain permission to use such a modern appliance as the electric light in one of the old temples.'[১০] অতি অল্প সময়েই ঔপনিবেশিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আনিত বিদ্যুতের মত অতি আধুনিক এক প্রযুক্তির ধর্মীয় ভাবাবেগকে অতিক্রম করে মন্দিরের মত আদ্যোপান্ত এক ধর্মীয় স্থানে জায়গা করে নেওয়া সত্যিই এক বড় জয় ছিল। তবে একথাও সত্যি বাংলায় বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুত্রপাতের কিছু দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত মন্দির কর্তৃপক্ষের দিক থেকে এক প্রভাবশালী এবং অবশ্যই উদারমনস্ক পদক্ষেপ ছিল।

পূর্বে উল্লিখিত বেশ কিছু লেখায় আমরা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিস্ময়ের উল্লেখ পেলেও সেইসময়ে কিছু লেখায় বিদ্যুতের সমালোচনাও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অমৃতলাল বসু তাঁর

রচিত ‘বাবু’ নাটকে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের উপযোগিতার বিষয়কে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সমাজসংস্কারক সজনীকান্তের চেলা দামোদর, বৈজ্ঞানিক অশনিপ্রকাশকে তার বোনের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কথাপ্রসঙ্গে অশনি বাবু বলেন-

“অশনিঃ না না, আমি ভগ্নী টগ্নীকে বিবাহ করবো না; ভগ্নী কেন- আমি মানুষকেই বিবাহ করবো না, ইলেক্ট্রীসিটী দ্বারা যদি কখনও আমার ছেলেপুলে হয় তা হবে, নয়ত আমার নির্ব্বংশ হওয়াই কর্ত্তব্য! তবে আমি সায়েন্সের দ্বারা বৈধব্য যন্ত্রণা ঘোচাতে পারি।”[১১] একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে লেখক বিদ্যুৎকে রূপক হিসাবে ধরে তার ‘সর্বরোগনিয়ামক’ ভুমিকাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সমাজের কঠিন ব্যাধিগুলোর দূরীকরণের প্রসঙ্গে বিদ্যুতের ভূমিকা নিয়ে ঠাট্টা করে তিনি বলছেন-

“অশনি-..দেখে নেবেন আমি যদি বেঁচে থাকি—আর তা থাকৰ, কেননা আমি রোজ দুবেলা খানিকটা করে ইলেক্ট্রীসিটী খাই,—তাহলে এই ইলেক্ট্রীসিটীর দ্বারাই জাতিভেদ উঠিয়ে দেব, বিধবার বে দেওয়াব, মেয়েদের ঘোড়ায় চড়াব, এই ইণ্ডিয়াতে পার্লামেন্ট বসাব, আরও কতকি করবো।”[১২]

তবে এটাও ঠিক যে উনি কিন্তু বিদ্যুতের অবশ্যম্ভাবী উন্নতিকে এড়িয়ে যাননি। অত্যন্ত সুচারু এবং সচেতন ভাবে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে তিনি বিদ্যুতের ফলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে ঘটে চলা প্রযুক্তিগত বিবর্তনগুলিকে উল্লেখ করেছিলেন।

“অশনি-..আপনাদের যে একটু পারসিভিয়ারেন্স নাই; দিন কতক ধৈর্য্য ধরে থাকুন না, ইলেক্ট্রীসিটীর ক্ষমতাটা দিন দিন কত বাড়ছে দেখছেন ত; টেলিফোঁ হচ্ছে, ফনোগ্রাফ হচ্ছে, ইলেক্ট্রীসিটীতে জাহাজ চলছে, ট্রাম চলছে-”[১৩]

অমৃতলাল বসুর এই নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর এই মন্তব্যগুলি প্রমাণ করে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে অতিরিক্ত সংশয়ী ও নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিল। বাংলায় বিদ্যুৎ তথা বিদ্যুতশিল্পের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এটি স্বাভাবিক কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে ঔপনিবেশিক বাংলায় বিদ্যুৎ একদিকে যেমন বিস্ময়তা, মুগ্ধতা এনেছিল তেমনই বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তার বাড়বাড়ন্ত সাধারণ মানুষের জীবনে আশঙ্কা আবার একাধারে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভাল হোক বা মন্দ ঔপনিবেশিক বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনকে 'বিদ্যুৎ' তার নিজগুণে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙালীর 'বিদ্যুৎ'-প্রীতি ভৌগোলিক সীমানাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক লিমিটেডের কথা বলা যেতে পারে। আসামে অবস্থিত হলেও এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোক্তারা বেশিরভাগই বাঙালি ছিলেন। ১৯০৫ সালে যখন সরকারি মহলে প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন এটি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ ছিল। বঙ্গ সরকারের তৎকালীন বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা জে ডব্লিউ মেয়ারস ১৯০৮ সালে বিডন জলপ্রপাত এবং এর সংলগ্ন অংশকে একটি প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, প্রস্তাবটি আলোর মুখ দেখেনি। অনেক বছর পরে, স্থানীয় উদ্যোক্তা রমানাথ রায় পরিকল্পনাটি পুনরুজ্জীবিত করেন এবং শিলং হাইড্রো-ইলেকট্রিক লিমিটেড নামে একটি যৌথ-স্টক কোম্পানি গঠন করেন। পরবর্তীকালে বিলেত ফেরত ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছিলন। তার ছোট ভাই সুবোধ চন্দ্র রায় এবং সাধন চন্দ্র রায়ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ক্ষিতিচন্দ্র সান্যালের ভূমিকাও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিল।[১৪] কাজটি ছিল উচ্চ মানের হাইড্রোলিক এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদাহরণ যা সম্পূর্ণভাবে বাঙালি উদ্যোক্তা এবং

প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও রমানাথ বাবু এর পূর্বেই ১৯১৫ সালে নিজের ময়দা কল চালানোর জন্য ছোট্ট টারবাইন বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছিলেন।[১৫]

বিদ্যুতের বিভিন্ন উপযোগিতা তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল, যার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রগঠন ও স্বনির্ভরতার প্রশ্নে বিদ্যুৎ অন্যতম মূল উপাদান হয়ে উঠেছিল। সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়নে শিল্পায়নের কথা বলেছিলেন। একথা সহজেই অনুমেয় যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া একাজ কখনই সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মহানিস্ক্রমনের সময়ে তার ভাগ্নি ইলা বসুকে সে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরও ব্রিটিশ পুলিশ এবং গুপ্তচরদের ধন্ধে রাখার জন্যও তার ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তখন ঐ বাড়িতে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহিত হত।[১৬] শুধুমাত্র যে রাষ্ট্রগঠনের প্রশ্নের জন্যই যে বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় ছিল তা কিন্তু নয়, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সংজ্ঞাতেও বিদ্যুৎ এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অন্যতম প্রাথমিক উপাদান ছিল স্ট্রীট লাইট বা পথবাতি। রাস্তার আলো সারা বিশ্বের পৌরসভাগুলির অন্যতম অপরিহার্য কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। একইভাবে এটি ছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেরও অন্যতম বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি নাগরিক নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত ছিল পথবাতি-র সঙ্গে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পরিষদ ই.এইচ.এডনেই কলকাতার রাস্তার অপর্যাপ্ত আলোর বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এই অপর্যাপ্ত আলোর সুযোগ নিয়ে চুরি, গুণ্ডামি ও হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকায় খুনের ঘটনাও ঘটেছে বলে তিনি জানান।[১৭] ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার ২৭টি থানা মিলিয়ে প্রায় ১৮১৮টি অপরাধের মামলা দায়ের হয়েছিল যা বিগতবছরের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশী ছিল।[১৮] রাস্তা আলোকিতকরণের জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক

বাতি ও বাতির চিমনি চুরি যাওয়ার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন যে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এই চুরির বিষয়ে জানানো হয়েছিল। হাইড রোড ও সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয়ে গিয়েছিল।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনোত্তর পর্বে কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকার ফলে চুরির পাশাপাশি বিদ্যুৎ চুরি বা হুকিং-র কথাও আমরা জানতে পারি। তবে 'বিদ্যুৎ' চুরি করাকে কি আদৌ 'চুরি' বলা যায় কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, কোনো 'চুরি'-কে কোন ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী এমন এক পণ্য যা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমাজের সকল স্তরের কাছে সুলভে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্র যখন তা সুনিশ্চিত করতে পারে না মূলত তখনই সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষেরা এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। বিদ্যুতের মত অতিঅত্যাবশ্যকীয় এক পণ্য যা শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য অবধি, সমাজের প্রতিটি ছোট থেকে বড়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেখানে রাষ্ট্র যদি সকলের কাছে এই পণ্য পৌঁছে দিতে না পারে তাহলে সাধারণ নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষের হাতে বিকল্প খুবই কম পড়ে থাকে। তবে রাষ্ট্র যদি সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারত তবে হয়ত এই সমস্যা দেখা দিত না।

পথবাতির নিজস্ব এক উপলব্ধি ছিল, সে সদা বহমান ইতিহাসের সাক্ষী। ষাটের দশকের অশান্ত পরিবেশের ভুক্তভুগি ছিল এই পথবাতি। তপোবিজয় ঘোষের 'এখন প্রেম' গল্পের অন্যতম মুখ্য চরিত্র সীতেশ যখন কৃষ্ণার বাড়িতে গিয়েছিল সেই সময়ে ঐ পাড়ায় ব্যাপক বোমাবাজি হয় যার ফলে রাস্তার বাতি গুলো সহসা নিভে গিয়েছিল। লেখকের লেখনিতে ধরা পড়ে সেই বর্ণনা, 'একটু পরেই কৃষ্ণা চা নিয়ে আসে। আর ঠিক তখুনি,

সন্ধ্যার মুখে মুখে, অল্প দূর থেকে ঘন ঘন বোমা ফাটার আওয়াজ আসতে থাকে। রাস্তার বাতিগুলো সহসা নিভে যায়।'[২০] শহরের সর্বত্র যে পথবাতি থাকত তাও বলা যায় না। অশোক মিত্র তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে রেস্তোরাঁয়, আলো ঝলমল। কিন্তু দুটো প্রায়-বলাই-চলে ফরাশি জানালা, তাদের ওপাশে ভবানী দত্ত লেন, ঘুটঘুটে অন্ধকার। যতদিন ওভারটুন হলে গেছি, বা ওয়াই এম সি এ-র রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি, চোখ ওদিকে গেলেই ভবানী দত্ত লেনের অন্ধকারে-ঠাসা চেহারা, যেন কোনও প্রগাঢ় রহস্য সেই গলিকে মুড়ে রেখেছে'।[২১]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিদ্যুতের সামাজিক প্রভাব আরও দ্রুত বাড়তে থাকে অর্থনীতি থেকে ক্রীড়া, পরিবহণ থেকে স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ সর্বত্রই ছিল অপূরণীয় এক উপাদান। একদিকে ছিল শিল্প ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বোঝা অন্যদিকে ছিল নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন। এইসবের সঙ্গে ছিল পরিবেশ রক্ষার দায়। স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে, কাঠের অপচয় রোধ করতে শবদাহ করার জন্য এক বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। বহু আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের নিমতলা শ্মশান নিমতলাতেই থেকে গিয়েছিল। ওই সময় থেকেই সরকারের নজর ছিল নিমতলা উন্নয়নের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নও হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে নিমতলায় বৈদ্যুতিক চুল্লি করার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। সময়োচিত পরিবর্তনের তাগিদেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ইলেকট্রিক চুল্লি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন, কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে প্রথম ইলেকট্রিক চুল্লি স্থাপিত হয়েছিল।[২২] শবদেহ সৎকারের এইধরনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রথম ছিল। এই ব্যবস্থায় মৃতদেহ ভস্মীভূত হতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগত।[২৩] তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, আনুষ্ঠানিকভাবে দুইটি চুল্লির উদ্বোধন করেছিলেন। ৭ই আগস্ট এই চুল্লি

চালু হয়েছিল।[২৪] ১৩ই সেপ্টেম্বর, কলকাতার রাজা বসন্ত রায় রোড নিবাসী ঊষাপ্রভা ব্যানার্জীকে প্রথম ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হয়েছিল। এছাড়াও এইসময়ে হিন্দু সৎকার সমিতির আনা বেওয়ারিশ লাশও এই ইলেকট্রিক চুল্লির মাধ্যমে দাহ করা হয়েছিল।[২৫] অপরদিকে নিমতলা শ্মশানের স্থানান্তর নিয়ে সমস্যা দেখা দিলেও তা শেষ অবধি নিমতলাতেই ছিল। কেওড়াতলা শ্মশানের পর নিমতলা শ্মশানেও বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কলকাতা পুরসভার স্থায়ী অর্থ ও সংস্থা কমিটির চেয়ারম্যান গোবিন্দচন্দ্র দে, ১৯৬৭ সালে, নিমতলা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সুদীর্ঘ ৮ বছর পর ১৯৭৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি তৎকালীন পুরমন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন করেছিলেন।[২৬]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পের উন্নতি দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম অনুঘটক ছিল বিদ্যুৎ। সমস্ত ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ হয়ে উঠেছিল এক অপরিহার্য উপাদান। শিল্পের পাশাপাশি পরিবহনের ক্ষেত্রেও বিদ্যুতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গণপরিবহনের মাধ্যম হিসাবে রেলওয়ে ব্যবস্থা অনেকদিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং রেলের বিদ্যুতায়ন এই ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করে তুলেছিল। তবে তারও আগে বৈদ্যুতিক ট্রামের মাধ্যমে গণপরিবহনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। কলকাতায় একদম শুরুর দিক থেকেই মানুষ বহনের জন্য বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য পালকি ও ডুলি ব্যবহার হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় সাহেব মহলে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলনের কথা জানা যায়। ১৮৭৩ সালে কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি যাত্রা শুরু করে। মালপত্র নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হলেও প্রথমদিন থেকেই এই ট্রাম যাত্রী বহন করেছিল। ১৮৯৬ সালে কিলবার্ন এন্ড মেসার্স কোম্পানি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা

ট্রামগাড়ি চালাবার দরখাস্ত করলে ১৮৯৭ সালের ২৮শে জানুয়ারি কর্পোরেশনের এক বিশেষ কমিটির বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা ট্রাম চালানোর বিষয়টি পর্যালোচনা করে একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করেছিল। বেশ কিছুদিন টালবাহানার পর অবশেষে ১৮৯৯ সালে প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে কোম্পানি ওই চুক্তিকে মান্যতা দিয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি লাইনের প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন করে ১৯০২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এর মধ্যে ঘোড়ার বদলে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চালানোর জন্য বাধ্য ছিল। ১৯০২ সালের ২৭শে মার্চ খিদিরপুর লাইনে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলেছিল। এর তিন মাস পরে ১৪ই জুন কালীঘাট লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে এবং এরপর ক্রমে ওয়েলিংটন স্ট্রীট এবং ধর্মতলা লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলাচল করেছিল। ১৯০২ সালের ১৯শে নভেম্বরের মধ্যে কলকাতার সবকটি পুরনো লাইনে ঘোড়ার পরিবর্তে বিদ্যুৎ শক্তি চালিত ট্রাম চলাচল করেছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯০৫ সালের ৭ই জুন শিয়ালদা থেকে হ্যারিসন রোড দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাইকোর্ট পর্যন্ত প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলাচল করেছিল।[২৭] তবে ট্রাম চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, ট্রাম কোম্পানি নিজেই উৎপাদন করত। ট্রাম কোম্পানি নিজ উদ্যোগে নোনাপুকুর অঞ্চলে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে ১৯০৭ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতার ট্রাম কোম্পানিকে হাওড়ায় ট্রামলাইন পাতার অনুমতি দিলে কোম্পানি ডবসন রোড ও গোলাবাড়ি রোডের মোড়ে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। ১৯২৭ সাল অবধি ট্রাম কোম্পানি নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়ে কাজ চালালেও পরবর্তীকালে তারা সি.ই.এস.সি থেকেই বিদ্যুৎ সংগ্রহ করত।[২৮] স্বাধীনোত্তর পর্বে কলকাতার ব্যাপক নগরায়নের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পরিবহণ ব্যবস্থার সংখ্যাবৃদ্ধি বা উন্নতি হয়নি। বিদ্যুতের সহজলভ্যতা নাগরিক জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি স্তরকেই ছুঁয়ে গিয়েছিল, বাদ যায়নি পরিবহণ শিল্পও। ক্রমে নাগরিক স্বার্থ

রক্ষার্থে যুগোপযোগী প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং আত্মপ্রকাশ হয়েছিল পাতালরেল বা মেট্রোর। প্রথম ১৯৪৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম পরিচায়ক মেট্রো রেল স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে অনুমোদিত মেট্রোর প্রস্তাবিত রুটগুলির মধ্যে, দক্ষিণ কলকাতাস্থিত টালিগঞ্জ থেকে উত্তর কলকাতাস্থিত দমদমের মধ্যেকার প্রায় ১৬.৪৫ কিমি লাইনের কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ২৪শে অক্টোবর, এসপ্ল্যানেড থেকে ভবানীপুরের মধ্যস্থ ৫টি স্টেশানে আংশিকভাবে মেট্রো চলাচল করেছিল। ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর টালিগঞ্জ-দমদম রুটটি সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছিল।[২৯] এই রেলব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরু দায়িত্ব ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের উপর।[৩০]

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যুতের আগমনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। নৈশালোকে খেলা হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম মোহনবাগান মাঠে উঁচু টাওয়ার বসানো হয়।[৩১]

চিত্রঃ- ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, যুগান্তর পত্রিকা

১৯৭৬ সালে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ আই এফ এ-র পুরস্কার বিতরণী সভা থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৭৭ সালের ১৫ই মার্চ একটি প্রদর্শনী খেলার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় রাত্রিবেলায় বিদ্যুতালোকে ফুটবল খেলা শুরু হবে। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স মোহনবাগান মাঠের বৈদ্যুতিকরনের কাজ করে দিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান ও হাওড়া ইউনিয়ন মাঠের বৈদ্যুতিকরনের কাজও খুব দ্রুত শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন।[৩২] শুধুমাত্র ফুটবলেই নয় অন্যান্য খেলাও রাত্রিবেলা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, নেতাজী স্টেডিয়ামে বিকেল ৫টায় ২৫তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছিলেন। প্রাথমিক সূচীর পরিবর্তন করে সব খেলাই উদ্বোধনের পর সন্ধ্যেবেলা হবে বলে জানানো হয়েছিল।[৩৩] এই নৈশালোকে খেলার ব্যবস্থা করার বেশ কিছু সুবিধা ছিল। প্রথমত ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দিনের বেলার অস্বাভাবিক গরমের তুলনায় বিকেল বা সন্ধ্যেবেলা খেলা পরিচালনা করার ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। দ্বিতীয়ত, সন্ধ্যেবেলা খেলা হওয়ার সুবাদে দর্শকদের পক্ষে তাদের কাজ শেষ করে মাঠে গিয়ে খেলা দেখা সম্ভব ছিল। ছুটির দিনগুলি ছাড়া অন্যান্য দিনগুলিতে দিনের বেলায় খেলা হলে দর্শকদের ছুটি বা হাফ ছুটি নিয়ে খেলা দেখা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

নাগরিক জীবনের বিদ্যুতের প্রতি নির্ভরতা খুব স্বাভাবিক এক বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিদ্যুতের সাথে অভ্যস্ত বাঙালীর জীবনে স্বাধীনতার কিছু সময় পরেই প্রবেশ ঘটেছিল বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা লোডশেডিং-র। বিদ্যুতশিল্পের বিপর্যয়ের ফলে ঘটা এই লোডশেডিং কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক আক্রোশের জন্ম দিয়েছিল। কলকাতায় সব থেকে বেশী অনুভূত হলেও রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাধারণ

মানুষ নিজেকে পরিস্থিতির সাথে অভিযোজিত করলেও দীর্ঘদিন ধরে চলা এই লোডশেডিং-র ঋণাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা নয় এই লোডশেডিং পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়ে সাধারণ মানুষের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিল লোডশেডিং। সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জনসমক্ষে না আনার ফলে এই সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ ও রূপক দুই ভাবেই অন্ধকারে ছিল এবং এই লোডশেডিং বাঙালীর জনজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ১৯৬০'র দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত কলকাতার রাত্রিকালীন সংস্কৃতি অভিজাত এবং ধনী ব্যক্তিদের পরিশীলিত জীবনধারার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। সমাজের উপরতলার তথাকথিত সংস্কৃতিবান পুরুষ ও মহিলাদের বিনোদনের অন্যতম অংশ ছিল এই নৈশ-প্রমোদ। কলকাতায় ক্রমাগত লোডশেডিং এই নৈশ-প্রমোদে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোন সূত্র পাওয়া না গেলেও রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত এরূপ এক সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সহজ ছিল না। এই লোডশেডিং বাঙালীর জনজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। বহু লেখকই তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় লোডশেডিং-কে উপস্থাপন করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় 'লোডশেডিং' নামক একটি গল্প লিখেছিলেন, যেখানে লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে, গল্পের অন্যতম চরিত্র ফণীবাবু সিঁড়ি দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে না ঢুকে, ঢুকে পড়েছিলেন অন্যের ফ্ল্যাটে।[৩৪] সে এক নিদারুণ পরিস্থিতি! আবার সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'হত্যাপুরী' রহস্য গল্প থেকে জানতে পারা যায় যে, ফেলুদা'র বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর নতুন রহস্য উপন্যাস, ছাপাখানায় লোডশেডিংয়ের জন্য বৈশাখ মাসে প্রকাশ পায় নি।[৩৫] এছাড়াও তাঁর লেখা 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' বা 'গোঁসাইপুর সরগরম' প্রভৃতি গল্পে বারংবার বিদ্যুতের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল। আবার তারাপদ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় 'বিদ্যুৎ বিভ্রাট' গল্পে লোডশেডিং-র বর্ণনা

দিতে গিয়ে বলেছিলেন "মফস্বলে যে সব এলাকায় সাপ বেশী সেখানে সাপের নাম উচ্চারণ করে না, বলে লতা। কেউ যদি ভুল করে কখনো সাপ বলে ফেলেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা জিভ কেটে দুবার লতা-লতা বলেন। লোডশেডিং-এর ব্যাপারটাও অনেকটা নাকি তাই। লোডশেডিং-এর কথা উঠলেই বেশ আলো-পাখা চলছিলো, সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। শুধু কথা উঠলে বা আলোচনা করলে নয়, মনে মনে ভাবলে, কাগজে-কলমে লিখলে পর্যন্ত লোড শেডিং ঘাড়ে এসে পড়ে"।[৩৬] আবার মজা করে লিখেছিলেন "এতদিনে আমাদের লোড শেডিং-এর সঙ্গে একটা আত্মীয়তাও দাঁড়িয়ে গেছে"।[৩৭] পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর 'মাঝে মাঝে লোডশেডিং' কবিতায় লোডশেডিং-কে রোম্যান্টিসাইজ করে লিখেছিলেন-

"মাঝে মাঝে লোডশেডিং হোক।

সাদা মোমবাতি জ্বেলে

তোমাকে সম্পূর্ণ করে দেখি।"[৩৮]

আবার তেমনই বহু লেখকের লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল রূঢ় বাস্তব। লেখক দিব্যেন্দু পালিত, অমর মিত্রকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গে লোডশেডিং-এর তুলনা টেনেছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করার সময়ে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে তিনি তাঁর তৎকালীন সহপাঠী শ্রী অমলেন্দু মিত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'লোডশেডিং হল না কি?'[৩৯] তৎকালীন সাহিত্যের পাশাপাশি সিনেমার মত গণমাধ্যমেও লোডশেডিং-র বিষয়টি উঠে এসেছিল। ১৯৭৫ সালে (মতান্তরে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬) সত্যজিৎ রায় পরিচালিত জনঅরণ্য সিনেমাতে তৎকালীন কলকাতার লোডশেডিং-র সমস্যা উঠে এসেছিল। সিনেমার মুখ্য চরিত্র সোমনাথ (প্রদীপ মুখার্জী) যখন ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে তখন লোডশেডিং ছিল। সে, তার বৌদির (লিলি চক্রবর্তী) সাথে

তার কাজ নিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ‘বাড়ি ফিরে এসে অন্ধকার দেখলে মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে যায়’।[৪০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লোডশেডিং ব্যতীত অন্য বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিনেমার অংশ হয়ে উঠেছিল। সে হালফিলের বহুল প্রশংসিত হিন্দি ছবি স্বদেশ (২০০৪) হোক যেখানে বিদেশে কর্মরত মোহন (বলিউড তারকা শাহরুখ খান) তার পৈত্রিক গ্রামের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে নিজের অর্থ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কয়েকজন স্থানীয় মানুষের সহায়তায় গ্রামের ঠিক বাইরে একটি পাহাড়ের ধারে একটি ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করেন বা ১৯৫৫ সালের হিট বাংলা ছবি উত্তম-সুচিত্রার ‘সবার উপরে’-তে তো কাহিনীর মোড়ই ঘুরে যায় পথবাতির সুবাদে। মিথ্যা মামলায় খুনি সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটতে হয় নায়কের বাবাকে (ছবি বিশ্বাস)। রাস্তার আলোয় তাঁকে দেখে ফেলার দাবি জানিয়েছিলেন জনৈক সাক্ষী। সন্ধ্যা ৭টার সময় আসামীকে না কি ঘটনাস্থল থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। নায়ক মিউনিসিপ্যালিটির নথি ঘেঁটে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে শুক্লপক্ষের রাত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ ৮টার সময় সে রাতে পথবাতি জ্বলেছিল। আবার সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অপুর সংসারে অপু দিনের বেলায় আলো জ্বেলে রাখায় তাঁর বাড়ির মালিক তাকে সেই নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন, ‘ঐ যে দিনের বেলা কারেন্ট পোড়াচ্ছেন’। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে প্রিয় হোক বা অপ্রিয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল এই বিদ্যুৎ ও লোডশেডিং।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় ব্যাপক লোডশেডিং হয় যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। সমগ্র কলকাতাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় ছিল।[৪১] এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯৬১ সালে কলকাতায় এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সভায় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে রাজ্য

সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উঠেছিল।[৪২] তৎকালীন নাগরিকরা কিন্তু নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং কলকাতার বিদ্যুতশিল্পে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একচেটিয়া আধিপত্যের কথা জেনেও তারা এই লোডশেডিং-র কারণে কর্পোরেশনের ভূমিকার বিরোধিতা করেছিলেন। এর সঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকরাও বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। ১৯৬১ সালের ১১ই মে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার প্রতিবাদে কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকরা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও রাইটার্স বিল্ডিং এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল।[৪৩] লোডশেডিং-র দরুন এই সময়ের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে রাজ্য সরকার ও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান বিদ্যুতের রেশন ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে লোডশেডিং-র সমস্যা গ্রীষ্মকালে বেড়ে যেত। হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর ও কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে দিনে ও রাতে অসহ্য গরমে হাসপাতলের রোগীদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।[৪৪] নাগরিক স্বাছন্দ্যের পুরো ব্যবস্থাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল এই সময়ে। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে বসত বাড়িতে পাম্পের মাধ্যমে জল তোলায় ভীষণ অসুবিধা হয়েছিল। সবথেকে খারাপ অবস্থা ছিল আবাসনগুলির। পরিস্থিতি এমন চরম পর্যায়ে পৌছায় যে সরকারি ফ্ল্যাটের আবাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ খরচায় জল সংগ্রহ করে রাখার জন্য চৌবাচ্চা তৈরি করেনিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে, রাজ্যের প্রায় ১৪ হাজার সরকারি ফ্ল্যাটের আবাসিকরা তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শ্রী যতীন চক্রবর্তীর কাছে এই মর্মে আবেদন জানান।[৪৫] আরও মজার বিষয় হল এই যে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ দুর্গাপূজাতেও লোডশেডিং থাবা বসিয়েছিল। ১৯৭৯ সালে উত্তর কলকাতার এক পুজো কমিটির মূল

আকর্ষণ ছিল ‘লোডশেডিং প্রতিমা’। বিদ্যুতের যা অবস্থা তাতে ভরসা করতে না পেরে উদ্যোক্তারা এমন এক প্রতিমা প্রস্তুত করান যা অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করবে।[৪৬]

এইসকল অসুবিধার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সবথেকে চিন্তার বিষয় ছিল বিদ্যুতের বিল। সাধারণত লোডশেডিং-র সময় বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ থাকে এবং খুব স্বাভাবিক যে সেই সময়ে বিদ্যুতের ব্যবহার বা খরচ সম্ভবপর নয়। বিদ্যুতের ব্যবহার কম হলে আনুপাতিক হারে বিদ্যুতের বিলও কম আসার কথা কিন্তু দিনের বেশির ভাগ সময় লোডশেডিং-র কবলে থাকলেও সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি বা কল-কারখানাগুলির বিদ্যুতের বিল কম আসার কোনও লক্ষণ ছিল না। পূর্বের মতই একই ছিল বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বেড়েও গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের এই ক্ষেত্রে মূল অভিযোগ ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে মিটার রিডিং না নেওয়ার জন্যই এই বর্ধিত বিল এসেছিল। মানুষের মধ্যেকার ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় যখন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান সাধারণ মানুষের মুখের কথা তুলে ধরে “প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোড-শেডিং অথচ আমার বিল একই থেকে যাচ্ছে”[৪৭] শীর্ষক এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান স্বপক্ষে যুক্তি দিতে যায়। তৎকালীন রাজ্যের অস্থায়ী বিদ্যুৎমন্ত্রী অশোক মিত্রের কাছে এই সংক্রান্ত বহু অভিযোগ জমা পড়েছিল। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রী অসিতকুমার মিত্র কর্পোরেশনের গাফিলতির কথা সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকার করেনিয়েছিলেন।[৪৮] এর কিছুদিন পরেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান এই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নেয় এবং নতুন এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিল সংক্রান্ত সমস্যার জন্য একজন সিনিয়ার অফিসার এবং দক্ষ কর্মীদের নিয়ে স্পেশাল কমপ্লেন্ট সেল গঠনের কথা প্রচার করেছিল।[৪৯]

আপামর বাঙালীর কাছে বিদ্যুতের ব্যবহারের সবথেকে জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল আলো আর পাখা। লোডশেডিং-র ফলে বাঙালী এই দুই থেকেই বঞ্চিত হলেও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কলকাতার মানুষ কিছুদিন আলো ছাড়া থাকতে প্রস্তুতি নিয়েছিল যা ব্ল্যাকআউট নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় সন্ধে নামলেই কলকাতায় ব্ল্যাকআউটের কথা জানা গিয়েছিল। কলিকাতা অসামরিক প্রতিরক্ষার কন্ট্রোলারের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে ব্ল্যাকআউটের (নিষ্প্রদীপ) সময়ে করণীয় বিষয়গুলির অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত।[৫০] ১৯৭১ সালের ৩০শে অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতা, ৩১শে অক্টোবর মধ্য কলকাতা এবং ১লা নভেম্বর উত্তর কলকাতায় ব্ল্যাকআউটের মহড়া সংগঠিত হয়েছিল।[৫১] সরকারি নির্দেশে আলকাতরা মাখানো টিনের ঘেরাটোপে ঢেকে দেওয়া হত শহরের তামাম রাস্তার আলো। শত্রুপক্ষের বিমান হানার আশঙ্কাতেই এই সাবধানতা। তবে একথাও ঠিক যে তৎকালীন সময়ে লোডশেডিং-র দাপটে এই ব্ল্যাকআউট সম্ভবত বাঙালীকে খুব একটা বেকায়দায় ফেলতে পারেনি। রাস্তার আলো বা পথবাতি না জ্বলার জন্য সবার অসুবিধা হলেও চৌর্যবৃত্তির সাথে যুক্ত মানুষজনের যে সুবিধা হয়েছিল তা কিন্তু বলাই যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শহরে বিদ্যুৎ না থাকায় উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার শহরে চুরির ঘটনাও বেশ বেড়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।[৫২]

লোডশেডিং যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করেছিল তেমনই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও প্রভাবিত করেছিল।একদিকে যেমন কর্মসময় ব্যাহত হয়েছিল তেমনই সেইসময়ে উৎপাদনও আশানুরূপ হয়নি। লোডশেডিং-র ফলে কলকারখানাগুলিতে কাজের সময় কমিয়ে দেওয়ায় শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ কমে গিয়েছিল এবং ছাঁটাই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬১ সালের ১৫ই মে, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী শ্রী আব্দুস সাত্তার জানিয়েছিলেন যে বিদ্যুতের অনিয়মিত সরবরাহের ফলে

চটকলগুলির প্রায় ২ লক্ষ কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং কারখানাগুলির দৈনিক আনুমানিক ৫ ঘণ্টা করে কর্মসময় নষ্ট হয়েছিল।[৫৩] ঐসময়েই দিল্লির এক শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে রেওনের কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে লগ্নি করতে আগ্রহী হলেও রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তার জন্য পরিকল্পনাটি প্রত্যাহার করেছিলেন।[৫৪] দুর্গাপুরের ইস্পাত ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার উৎপাদনও ব্যাহত হয়েছিল।[৫৫] ১৯৭২ সালের প্রথম আট মাসে ২৩ হাজার টন পাটজাত শিল্প উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল, যার আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা।[৫৬] লোডশেডিং-র জন্য ১৯৭৪ সালের প্রথম ৩ মাসে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সংগঠিত ক্ষেত্রে ২৬ কোটি টাকার কম উৎপাদন হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবারহ উৎপাদনকে ব্যহত করেছিল।[৫৭] আবার ডেয়ারি শিল্পও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দুগ্ধ বিভাগে চিলিং প্লান্টের প্রায়শই লোডশেডিং-র ফলে দুগ্ধ প্রকল্পগুলিতে প্রত্যেক দিন প্রায় ৫০ হাজার দুধ নষ্ট হয়েছিল। দুগ্ধ বিভাগ থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে লিখিতভাবে বারংবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল যে, যে সমস্ত জায়গায় চিলিং পয়েন্ট আছে সেইসব জায়গাতে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ যেন নিরবিচ্ছিন্ন থাকে।[৫৮] একথা ঠিক যে লোডশেডিং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পব্যবস্থাকে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু আধুনিক সময়ে মানুষের ভোগবাদ এই প্রতিকূল পরিবেশেও কিছু নতুনত্বের সন্ধান করেছিল। সাধারণ মানুষকে লোডশেডিং-র হাত থেকে রেহাই দেওয়ার তাগিদ বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও উদ্যোক্তাদের কাছে এক নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত করেছিল। ঘর আলোকিতকরণের বিকল্প হিসাবে মোমবাতি, গৃহস্থ বাড়িতে ফ্যান বা আলো জ্বালানোর জন্য সহজে ব্যবহৃত জেনারেটার, বিদ্যুৎ ধরে রাখার ব্যাটারি বা হালফিলের ইনভার্টার, লোডশেডিং-র সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পেরেছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে এগুলিকে ঘিরেই এক

একটি শিল্প গড়ে উঠেছিল যা সামগ্রিক ভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানেও সহায়ক হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র পরিসরে মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে মাসিক হারে জেনারেটার দ্বারা চালিত টিউবলাইট, পাখা ভাড়া দেওয়ার খবরও জানা যায়।

আবার লোডশেডিং-র জন্য বিভিন্ন সময়েই বিভিন্ন অফিসে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বারাসাত মহকুমায় লোডশেডিং-র মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় অফিস, ছোট কারখানাগুলি বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। কৃষিতে ব্যবহৃত সেচ ব্যবস্থাও এর প্রকোপ থেকে বাদ পড়ে নি।[৫৯] গার্ডেনরীচের বিখ্যাত কেশরাম কটন মিলের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছিল বলে জানা যায়। যার জন্য প্রায় ১১ হাজার কর্মচারীকে 'লে অফ' করা হয়েছিল।[৬০] ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ এর প্রধান বুকিং অফিসে কাজের খুবই ক্ষতি হয়েছিল।[৬১] একই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রেলব্যবস্থার বৈদ্যুতিকরণ হয়ে যাওয়ায় লোডশেডিং রেলব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। লোডশেডিং-র ফলে বৈদ্যুতিক সিগনালিং ব্যবস্থা ও কেবিন পয়েন্টগুলি অকেজো হয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৭৯ সালের অগাস্ট মাসে লোডশেডিং-র দরুণ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ১০টি আপ ও ৭টি ডাউন ট্রেন বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়েছিল।[৬২]

বিদ্যুতের এই বহুমাত্রিক ব্যবহার তাকে মানবজীবনে অপরিহার্য করে তুলেছিল। তবে সুবিধার পাশাপাশি 'বিদ্যুৎ' কিছু সমস্যারও সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্যা ছিল মূলত পরিবেশগত। বিদ্যুৎ, মানবজীবনের পাশাপাশি পরিবেশকেও প্রভাবিত করেছিল। একদিকে যেমন অত্যধিক বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে পরিবেশে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তেমনই আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকারভেদে পরিবেশ দূষিত হয়। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের দেশগুলি তাদের আর্থিক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশেষতঃ ভারতবর্ষ তার ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পাশ্চাত্যের দেখানো পথই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছিল। সেই তাগিদ থেকেই আবির্ভাব হয় জাতীয় উন্নয়ন কৌশল (NDS) ধারণার। এই কৌশল নির্মাণের পিছনে অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল এনার্জি বা শক্তি। ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে এই শক্তির প্রাথমিক রূপ ছিল তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে ও পরিবেশকে রক্ষার তাগিদে নিউক্লিয়ার শক্তি, ভূতাপীয় শক্তি, সৌর ও বায়ু শক্তির প্রচলন দেখা যায়। বিদ্যুতের উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্নতার মতই যত দিন গেছে ততই ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহারের তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্যুতের প্রসারের সাথে সাথেই বৈদ্যুতিন যন্ত্র ও গ্যাজেট ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষের সামাজিক জীবনে উন্নতি সাধনের পাশাপাশি শক্তির উৎপাদন এবং ব্যবহার, পরিবেশের উপর এক নিঃশব্দ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিভিন্ন শক্তি উৎপাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাথমিক উপকরণের প্রয়োজন যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার মত জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন প্রয়োজন। কয়লা দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং বলাই বাহুল্য উল্লিখিত গ্যাসগুলির প্রত্যেকটিই বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। এর মধ্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড হল গ্রীন হাউসগ্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম, যা পৃথিবীর সার্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। ইন্টারন্যাশানাল এনার্জি এজেন্সি, ওয়ার্ল্ড এনার্জি আউট লুক নামক একটি বার্ষিক

প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তার ২০০৭ সালের সংস্করণ অনুযায়ী, বিশ্বের ৮৫% শক্তির যোগান আসে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন থেকে । এই জীবাশ্ম জ্বালানির অন্যতম হল কয়লা, এই কয়লা পোড়ানোর ফলে বায়ুমন্ডল যেমন উত্তপ্ত হচ্ছে তেমনই তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষজন এই ছাইয়ের গুঁড়োর সমস্যায় জর্জরিত। এই ছাই আশেপাশের মানুষদের বিশেষত বয়স্ক ও শিশুদের অ্যালার্জী ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। উৎপাদন কেন্দ্রের আশেপাশের গাছের ছাল ও পাতায় এবং জমির উপর এই ছাইয়ের পুরু আস্তরণ পড়ে যার ফলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। এর পাশাপাশি ঝুল (Soot) বা ব্ল্যাক কার্বনের সমস্যাও তীব্র আকার ধারণ করে। এই ব্ল্যাক কার্বন অন্যান্য এরোসলের (Aerosols) মতন নয়, এটি সূর্যরশ্মিকে শুষে নেয়, যা বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও অ্যাসিড বৃষ্টিরও একটি বড় কারণ হল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ছাই। বর্তমান দিনে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহারই বেশি নজরে আসে, বিশেষতঃ ১৯৭১ এবং ১৯৭৯ সালে ঘটে যাওয়া দুটি তেলের সংকটের পর। ২০১১ সালের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক অথরিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতে উৎপাদিত শক্তির মোট ৬৪.৯৮% হল তাপশক্তি যার মধ্যে কয়লা নির্ভর উৎপাদনকেন্দ্র হল ৫৪.০৯%। কলকাতাতেও যে সকল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে তার বেশিরভাগের উৎপাদনই কিন্তু কয়লা নির্ভর। কয়লা শুধুমাত্র যে বিশ্ব উষ্ণায়ণকে বাড়িয়ে তোলে তাই নয়, পাশাপাশি এই জীবাশ্ম জ্বালানিটির ভান্ডারও মাটির তলায় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে।[৬৩] আবার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলের নিয়ন্ত্রিত, নিরন্তর যোগানের প্রয়োজন যা শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমেই সম্ভব। এরকম বহু নিদর্শনই আছে যেখানে নির্দিষ্ট কোন মানবগোষ্ঠী এই বাঁধ নির্মাণের দ্বারা উপকৃত হয়েছে যেমন- ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে, আমেরিকার টেনেসি ভ্যালী অথরিটির অনুকরণে গড়ে ওঠা দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশান গঠনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ বন্যার হাত

থেকে রেহাই পেয়েছে। এই কর্পোরেশনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে দামোদর নদের প্রকোপ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা এবং পাশাপাশি এই নদের জলস্রোত কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।[৬৪] তবে একথাও ঠিক যে বাঁধ নির্মাণের ফলে পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ে। বাঁধ নির্মাণের ফলে ভুমিকম্পের একটি সম্ভবনা থেকেই যায়। ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রের কোয়েনানগর এলাকায় ১৯৬৭ সালে এক ভয়ঙ্কর ভুমিকম্প হয়, রিখটার স্কেলে যার তীব্রতা ছিল ৬.৬ মেগাহার্টজ। ১৯৬২ সালে কোয়েনা নদীর তীরে নির্মিত ভারতবর্ষের বৃহত্তম কোয়েনা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাধারকে এই ভুকম্পনের জন্য দায়ী করা হয়।[৬৫] পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব সংস্থার বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে বহুজাতিক সংস্থা ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে তাদের বিনিয়োগের বাজার হিসাবে ধরতে চেয়েছিল। সমগ্র বিশ্বে, ১৯৮০-র দশকে নির্মিত হওয়া বৃহৎ বাঁধগুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ এবং ১৯৯০-র দশকের তিন-চতুর্থাংশ নির্মিত হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে।[৬৬] বাঁধ নির্মাণ পরিবেশের সাথে বাস্তুতন্ত্রেরও বিবর্তন ঘটায় যেমন ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে পুনের ২০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন মুলশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনে মুলশি বাঁধ নির্মাণের সময়ে প্রায় ১১,০০০ মালব আদিবাসীকে তাদের চাষযোগ্য উর্বর জমি থেকে উৎখাত করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশবান্ধব এই চাষিরা পাণ্ডুরঙ্গ মহাদেব বাপাতের নেতৃত্বে মুলশি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন।[৬৭]

বিদ্যুৎ বা শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং মানবজীবনে এর প্রভাবের কথা বিশ্লেষণ করে ভূতাপীয়, সৌর এবং বায়ু থেকে উৎপাদিত শক্তির প্রক্রিয়াকে পরিবেশ সহায়ক হিসাবেই গণ্য করা হয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এটা

স্পষ্ট যে শক্তি উৎপাদনের বেশ কিছু সমস্যা বর্তমান যা খালি চোখে আমাদের সামনে ধরা না পরলেও, আসলে সেটি আমাদের পরিবেশের জন্য ভীষণ রকম ভাবে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যা অনেকটাই বেশি। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্প অনেকাংশেই তাপবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। এই তাপবিদ্যুত উৎপাদনকেন্দ্রগুলির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কেন্দ্রই কাঁচামাল হিসাবে কয়লা ব্যবহার করে। এর ফলে কয়লা সম্পর্কিত বর্জ্য যেমন ফ্লাই অ্যাশ এবং বটম অ্যাশ এর পরিমাণ পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়। ভারতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে যে কয়লা ব্যবহার করা হয় তাতে ছাইয়ের পরিমাণ বেশি যা বিপুল পরিমাণে ফ্লাই অ্যাশের সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র তাই নয়, এর সাথে তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত সমস্যাও দেখা যায়। এরফলে পরিবেশের সাথে সাথে মানুষের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াও সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের থেকে রেডিওনিউক্লাইড বিকিরিত হয় যার ফলে মানুষের মানসিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় বলেও জানা গেছে। এই রেডিওনিউক্লাইড হাড় ও ফুসফুসের ও ক্ষতিসাধন করে।[৬৮] যদি এই বিকিরণ মাত্রাতিরিক্ত হয় তবে তা সমগ্র পরিবেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। ১৯৮১ সালের এক সমীক্ষায়, দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ ও বদরপুর, পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী ৮৮ কিমি অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে হাড় ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে।[৬৯] ১৯৮৪ সালে নির্মিত পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের নিকট কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই এক সমস্যার কথা জানা যায়। এই তাপবিদ্যুতকেন্দ্রের বর্জ্যেও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা জানা যায়।[৭০] বিংশ শতকের শেষ লগ্নে এবং একবিংশ শতকের শুরুর দিক থেকে বিদ্যুতের সার্বিক ব্যবহার শুরু হয়। দি ইন্টারগভার্ণমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাদের ২০০৭ এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৯০১-২০০৫ এই সময় কালে ০.৭৪^{0} সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পিছনে যেমন

নগরায়ণ, জমির পরিবর্তিত ব্যবহার দায়ী তেমনি শক্তি বা বিদ্যুতের বর্ধিত ব্যবহারও সমানভাবে দায়ী। শুধুমাত্র এই সময়কালে কলকাতা শহরের তাপমাত্রা ১^0 সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রীষ্মকালীন এই বৃদ্ধির পরিমাপ প্রায় ১.৪^0 সেন্টিগ্রেড । এই সংখ্যাগুলি সাধারণ চোখে খুবই নগণ্য মনে হলেও পরিবেশের উপর এর প্রভাব ব্যাপক।[৭১] এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'এশিয়ান ব্রাউন ক্লাউড'-এর কথা যার মূল উপকরণই হল কয়লা থেকে নির্গত ছাই, জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার, গাড়ি এবং কল কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া। এই মেঘ মূলত দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে দেখা যায়। গবেষকদের মতে এই বাদামি মেঘ, এই অঞ্চলের উষ্ণায়নের মাত্রাকে প্রতিনিয়ত ত্বরান্বিত করেছে চলেছে। অর্থাৎ এই কথা স্পষ্ট যে বিষয়টি কিন্তু শুধুমাত্র ভারতবর্ষ বা তার আশেপাশের অঞ্চলে সীমিত নেই। যদিও এই কথাও সমানভাবে প্রযোজ্য এই সকল জিনিসের জন্য শুধুমাত্র ভারতবর্ষ একা দায়ী নয়।[৭২]

বাঙালী জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম কিন্তু পরিবেশের সমস্যা ছাড়াও এর কিছু ঋণাত্মক প্রভাব নাগরিক জীবনে পড়েছিল। বিদ্যুতের প্রবেশ অজান্তেই বাঙালী সমাজে আলোকিত ও অনালোকিতের অলিখিত এক সামাজিক বিভেদের সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যা কোথাও একটা গিয়ে কেন্দ্র ও প্রান্তিক দ্বন্দ্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে ছিল শহুরে 'কেন্দ্র' ও অপরদিকে ছিল 'প্রান্তিক' গ্রাম। তবে শহরের মধ্যেও ঔপনিবেশিক আমলে 'White Town' এবং 'Black Town'-র মধ্যেকার যে বিভেদ ছিল তা শহরের বিদ্যুতায়নকে প্রভাবিত করেছিল। আবার বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈদ্যুতিক পাখা প্রচলন হওয়ার পূর্বে হাতে টানা পাখা ছিল উচ্চবিত্ত বাঙালীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই পাখা টানার কাজ করত পাঙ্খাপুলাররা। একথা অনস্বীকার্য যে পাঙ্খাপুলারদের কাজের ধরনটা অমানুষিক ছিল, তাদের উপর ব্রিটিশরা

বিভিন্ন রকমভাবে অত্যাচার করত কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কষ্টকর হলেও সেটি তাদের জীবিকা ছিল। যদিও পঞ্চাশের দশকেও পাঙ্খাপুলারদের অস্তিত্বের কথা জানা যায় কিন্তু মনে করা হয় বিদ্যুতের প্রচলনের সঙ্গে এই পাঙ্খা-পুলার শ্রেণীটির ক্রম বিলুপ্তি ঘটেছিল। সঠিক তথ্যের অভাবে আমাদের জানা নেই যে বর্তমান দিনের মত ঔপনিবেশিক সরকার তাঁদের জন্য কিছু বিশেষ 'প্যাকেজ'-র ব্যবস্থা করেছিল কি না। অপরদিকে ভিক্টোরীয় যুগের গ্যাসবাতি জ্বলত পেটা লোহার কারুকাজ করা পোস্ট বা ব্র্যাকেট থেকে। বৈদ্যুতিক বাতির ক্ষেত্রে রাস্তার পাশের পূর্বসংস্থাপিত এই পোস্টগুলোই ব্যবহার হত আলো জ্বালাতে। তবে পূর্বের কাচের মনোহারি আস্তরণ বাতিল করে এনামেলের শেড থেকে ঝুলত নগ্ন বাল্ব। ক্রমে সুদৃশ্য পোস্টগুলোর ব্যবহার কমতে থাকে, ইতিহাসের পাতাতেই ঠাঁই হয় এদের। তার বদলে জায়গা করেনিয়েছিল লোহার খুঁটি। এই পরিবর্তন আক্ষরিক অর্থে দৃশ্য দূষণ না ঘটালেও দৃষ্টিকটু যে ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমে এই ল্যাম্পপোস্টগুলোই হয়ে উঠল রাজনৈতিক দলের পতাকা লাগানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞাপনের আধার। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়াশোনা করার কথা লোকচর্চায় সর্বজনবিদিত, তবে ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশবে ইলেকট্রিক তো নয়ই, গ্যাসের আলোর কৌলীন্যও জোটেনি মহানগরীর কপালে। যে আলোর কথা এখানে বলা হয় তা ছিল কেরোসিনের বাতি। ক্রমে গ্যাসের আলো এবং সর্বোপরি বিদ্যুতের আগমন পথবাতির ক্ষেত্রে এক বৃত্তকে সম্পন্ন করেছিল।

সবার অলক্ষ্যেই বাঙালী জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ আসার ফলে সন্ধ্যেবেলা ঘরে আলো জ্বালানোও হঠাৎ সহজ হয়ে উঠেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না এই পরিবর্তন বদলে দিয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, যা পক্ষান্তরে বদলে দিয়েছিল দাম্পত্যের আভন্ত্যরীণ রূপ। সন্ধ্যের পর পরিবারের সদস্যদের

থেকে পৃথকভাবে স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছামত আলোকিত ঘরে পরস্পরের সান্নিধ্যে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। এর আগে গৃহ আলোকিত করা ছিল জটিল ও সময়সাধ্য ব্যাপার। যার ফলে বাড়ির সব ঘর আলোকিত করা হত না এবং বলাই বাহুল্য স্বামী-স্ত্রীর আলাদা করে সময় কাটানো ছিল দুষ্কর। ঔপনিবেশিক সরকারের মতে, ভারতীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের বিদ্যুতায়ন নতুন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা অনেকাংশেই পশ্চিমী প্রযুক্তিগত আধুনিকতার ধারণার সাথে জড়িত ছিল।[৭৩] তাছাড়া গৃহস্থের কাজে বিদ্যুতের সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক প্রযুক্তির বিস্তৃতির মাধ্যমে ঔপনিবেশকারীরা গ্রাহকদের পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। আবার লোডশেডিং শিক্ষা দিয়েছিল যে নিম্নমানের বিদ্যুত সরবরাহ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যিক স্বার্থের ক্ষতি করে এবং রাজ্যগুলির 'ব্যবসা' সম্পর্কিত মনোভাব নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

বিদ্যুৎ ছিল সর্বরোগনিয়ামক এক ওষুধ, যা একদিকে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছিল আবার অন্যদিকে শিল্পের উন্নতিতেও সহায়ক হয়েছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় বিদ্যুৎ কোম্পানির সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন পেশা ও পদের কথা জানা যায় যা ইতিপূর্বে বাংলায় দেখা যায়নি, যেমন- বিক্রয়িক, মিটার রিডিং নেওয়ার জন্য লোক প্রভৃতি। বিদ্যুতের ব্যবহারকে আধুনিকতা, আধুনিক পুঁজিবাদ এবং শিল্পায়নের পিছনে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যুতের প্রতি এক অনাস্বাদিত নির্ভরতা সমাজক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন এনেছিল। ষাটের দশকের পরবর্তী সময়ে লোডশেডিং-র সামাজিক বিভাজন, গ্রাম-শহরের পার্থক্য এবং আরও অনেক প্রেক্ষিত বিদ্যুতের আলোকিত ও অনালোকিত দ্বন্দের মধ্যে সম্পৃক্ত ছিল। উপরন্তু ধনতন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়, রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক, বিদ্যুতশিল্পের মালিক ও শ্রমিক, সমাজের উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ

ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে ব্রিটিশদের হাত ধরেই বাঙালী এই আধুনিকতার স্পর্শ পেয়েছিল কিন্তু একথাও মানতে হবে যে বাঙালী এই আধুনিকতা গ্রহণের প্রসঙ্গে বেশ নমনীয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের আবির্ভাবের মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে কালীঘাট মন্দিরের মত এক আপাদমস্তক ধর্মীয়স্থানে চিরাচরিত রীতির থেকে সরে এসে বৈদ্যুতিক আলোর প্রবেশ সেই নমনীয়তারই লক্ষণ। আবার কিছুটা পরে হলেও শবদাহ করার ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবহার এবং তাকে মান্যতা দেওয়াও কিন্তু সেই নমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ। তাই একথা সহজেই বলা যায় যে বিদ্যুৎ একাধারে ছিল সামাজিক পরিবর্তন ও শিল্পোন্নতির মূল উপাদান। তবে মানুষের এই উন্নয়নের মূল্য শোধ করতে হত পরিবেশকে। ভারতবর্ষের বুকে আজ থেকে প্রায় ১৪০ বছর আগে বিদ্যুৎ আত্মপ্রকাশ করে। তখনও পৃথিবীর বহু দেশে কিন্তু বিদ্যুতের প্রচলন ছিল না, অথচ আজ এতদিন পরেও আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকেও পিছিয়ে। আমাদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে বিশ্বউষ্ণায়ন এবং আলোচ্য অন্যান্য সমস্যাগুলি কোনো স্থানীয় সমস্যা নয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এটি যুগপৎ স্থানীয় ও বিশ্বায়িত সমস্যা।

সূত্রনির্দেশ

১. Animesh Chatterjee, "'New wine in new bottles': class politics and the 'uneven electrification' of colonial India, History of Retailing and Consumption, (Routledge, 2018) P-2-3.

২. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", নেওয়া হয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০২২), দশম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-২২।

৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড (মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি: দ্বিতীয় সংস্করণ, মহাষ্টমী ১৩৬৫), পৃ-৫৮।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র ১৩৪৭), প্রথম সংস্করণ, পৃ-৩।

৫. সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলের শহর কলকাতা (কলিকাতা: রীডার্স কর্নার, রাসপূর্ণিমা ১৩৬৬), পৃ.৮৮-৮৯।

৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী চিত্রিত, হুতোমপ্যাঁচার নক্সা (নতুন সাহিত্য ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), পৃ-৫১।

৭. "The CESC Chronicle, History of CESC; Lighting the City of Joy Since 1897", A CESC Publication, Calcutta, P.15-20.

৮. Suvobrata Sarkar, Let there be light: Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1940, (India: Cambridge University Press, 2020), P-161.

৯. David Arnold, Everyday Technology; Machines and the Making of India's Modernity, (The University of Chicago Press: Chicago and London, 2013), P-44.

১০. "Lights in a Hindu Temple" Popular Electricity, Vol-IV No.9, Chicago (January, 1912): P-791.

১১. অমৃতলাল বসু, বাবু, (কলকাতা: ইউ সি বসু অ্যান্ড কোম্পানিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ), পৃ-২০।

১২. বসু, বাবু, পৃ-২২।

১৩. তদেব।

১৪. Sarkar, Let there be light: Engineering, P-164.

১৫. রাজীবাক্ষ রক্ষিত, "ইঞ্জিনিয়ার বিধানচন্দ্র," আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুলাই ২০২০।

১৬. "Don't turn off the light now," CESC News, March 2013, P-10.

১৭. Anonymous, "Inadequate Street Lighting," The Calcutta Municipal Gazette, Vol.-XLV-XLVI Nos.-22-24 & 1-2, Calcutta, (3rd-31st March 1947): P-452(n).

১৮. Anonymous, "Crime in Calcutta increasing," The Calcutta Municipal Gazette, Vol.-XLVII No.-13, Calcutta, (14th Feb 1948): P-216(d).

১৯. Anonymous, "Theft of Street Lamp Bulbs," The Calcutta Municipal Gazette, Vol.-XLVI & XLVII Nos.-24 & 1-4, Calcutta, (1st-29th Nov 1947): P-175.

২০. তপোবিজয় ঘোষ, নির্বাচিত গল্প, (বুকমার্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৬১), পৃ-৭৯।

২১. অশোক মিত্র, আপিলা চাপিলা, (কলকাতা: আনন্দ, আষাঢ় ১৩৬৬), পৃ-৪৪।

২২. মানসী রায় চৌধুরী, কলকাতার দিনপঞ্জী, (কলকাতা: পুরশ্রী, নবপর্যায় ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০ জুন ২০০৯), পৃ-৬।

২৩. স্টাফ রিপোর্টার, "কলকাতায় বৈদ্যুতিক শবদাহ যন্ত্র," যুগান্তর, ১৯শ বর্ষ ২৭১শ সংখ্যা, ১৭ই জুন ১৯৫৬, পৃ-১।

২৪. মানসী রায় চৌধুরী, কলকাতার দিনপঞ্জী, (কলকাতা: পুরশ্রী, নবপর্যায় ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২০ জুন ২০০৯), পৃ-৫।

২৫. "ইলেকট্রিক চুল্লি," নেওয়া হয়েছে 'স্বদেশচর্চা লোক,' বিশেষ সংখ্যা- বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান ১, প্রণব সরকার সম্পাদিত (কলকাতা: মার্চ ২০০০), পৃ-২৯৫।

২৬. হরিপদ ভৌমিক, "কলকাতার শ্মশানঃ নিমতলা," নেওয়া হয়েছে 'স্বদেশচর্চা লোক,' বিশেষ সংখ্যা- বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান ২, প্রণব সরকার সম্পাদিত (কলকাতা: বইমেলা ২০০৪), পৃ-২৭৮।

২৭. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, (সুবর্ণরেখা: কলকাতা, ১৯৮০), পৃষ্ঠা-১৭১-১৮৪।

২৮. প্রাঞ্জল নন্দী, "শহর কলকাতার সমাজে ট্রাম", নেওয়া হয়েছে, 'ভারতের সামাজিক ইতিহাস; অনূর্ধ্ব ৩০-এর কলমে', শুভঙ্কর দে সম্পাদিত (আবিষ্কার: কলকাতা ২০১৭), পৃষ্ঠা- ৮৪।

২৯. Y P Singh, "Performance of the Kolkata (Calcutta) Metro Railway: A Case Study," In 'Urban Mobility for All: La Mobilité Urbaine pour Tous,' edited by X. Godard & I. Fatonzoun (Lisse : Balkema, 2002), P-337.

৩০. বীরেন সাহা, "কলকাতায় পাতাল রেল," ধনধান্যে, পঞ্চম বর্ষঃ সংখ্যা ২১ ও ২২, ১ ও ১৫ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ-২৫।

৩১. "চিত্র," যুগান্তর, ৪০ বর্ষ ৯৮ সংখ্যা, পৃ-১।

৩২. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুতালোকে ফুটবল আগামী মার্চ মাসে," যুগান্তর, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬, পৃ-৬।

৩৩. স্টাফ রিপোর্টার, “জাতীয় ভলির খেলা ও উদ্বোধন সন্ধ্যেবেলায়,” যুগান্তর, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬, পৃ-৬।

৩৪. সত্যজিৎ রায়, লোডশেডিং, গল্প ১০১ (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স,২০০১), পৃ.২৪৪-৪৫।

৩৫. সত্যজিৎ রায়, হত্যাপুরী, ফেলুদা সমগ্র ২ (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ-২।

৩৬. তারাপদ রায়, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাণ্ডজ্ঞান, (কলকাতা: সমতট প্রকাশণী, ১লা এপ্রিল ১৯৫৮), পৃ.২৪-২৫।

৩৭. তদেব।

৩৮. পূর্ণেন্দু পত্রী, “মাঝে মাঝে লোডশেডিং,” পুনরুদ্ধার https://banglarkobita.com/poem/famous/1312.

৩৯. “লেখকের থেকে সাহিত্যের দাবী অনেক বেশিঃ দিব্যেন্দু পালিত,” পুনরুদ্ধার, কলকাতা, দ্য ওয়াল পুজো ম্যাগাজিন ১৪২৬, <http://eggsinthenest.com/pujomagazine2019/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE/> Retrieved on 18th February 2022.

৪০. সত্যজিৎ রায়,জন অরণ্য, ইউটিউব;https://www.youtube.com/watch?v=nd1rRNuG0Nw,

১ ঘন্টা ৪৯ মিনিট, কলকাতা, ১৯৭৫।

৪১. স্টাফ রিপোর্টার, "কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ৩রা এপ্রিল ১৯৬১, ২৪শ বর্ষ ১৯৪শ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-২।

৪২. স্টাফ রিপোর্টার, "কলিকাতা বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কে তদন্তের দাবি," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ৮ই মে ১৯৬১, ২৪শ বর্ষ ২২৯ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৫।

৪৩. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সরবরাহে বিপর্যয়ের প্রতিবাদে বিরাট শ্রমিক বিক্ষোভ," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ১২ই মে ১৯৬১, ২৪শ বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৪৪. নিজস্ব প্রতিনিধি, "আলিপুরদুয়ারে বিদ্যুৎ বিভ্রাট," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ২৭শে আগস্ট ১৯৭১, ৩৪ বর্ষ ৩৩৯ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৬।

৪৫. স্টাফ রিপোর্টার, "যথারীতি লোডশেডিং," প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুলাই ১৯৭৯, ৫৮ বর্ষ ১১২ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৪৬. স্টাফ রিপোর্টার, "লোডশেডিং প্রতিমা এবার," প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, ৫৮ বর্ষ ১৯২ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৪৭. বিজ্ঞাপন, "প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোড-শেডিং অথচ আমার বিল একই থেকে যাচ্ছে," বিজ্ঞাপন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫৮ বর্ষ ১১১ সংখ্যা, ৪ঠা জুলাই ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ–৩।

৪৮. স্টাফ রিপোর্টার, "সি ই এস সির বিতর্কিত বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার," প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই জুলাই ১৯৭৯, ৫৮ বর্ষ ১১৮ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৪৯. বিজ্ঞাপন, "আমাদের 'স্পেশাল কমপ্লেনট সেল' আপনাদের বিল সংক্রান্ত সব অভিযোগের দেখাশনা করবে," বিজ্ঞাপন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫৮ বর্ষ ১২৫ সংখ্যা, ১৮ই জুলাই ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ–৩।

৫০. বিজ্ঞাপন, "নিষ্প্রদীপ মহড়া; আপনাকে যা করতে হবে," বিজ্ঞাপন, যুগান্তর, ৩৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ৩০শে অক্টোবর ১৯৭১, কলকাতা, পৃ–১।

৫১. "যেসব এলাকা নিষ্প্রদীপ হবে," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ৩৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১, কলকাতা, পৃ-২।

৫২. 'আলিপুরদুয়ারে বিদ্যুৎ বিভ্রাট', প্রাগুক্ত।

৫৩. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ সংকটে শিল্প বিপর্যয়," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ১৬ই মে ১৯৬১, ২৪শ বর্ষ ২৩৬ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৫৪. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ শক্তির অপ্রাচুর্যের ফলে-পশ্চিমবঙ্গে কারখানা স্থাপনের শিল্পপতিদের অনুৎসাহ," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬১, ২৫শ বর্ষ ৮১শ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৪।

৫৫. নিজস্ব সংবাদদাতা, "বিদ্যুৎ পরিস্থিতির আরও অবনতি," প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা আগস্ট ১৯৭৩, ৫১ বর্ষ ১৪৩ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৫।

৫৬. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ে পাটশিল্পে সাড়ে আট কোটি টাকা ক্ষতি," প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে আগস্ট ১৯৭২, ৫১ বর্ষ ১৬৫ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৫।

৫৭. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের শিল্পে সংকট," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৪ , ৩৭ বর্ষ ২১৫ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৫৮. স্টাফ রিপোর্টার, "বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের ফলে হাজার হাজার লিটার দুধ নষ্ট হচ্ছে," প্রতিবেদন, যুগান্তর, ১১ জুলাই ১৯৭৩, ৩৬ বর্ষ ২৯১ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৫।

৫৯. নিজস্ব সংবাদদাতা, "বারাসাত মহকুমায় বিদ্যুৎ সংকট," প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে জুলাই ১৯৭২, ৫১ বর্ষ ১৩৭ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৬০. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ বন্ধের ফলে কেশোরামে কাজকর্ম বিঘ্নিত,” প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে আগস্ট ১৯৭২, ৫১ বর্ষ ১৬৮ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-৩।

৬১. “যথারীতি লোডশেডিং”, প্রাগুক্ত।

৬২. স্টাফ রিপোর্টার, “বিদ্যুৎ অভাবে ট্রেন বন্ধ,” প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে আগস্ট ১৯৭৯, ৫৮ বর্ষ ১৬৪ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ-১।

৬৩. অনিন্দ্য ভুক্ত, ‘শক্তির সঙ্কট’, (নাগরিক মঞ্চ: কলকাতা) পৃ- ১৬-২০।

৬৪. Final Draft_DVC-IM-for_Bond_Issue_2012-13_-20-03-2013, P-5.

৬৫. Vishwas Kothari,"Koyna to be epicentre of global study", The Times Of India, 15th March 2011, P-2.

৬৬. Arun Kumar Nayak, “Big Dams and Protests in India: A Study of Hirakud Dam”, Economic & Political Weekly, Vol XLV No 2, 9th January, 2010, P-71.

৬৭. Madhav Gadgil and Ramachandra Guha. ‘Ecology and Equity: The Use and Abuse of Nature in Contemporary India’, (Routledge Publishing: New York, 1995) P-69.

৬৮. Arpita Mandal & Debashish Sengupta, “Radioelemental study of Kolaghat, thermal power plant, West Bengal, India: Possible environmental hazards”, Environmental Geology, June 2003, P-185.

৬৯. B Y Lalit, T V Ramachandran & U C Mishra, “Radiation exposures due to coal-fired power stations in India”, Radiation Protect Dosimetry, Nuclear Technology Publishing, Vol 15 No. 3, P-200.

৭০. Arpita Mandal & Debashish Sengupta, “Radioelemental study of Kolaghat, thermal power plant, West Bengal, India: Possible environmental hazards”.

৭১. Amit Dhorde, Anargha Dhorde and Alaka S.Gadgil, “Long-term Temperature Trends at Four Largest Cities of India during the Twentieth Century”, J. Ind. Geophys. Union, Vol-13, No-2, April 2009, P-89.

৭২. অনিন্দ্য ভুক্ত, প্রাগুক্ত।

৭৩. Animesh Chatterjee, প্রাগুক্ত।

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার মধ্যে দিয়ে এক আধুনিকতার নির্মাণ হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘর্ষ, জাতিরাষ্ট্রের যুদ্ধবাদী উত্থানের মাধ্যমে এই আধুনিকতা নানা প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। ইতিহাস শুধুমাত্র মানববিদ্যা চর্চার বিষয় নয়, তা সন্ধান করে মানুষের অগ্রগতি বা অধঃগতির পশ্চাতের ঘটনাবলি সমূহ। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে প্রযুক্তি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাস। আমার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি বিদ্যুতায়ন কিভাবে একটি প্রযুক্তিব্যবস্থা হয়েও মানুষের সামাজিক অবস্থার বিকাশের এক উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ কিভাবে ইতিহাসের আঙ্গিনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্যাণময় দিককেও আলোকিত করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতিহাস চর্চার এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কারণ উনিশ শতকের যে আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) তা বিশ্বযুদ্ধ হওয়াকে ঠেকাতে পারেনি বরং এর গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল উপনিবেশবাদ, যা রাজনীতি, মনোনীতি ও বিভিন্ন ধারার দর্শনের জন্ম দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয়েছিল ঠাণ্ডা লড়াই, একদিকে ছিল সমাজতন্ত্র আর অন্যদিকে ছিল আমেরিকার পুঁজিবাদ, একদিকে ছিল স্বপ্ন অন্যদিকে ছিল বাস্তব, এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল এক নতুন পৃথিবী। একবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশককে বি-উপনিবেশায়ন এর দশক বলা যায়। একদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করেনিয়েছিল কিভাবে আধুনিক পৃথিবীকে পুনরায় নিজেদের অধীনে আনা যায় আর অন্যদিকে পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করা দেশগুলি প্রস্তুত হয় আগামী অজানা ভবিষ্যতের দিকে পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে বিদ্যুতায়ন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, যে দেশ যত বেশী প্রযুক্তির উপর

দখল নিতে পেরেছিল পরবর্তীকালে সেই দেশই নব্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল। এই নব্য সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু জমি বা রাজত্ব দখলের হিসেব ছিল না। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে কিভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির অধীনতাকে পরাধীনতার সম্পর্কে রূপান্তর করা যায় তা নিয়ে শুরু হল এক নতুন প্রতিযোগিতা। ক্রমে প্রযুক্তিগত আধিপত্য এবং 'শক্তি'-র প্রাচুর্য নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৯১ সালের মে মাসে 'দি ইকোনোমিস্ট' পত্রিকা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে খাঁচায় বন্দি বাঘের সাথে তুলনা করে বলে যে ভারতবর্ষ তার অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যে অর্থনৈতিক বিস্তারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে বাস্তবে তা পুরোটাই বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে কোনো শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অত্যন্ত জরুরি এবং বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার এই জন্যই গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে একেবারে শুরুর দিকে বিষয়টা এইরূপ ছিল না। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশদের হাত ধরে সূত্রপাত হওয়া বিদ্যুতশিল্পের মূল চালিকাশক্তি ছিল বেসরকারি ব্যক্তিগতমালিকানাধীন সংস্থাগুলি। সাধারণ মানুষ প্রাথমিকভাবে বিদ্যুতকে একটি রহস্যময় শক্তি হিসাবে দেখেছিল। একদল মানুষ, মূলত অভিজাতরা, বিদ্যুৎকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির যৌক্তিকতাসম্পন্ন একটি উপকরণ বলে মনে করেছিল। বিদ্যুতের প্রবর্তনের সঙ্গে বেশ কিছু পুরানো পেশার অবসান ঘটতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক নতুন পেশার আবির্ভাব হয়। বিদ্যুতের আবির্ভাবের ফলে ক্রমে পেশী শক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৈদ্যুতিক পাখার আগমনের সাথে সাবেকি পাঙ্খাপুলারদের জীবিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল (যদিও পাঙ্খাপুলারদের কথা স্বাধীনোত্তর পর্বে পঞ্চাশের দশক অবধিও পাওয়া যায়)। বৈদ্যুতিক ট্রামের আগমন পূর্বের ঘোড়ায় টানা ট্রামের সাথে যুক্ত থাকা ঘোড়াগুলোকে অবসরের দিকে

এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে বেশ কিছু নতুন পেশার আবির্ভাব হয়। বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, পরিদর্শক, বিক্রয়িক (বিদ্যুতশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত) এই নতুন পেশাগোষ্ঠীর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও, নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গবেষক, অধ্যাপক ও উদ্যোক্তারাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদ্যুতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভারতের সর্বস্তরের মানুষ, রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদদের মধ্যে থেকে বিদ্যুতশিল্প ক্ষেত্রের 'ভারতীয়করণের' দাবিটি অঙ্কুরিত হয়। তারা বিদ্যুৎ এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং এটিকে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করত।

স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতবর্ষে বিদ্যুতশিল্পে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে যে একেবারেই অপ্রতুল তা বলা যায় না তবে একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বন্টন কোনো ক্ষেত্রেই উন্নত দেশগুলির মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়নি। ইতিবাচক দিক হল পারমাণবিক শক্তি ছাড়া বিদ্যুতশিল্পের অন্য ক্ষেত্রগুলিতে বিদেশী প্রভাব কমিয়ে আনার এক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরেই দেশীয় নেতৃত্ববর্গ ও নীতিনির্ধারণকারীরা স্থিতিশীল স্বাবলম্বী অর্থনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল যার মূল উপাদান ছিল নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎশক্তি। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ বা শক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হলেও এর বাস্তবায়ন করা ছিল এক কঠিন বিষয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশ ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে চিরাচরিত এই সমস্যাগুলির সঙ্গে অন্যান্য অন্তরায়ও ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে বেসরকারি ব্যক্তিগত সংস্থার মাধ্যমে দেশের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কলকাতা কেন্দ্রিক ক্যালকাটা ইলেকট্রিক

সাপ্লাই কর্পোরেশনের হাতে ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার। একথা সর্বজনবিদিত যে ঔপনিবেশিক ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যনগরী ছিল কলকাতা, যার ফলস্বরূপ বিদ্যুতের সুবিধা এই অঞ্চলেই বেশী দেখা গিয়েছিল। যদিও বিদ্যুতের হার নিয়ে সি.ই.এস.সি-র উপভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল বেশি, যা পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতে বিদ্যুতশিল্পের জাতীয়করণের দাবির অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শহরের এবং আশেপাশের বেশিরভাগ শিল্পই প্রধান 'শক্তি' হিসাবে বিদ্যুৎকে বেছে নিতে শুরু করে। বলা বাহুল্য এই নতুন প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে কলকাতার শিল্পক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। তবে তা কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার কার্যনির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল না। যার ফলে শহুরে রাস্তার আলো এবং গার্হস্থ্য বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ফ্যান এবং আলোর ব্যবহারের দ্বারা শিল্প চাহিদার অভাব পূরণ করার চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে এই ব্যবসা যে লাভজনক ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যুতের মত অতিপ্রয়োজনীয় এক প্রযুক্তি যেখানে পণ্য সেই শিল্প যে বিস্তার লাভ করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী সময়ে মফঃস্বল শহরগুলিতে বাঙালিদের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত বেশ কয়েকটি ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থার কথা জানা যায় যারা মূলত তেল বা বাস্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করত। সি.ই.এস.সি নিজেও মফঃস্বলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে আগ্রহী ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৩৬ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সি.ই.এস.সি তিন মাইল লম্বা মেইন লাইন বসিয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ২০শে এপ্রিল শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভজীর মন্দিরে শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. হাওয়েলস প্রথম আলোর সুইচ ব্যবহার করেছিলেন।[১] চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, বর্ধমানের ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি, শিলিগুড়ি ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং আরও

অনেকের উদাহরণ এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে বিদ্যুতশিল্পে দেশীয় উদ্যোগের কোনো অভাব ছিল না।[২] তবে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি।

স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং রাজ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দিলেও অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রকল্পগুলিতেও বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করেছিল। যদিও পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের সমস্যা এবং সর্বোপরি নীতি সংক্রান্ত সমস্যা এই শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হওয়ার দরুণ ভারতকে নানা আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং যার ফলস্বরূপ বেশ কিছু পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা এক ব্যয়বহুল বিষয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই উৎপাদনকেন্দ্র থেকে মুনাফা লাভ করতে গেলে তার স্থায়িত্বকাল বেশি হতে হয় যার জন্য প্রয়োজন ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও ঐ প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য সুদক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর। ভারতের মত উন্নয়নশীল কৃষিনির্ভর দেশে এই দুই উপকরণেরই অভাব ছিল। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে লক্ষ্য করা যায় বেশ কিছু পরিবেশগত সমস্যা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণের তারতম্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। তবে কোনটা বেশী ক্ষতিকর কোনটা কম ক্ষতিকর তা পরিমাপ করা সম্ভবপর না হলেও পরিবেশের উপর এর প্রভাব ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা। যেহেতু আমাদের দেশের বেশীরভাগ কয়লা দ্বারা উৎপাদিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তাই দূষণের বিষয়টিও এটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ভারতের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের অধিকাংশই তাপবিদ্যুৎ এবং এই উৎপাদনের মূল উপকরণ হল কয়লা। ১৯৯৯ সাল অবধি

ভারতের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭৫% বিদ্যুৎ কয়লা পুড়িয়ে উৎপাদিত হত।[৩] কয়লার দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা বায়ুকে দূষিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। এর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম, যা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কয়লা পুড়িয়ে যে ছাই নির্গত হয় তা বাতাসের সাথে মিশে গিয়ে বাতাসকে দূষিত করে এবং এই ছাইকে যদি কোনো নদী বা জলাশয়ে ফেলা হয় তাহলে তা সেখানকার জলকে দূষিত করে। আমাদের দেশে ব্যবহৃত কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ বেশী থাকে। সর্বোপরি কয়লা বা জীবাশ্ম জ্বালানির ভান্ডার দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে যা এই সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমানে বিশ্ব, শক্তির উপাদান সংক্রান্ত যে সংকটে ভুগছে তা নিরসনের জন্য প্রয়োজন শক্তি উৎপাদনের পুনঃব্যবহারযোগ্য উৎস এবং সেই উৎসটিকে এমন হতে হবে যাতে তা পরিবেশকে দূষিত না করে। এই দুই বিচারেই, জলবিদ্যুৎ হতে পারত তাপবিদ্যুতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকল্প। কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আনুষঙ্গিক বিপদগুলি এই পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জলাধার একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল এবং নদীর বুকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁধ নির্মাণ করে এই জলাধার নির্মাণ করতে হয়। জলাধারের উচ্চতা যত বাড়ানো হয়, পাল্লা দিয়ে বাড়াতে হয় সংলগ্ন জলাশয়ের জমির পরিমাণও। আর বাঁধ যত বেশি জমি গ্রাস করে ততই বাড়তে থাকে আনুষঙ্গিক বিপদগুলি। আসলে বাঁধগুলি নির্মাণের জন্য সাধারণভাবে বেছে নেওয়া হয় নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলকে। এই এলাকাগুলি মূলত অরণ্যাবৃত। অরণ্যগুলি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধও হয়। আর এই এলাকায় যারা বাস করে তারা এলাকার স্থানীয় অধিবাসী। বাঁধ তৈরি করতে গেলে সবার আগে ধ্বংস করতে হয় এই বনভূমিকে। বনভূমি ধ্বংস হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলে বসবাসরত মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, যা ঐ অঞ্চলের সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রকেই প্রভাবিত করে। সবথেকে অসুবিধার বিষয় হল এই যে, বাঁধ নির্মাণ

করে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তা কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নয়, তা অনেক বেশী ভাবে সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর পরিকল্পনার এক অঙ্গ। অর্থাৎ তারা এই বিদ্যুতের সুবিধা সেইভাবে না পেলেও তাদের উৎপাটিত হতে হয়। যার ফলস্বরূপ ভারতের ইতিহাসে বেশ কিছু এরকম নিদর্শন আছে যেখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হলে তা নিয়ে জনরোষ দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে ১৯২০ সালে টাটা গোষ্ঠী পুরাতন বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুনে থেকে ২০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে মূলশি নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করেছিল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। মালভা সম্প্রদায়ের প্রায় ১১০০০ পরিবার তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। মূলত এই মালভা সম্প্রদায়ের মানুষরাই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা আড়াই বছরের মধ্যেই এই আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলেও পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার্থে ঔপনিবেশিক ভারতে হওয়া এই আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।[৪] স্বাধীনোত্তর পর্বেও বেশ কিছু বাঁধবিরোধী আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। সত্তরের দশকে কেরালার মালাবার উপকূলের নিকট সাইলেন্ট ভ্যালী অঞ্চলের নিকটস্থ কুন্তিপুঝা নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প ঘোষণা করলে কেরালার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' এর বিরোধিতা করেছিল। এই বিরোধিতায় স্থানীয় অধিবাসীরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (WWF) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কন্সারভেশান অফ নেচার (IUCN) সহযোগিতা লাভ করেছিল। অবশেষে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩ সালে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আশির দশকে নর্মদা উপত্যকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নর্মদা ভ্যালী ডেভেলাপমেন্ট প্রোজেক্টকে নিয়েও আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল। বিশিষ্ট পরিবেশ ও সমাজকর্মী মেধা পাটেকার এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান

করেছিলেন।[৫] সাম্প্রতিক কালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উত্তর-পূর্বাংশে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলতে গেলে সেখানেও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। উত্তরপূর্ব ভারতের সুবর্ণসিঁড়ি, তিপাইমুখ এবং পাগলাডিয়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হয়েছিল।[৬] এর সাথে সাথেই বাঁধ ভেঙে বা বাঁধের জল ছাড়লে হড়কা বান হওয়ার সম্ভাবনাও হয় প্রবল। অপর আরেকটি সমস্যা হল গ্রীষ্মকালে বা খরা হলে এই বাঁধ তাঁর প্রয়োজনীয়তা হারায় এবং বিদ্যুতের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ব্যাহত হয়। বলা বাহুল্য ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এটি এক অনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সমস্যা। এছাড়াও বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে এবং সাথে সাথেই ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এসবে পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের এককালীন খরচ অনেক বেশী। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের কাছে এই মূলধন যোগান দেওয়া ছিল এক অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এইধরনের নানা সমস্যার জন্যই জলবিদ্যুৎ সঠিক বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। তবে আঞ্চলিক চাহিদাভিত্তিক ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এই উৎখাত বা উৎপাটনের সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে এবং আঞ্চলিক চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিভিন্ন উপায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভারত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। স্বাধীনোত্তর পর্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি সারা দিন ধরেই বিদ্যুতের যোগান দিতে পারে। গ্রীড ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে সমাজের শক্তির চাহিদা মেটাতে বায়ু, সৌর, বায়োমাস এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সমন্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পরমাণু বা নিউক্লিয়ার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনও এক অভিনব পন্থা কিন্তু এরও নানা খামতি ছিল যা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে। একথা অবশ্যই ঠিক যে এযাবৎ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যে দুর্বিপাক ঘটেছে তা নিতান্তই দুর্ঘটনা এবং মানুষের অসতর্কতার ফল। তবে এইসকল ব্যবস্থা গড়ে

তুলতে যে বিপুল পরিমাণে অর্থ ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিল তা নব্বইয়ের দশকেও ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে এক অন্যতম মূল সমস্যা ছিল। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে এবং উৎপাদন শুরু করতে দীর্ঘ সময় লাগে। ভারতের তারাপুর, রাজস্থান, মাদ্রাজ, নাড়োরা, কাকরাপার, কাইগা প্রভৃতি উৎপাদনকেন্দ্রগুলি পুরোমাত্রায় শুরু হতে বেশ কিছু দিন লেগে গিয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন সময় বেশী লাগে তেমনই প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত প্রাথমিক খরচ বেড়ে যায় এবং এই সংশোধিত খরচের মাত্রাও নেহাত কম ছিল না। আবার উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে খরচ যত বৃদ্ধি পাবে ততই ঐ উৎপাদনকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দামও বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখতে হবে উৎপাদিত বিদ্যুতের গ্রহীতা হল সাধারণ মানুষ। এই সমস্যা দূর করার জন্য যে বৈদেশিক সহায়তা নেওয়া হত তা ছিল দুই প্রকারের যথা আর্থিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। সহযোগিতা যে ধরনেরই হোক না কেন তা কিন্তু সেবামূলক ছিল না। বরং বলা ভালো তা ছিল নব্য সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার স্বরূপ। বিদ্যুতের মত অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের রাশ যদি বিদেশী শক্তির হাতে থাকে তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। ষাটের দশক থেকেই পরিবেশকর্মীদের বিক্ষোভের ফলে প্রথম বিশ্বের দেশগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিল যার ফলে এইসব জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিরা খুঁজেছিল বিনিয়োগের নতুন স্থান। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হিসাবে দেখা দিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে এক কেন্দ্র-প্রান্তিকতার ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম বিশ্বের দেশগুলি ছিল এই প্রযুক্তি-পুঁজির ভরকেন্দ্র এবং প্রান্তে অবস্থান করেছিল ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি। তবে এই কেন্দ্র-প্রান্তিকতার ধারণার এক ভিন্ন সংস্করণ দেখা যায় শহর ও গ্রামের মধ্যে দিয়ে। একদিকে ছিল বিদ্যুতায়নের উপর নির্ভরশীল শহুরে আধুনিকতা আর অপরদিকে ছিল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কলকাতা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের বাকি শহর ও

মফঃস্বল অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করলেও সত্তরের দশকের গোঁড়া থেকে পুরোদস্তুর গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু করেছিল। এই বিদ্যুতায়নের হার নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মাথায় রাখতে হবে এই বিদ্যুতায়ন ছিল অলাভজনক প্রকৃতির। উৎপাদনকেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক ভাবে দূরত্ব বেশী হওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া ছিল এক ব্যয়বহুল প্রকল্প এবং একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব থাকায় বিদ্যুতের চাহিদাও আশাব্যাঞ্জক ছিল না। কলকাতার বিদ্যুতায়নের ফলে যে আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল তা কিন্তু বিদ্যুতায়ন পরবর্তী গ্রামীন আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য ছিল না। স্বাধীনতার পর যখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন হল তখন কিন্তু এই আধুনিকতার সংজ্ঞাও বদলে যেতে থাকে। সি.ই.এস.সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এদের মধ্যেও কিন্তু এক পার্থক্য ছিল। আমার গবেষণা পত্রের সময়কালের এই দুই সংস্থার অধীনস্থ অঞ্চলের মধ্যেকার বিভেদও স্পষ্ট। একদিকে ছিল আরবান মডার্নিটি আর অন্যদিকে ছিল গ্রামীণ আধুনিকতা। সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে এক ধারণা ছিল যে সি.ই.এস.সি মানেই আধুনিক। এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে সি.ই.এস.সি বা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক সরবরাহিত বিদ্যুতের মধ্যে গুণগত কোন তফাৎ ছিল না। তফাতটা হয়ে গিয়েছিল দুই সংস্থার অভিগমনে। একদিকে ছিল বেসরকারি সি ই এস সি যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিজের পণ্যের সঠিক বিপণন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান এবং অপরদিকে ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈদ্যুতিক ‘পরিষেবা’ প্রদানকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। বরং বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে সি ই এস সি-র উৎপাদন ঘাটতি মেটাতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ব্যবহার করা হয়েছে। এও এক ধরনের রাজনীতি বললে ভুল হবে না। অর্থাৎ বিদ্যুৎ যে আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল বলে আমরা দাবী করে আসছি তার মধ্যেও প্রকারভেদ ছিল।

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের নিজস্ব এক চরিত্র ছিল তবে তার সঙ্গে সমান্তরালে বহমান সরকারি নীতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রথমত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক চাহিদা মেটানোর জন্য ডিজেল জেনারেটার ব্যবহার করা ছিল এক ক্ষণস্থায়ী সিদ্ধান্ত এবং বলা বাহুল্য এই ধরনের উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কোনও ভবিষ্যৎ ছিল না। দ্বিতীয়ত, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে যে 'প্রোটোকল' মেনে চলতে হত তা ছিল এক দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া এবং যার ফলে সেই সিদ্ধান্ত তার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলত। আবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, এক গণকৃত্যক সংস্থা হলেও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা প্রশ্নাতীত ছিল না। একবিংশ শতকের ষাটের দশকে যখন দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মী বিরোধে কেন্দ্রীয় সরকার জর্জরিত সেইসময়ে সরকার ১৯৬৮ সালের 'অত্যাবশ্যকীয় কর্ম রক্ষণাবেক্ষণ অর্ডিন্যান্স' জারী করেছিল।[৭] কেন্দ্রীয় সরকার এই অত্যাবশ্যকীয় কৃত্যকগুলির মধ্যে কিন্তু বিদ্যুতশিল্পকে রাখে নি, যা বিদ্যুতশিল্প সম্পর্কে সরকারের উদাসীন মনোভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। এইসময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে হয়ে চলা কর্মীবিক্ষোভ সহজে প্রশমিত করতে না পারার পিছনে এই অর্ডিন্যান্স যে একেবারেই কোন ভূমিকা পালন করেনি একথা বলা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের মধ্যে যে কাঠামোগত বিভেদ ছিল তাও কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে পর্ষদ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারী করে কম্পেন্সেশান বা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মহিলাদের চাকরি দেওয়ার বিরোধিতা করা পর্ষদ তথা রাজ্য সরকারের মহিলা কর্মচারীদের নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক, একদেশদর্শী মনোভাবকে প্রকাশ করেছিল।[৮]

বিদ্যুতের সহজলভ্যতা প্রযুক্তির উন্নয়নকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ মানুষের বিনোদনের সংজ্ঞাকেও পাল্টে দিয়েছিল। সিনেমা দেখানোর

প্রেক্ষাগৃহ থেকে ঘরে ঘরে টেলিভিশন, অ্যান্টেনা থেকে 'কেবল লাইন' অবশ্যই প্রযুক্তির দান কিন্তু বিদ্যুতের ছোঁয়া না পেলে এসবই অর্থহীন, আক্ষরিক অর্থেই 'বোকাবাক্স'-তে পরিণত হবে। বর্তমান দিনের ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির সূত্রপাত এই সময় থেকে কিনা সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। মধ্যবিত্তের সমস্যাগুলোকে পাল্টাতে না পারলেও সেই সমস্যার প্রতি তার মনোভাব পাল্টে দিয়েছিল এই ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, যা আমাদের মূল সমস্যাগুলো থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যখন টেলিভিশান এসে গেল তখন কিন্তু তা মানুষের অবসর এবং ভালো লাগার (লেসার অ্যান্ড প্লেজার) সংজ্ঞাকে পাল্টে দিয়েছিল। আমাদের স্বাধীনোত্তর সমাজব্যবস্থায় সমস্যার কোন অভাব ছিল না কিন্তু মানুষ এই সান্ধ্যকালীন অবসরযাপনের সময়ে টিভির মধ্যেই তার সাময়িক সুখ খুঁজে পেয়েছিল যার অন্যতম প্রধান উপরকরণ ছিল বিদ্যুৎ শক্তি। আবার বিদ্যুৎ যেমন শিল্পের পক্ষে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল তেমনই বিদ্যুৎ না থাকাটাও কিছু শিল্পের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র লোডশেডিং-র সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য, জেনারেটার বা ব্যাটারি প্রস্তুতকারি বিভিন্ন সংস্থার জন্ম হয়েছিল। বিদ্যুতায়নের দৌলতে মানুষের ভোগবাদিতাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল যা বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের বিদ্যুৎ সংরক্ষণ বা বিদ্যুতের অভাব দূরীকরণের পন্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছিল। আদতে বিদ্যুৎ দুইভাবে মানুষকে প্রভাবিত করেছিল একটি দীর্ঘবীক্ষণে (লং ডিউরেশান) যেমন বিদ্যুতায়নের মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থায় সামগ্রিক এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অন্যদিকে তাৎক্ষণিক এক পরিবর্তন, যার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে অঞ্চলে বিদ্যুৎ ছিল না সেখানে বিদ্যুতের সংযোগ হওয়ায় সেই অঞ্চল এক ধাক্কায় অনেকটা অগ্রসর, উন্নতি এবং আধুনিকতার স্পর্শ পায়।

বিদ্যুতশিল্পের ইতিহাস বা বিদ্যুতায়নের ইতিহাস কিন্তু কোনও ভাবেই একমাত্রিক বা কোনও ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তি একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ এবং এর সঙ্গেই ছিল বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন গ্যাজেটের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে বিদ্যুতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এই সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগতির অন্যতম প্রধান উপকরণ। বি-উপনিবেশায়নের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন পূর্বতন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল অন্যদিকে তেমনই প্রথম সারির দেশগুলি উপনিবেশিত অঞ্চলগুলির স্বাধীনতাকে কিভাবে নব্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দিয়ে পুনরায় নিজেদের দখলে রাখা যায় তার পরিকল্পনা করেছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ইলেক্ট্রনিক্সের যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তার মূল ছিল দুটি দেশের হাতে যথা আমেরিকা ও জাপান। এই ইলেকট্রনিক্স বিপ্লবই সারা পৃথিবীতে এক ধরনের কল্পিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তার অভিঘাত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলিতে বিশ্বায়নের মোড়কে নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। যে দেশ যত বেশী বিদ্যুতায়ন করতে পেরেছিল সেই দেশ তত বেশী ইলেকট্রনিক্স বিপ্লবের সুযোগ করেনিতে পেরেছিল। অর্থাৎ বিদ্যুৎ, বি-উপনিবেশায়িত পৃথিবীর আধুনিকতার যে নব্য নির্মাণ হচ্ছিল সেখানে আধুনিকতার যে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের যে যুক্তির বয়ান তাকেই আলোকিত করেছিল। বিদ্যুতায়নের মধ্যে দিয়েই মানুষের মনের কল্পনা, কামনা, বাসনা প্রভৃতি বর্গগুলি নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। একসময়ে মানুষের স্বপ্ন ছিল এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে দারিদ্র্য, শোষণ,শাসন থাকবে না। তা বাস্তবায়িত না হলেও এই কল্পিত সমাজব্যবস্থার জন্য যে লড়াই তা বিদ্যুতায়নের মধ্যে দিয়ে, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন না করে সমস্যার মধ্যেই সমাধানের বুনন তৈরি করেছিল, যা এক বিকল্প আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যা

কোনওদিনই পাবে না, বিদ্যুতায়ন সেই হতাশা থেকে মানুষকে 'ভার্চুয়ালী' মুক্তি দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশ্বায়িত পৃথিবীর যে আলো, প্রযুক্তি প্রসারলাভ করেছিল সেখানে সব সমস্যার সমাধান না থাকলেও তা সর্বব্যাপী পূর্ণতা লাভ করার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বিদ্যুতায়নের ফলে যে ভার্চুয়াল পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল তা মানুষের রিয়্যালিটি বা বাস্তব থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে তাকে এক তথাকথিত উন্নত পরাবাস্তবের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এর সুফল ও কুফল দুইই ছিল কিন্তু তবুও বলা যায় বিদ্যুৎ থেকে যে বৈদ্যুতিন এবং তার থেকে যে বৈদ্যুতিন গ্যাজেটের অবতারণা তা ইতিহাসের স্থান, কাল, কার্যকারণ তত্ত্বকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের যুক্তি কাঠামো যে সম্ভাবনার কারণে হয়, বিদ্যুতায়ন সেই সম্ভাবনাকেই এক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে বিচার করেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যুৎ মানুষের এক ভালো লাগার বস্তু যা এক 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর এনে দিয়েছিল। আগে মানুষ যখন অসহায় বোধ করত তখন সে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হত কিন্তু পরবর্তীকালে সেই স্থান নিয়েছিল প্রযুক্তি, যার চাবিকাঠি ছিল বিদ্যুতের হাতে। নিষ্ক্রিয়ভাবে থেকেও বিদ্যুৎ কিন্তু সমাজকে পাল্টাতে সাহায্য করেছিল। আধুনিকতার এক নতুন সংজ্ঞা বিদ্যুৎ এনে দিয়েছিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট না হওয়া অবধি যেমন বিদ্যুতের তেজ আঁচ করা যায় না তেমনই বিদ্যুতের আগমনের পূর্বে বিদ্যুতের প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে মানবজাতির সম্যক কোন ধারণা ছিল না। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বর্তমান দিনে এমন কোন বিষয় নেই যে বিদ্যুতের কাঠামোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নয়।

এই গবেষণা সন্দর্ভে আলোচ্য সকল অধ্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিবর্তন, বিস্তার ও তার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করেছি। বিদ্যুতের আবিষ্কার ও ভারতবর্ষে বিদ্যুতের আগমন এবং ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের বিস্তার এবং স্বাধীনোত্তর পর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি কিভাবে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুতশিল্প এগিয়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে বিদ্যুতশিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কর্মীদের সমকালীন রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতাও অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলের বিদ্যুতায়ন ও সেই সংক্রান্ত কাজে অচিরাচরিত শক্তির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যদিও টেকনোক্র্যাটদের উপস্থিতি পরিবেশের উপর বিদ্যুতায়নের প্রভাব কিংবা গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বিচারে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে আরও পরিণত করে এই প্রকল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হয়।

বিদ্যুতশিল্পের উন্নতির মাধ্যমে উচ্চমানের জীবনযাপন অর্জন করা সম্ভবপর হতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু বিদ্যুতশিল্পের উন্নতি বা বিদ্যুতায়নকে বাস্তবায়িত করা এক কঠিন কাজ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে যে বিদ্যুৎ-নীতি প্রচলিত ছিল তা জনগণের স্বার্থবাহী কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। পরিষেবামূলক এই পণ্যটিকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার জন্যেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংকট আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। এর ফলস্বরূপ, স্বাধীনোত্তর সময়ে, খুব স্বাভাবিক কারণেই চাহিদা ও উৎপাদনের অসংগতি দেখা গিয়েছিল। ব্যাপক অঞ্চলকে অন্ধকারে ডুবে থাকতে হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর গতি আশানুরূপ ছিল না এবং যেসকল গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভবপর হয়েছিল সেই সকল গ্রামে দীর্ঘদিন “লো-ভোল্টেজের” সমস্যা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হওয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উপর ছিল রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের সুব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এবং পরবর্তীকালে এই উদ্দেশ্যকে সফলতর করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টন কাজের নিরিখে ভেঙে দেওয়া হয়।

বিদ্যুতের প্রতি এক অনাস্বাদিত নির্ভরতা সমাজক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন এনেছিল। বিদ্যুৎ বা লোডশেডিং নিয়ে এসেছিল এক সামাজিক বিভাজন, গ্রাম-শহরের পার্থক্য এবং আরও অনেক প্রেক্ষিত বিদ্যুতের আলোকিত ও অনালোকিত তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। উপরন্তু ধনতন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক মালিক ও বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিকের অবস্থা, সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মানুষের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস ধারণা ইত্যাদি নানা বিষয়ে নতুন করে আলোকপাত করেছিল। আবার একথাও ঠিক যে বিদ্যুতশিল্পের বিকাশকে ঘিরে, প্রগতিবিষয় সম্পর্কে, সাধারণ মানুষের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব, তা পরিবেশের সংকটকে বাড়িয়ে চলেছে। উন্নতির মাপকাঠি স্বরূপ বিদ্যুতের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা, বৈদ্যুতিন যন্ত্রে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের (Chlorofluorocarbons) অত্যধিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের দূষণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবিলম্বে সাস্টেইনেবেল ডেভেলাপমেন্ট বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণার এক নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন পড়েছে কারণ বিদ্যুৎ আমরা যে ভাবেই উৎপাদন করি না কেন বিদ্যুতের ব্যবহারকে পরিবেশ বান্ধব করে তোলার প্রযুক্তি আমাদের আয়ত্বে আসেনি এখনও। এই একবিংশ শতকে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের কাছে, বিদ্যুতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর মতো জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা পৌঁছে দেওয়া একান্তই জরুরী। অপরদিকে এটাও ঠিক যে বিদ্যুতের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এই পৃথিবীকে ক্রমশ বাসের অযোগ্য করে তুলছে। এর বিকল্পের অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অচিরাচারিত বা পুনর্নবীকরণযোগ্য সৌর বা বায়ুশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর কথা বলছেন ঠিকই তবে এই প্রকল্প যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ভারতের মত ক্রান্তীয় তৃতীয় বিশ্বের দেশ যাদের কাছে সৌরশক্তির অফুরন্ত যোগান আছে কিন্তু বৃহৎ আঙ্গিকে বা বিদ্যমান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বদলে এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ বা প্রযুক্তি কোনোটাই আমাদের কাছে নেই। অপরদিকে প্রথম বিশ্বের দেশগুলির কাছে পর্যাপ্ত অর্থ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি থাকলেও সেগুলি তারা

ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে বা বলা ভালো সেগুলি নব্য সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলস্বরূপ বিদ্যুতায়নের প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলি বেশ কিছু শিবিরে বিভক্ত; পশ্চিমবঙ্গের মতো আঞ্চলিক রাজ্যেও বিশ্বব্যাপী এই প্রতিযোগিতার প্রভাব অনুভূত হয়। আমরা আশা করি যে মানবজাতির বেঁচে থাকার তাগিদে ও আমাদের আগামী প্রজন্মকে এক নির্মল পৃথিবী উপহার দেওয়ার জন্য একদিন এই বিভাজন মিটে যাবে।

সূত্রনির্দেশ

১. 'শ্রীরামপুরে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগানের বন্দোবস্ত', আর্থিক উন্নতি, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃষ্ঠা – ৮২।

২. Suvobrata Sarkar, Let there be Light: Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1945 (India: Cambridge University Press, 2020), P-251-52.

৩. World Energy Outlook: 2001 Insights, International Energy Agency, 2001; Paris, P-291 (https://iea.blob.core.windows.net/assets/3e3fcda4-e33c-4319-a987-179a0372b035/WorldEnergyOutlook2001-AssessingTodaysSuppliestoFuelTomorrowsGrowth.pdf)

8. Arun Kumar Nayak, "Big Dams and Protest in India-a study of Hirakund Dam", Economic & Political Weekly, Vol XL No. 2, 9th January 2010, Pp-69-73.

৫. তদেব।

৬. Jhimli Bhattacharjee, “Dams and Environmental Movements: The cases from India’s North East”, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 11, November 2013, Pp-1-3.

৭. ‘অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ অর্ডিন্যান্স’, যুগান্তর, শনিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা – ১।

৮. Letter from Bitan Mazumdar (Assistant Secretary, WBSEB Workers’ Union) to The Chairman, WBSEB; Dt. 02/02/1996, (Personal Collection of Mr. Gopal Mukherjee, Retired Jr. Engineer, WBSEB).

পরিশিষ্ট

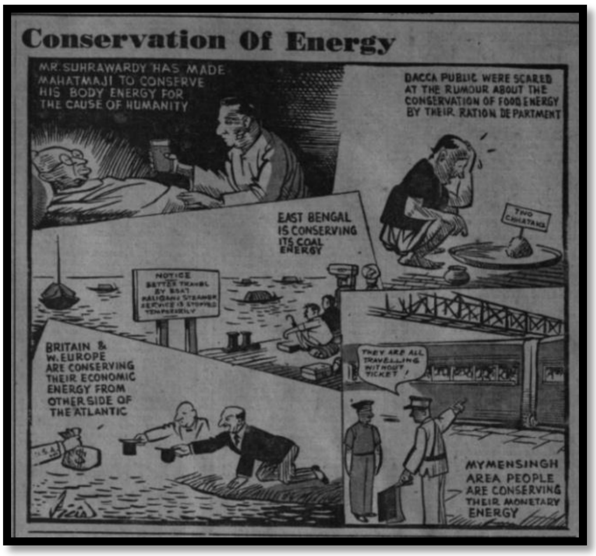

চিত্র ১- ১৯৪৭ সালের ৭ই নভেম্বর অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তি সঞ্চয় নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক এক বিজ্ঞাপন। (সূত্র- অমৃত বাজার পত্রিকা, পৃষ্ঠা-৫)

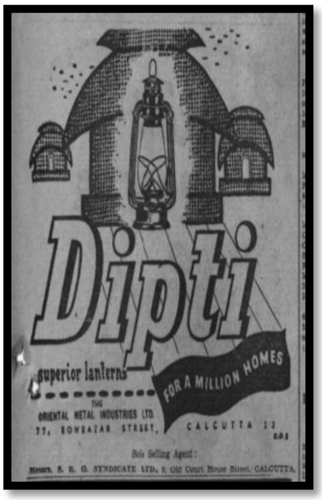

চিত্র ২ ও ৩- ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত দীপ্তি ও উজ্জ্বলা কোম্পানির হ্যারিকেন এর বিজ্ঞাপন।

(সূত্র- যুগান্তর পত্রিকা)

চিত্র ৪- ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ফ্যানের বিজ্ঞাপন। (সূত্র- যুগান্তর পত্রিকা)

চিত্র ৫- স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কলকাতায় "আজাদ হিন্দ দিবস" উদযাপন, পিছনে চলমান বৈদ্যুতিক ট্রাম। (ছবি- অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত)

চিত্র ৬- লোডশেডিং-র সময়ে কলকাতার রাস্তা। (ছবি- অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত)

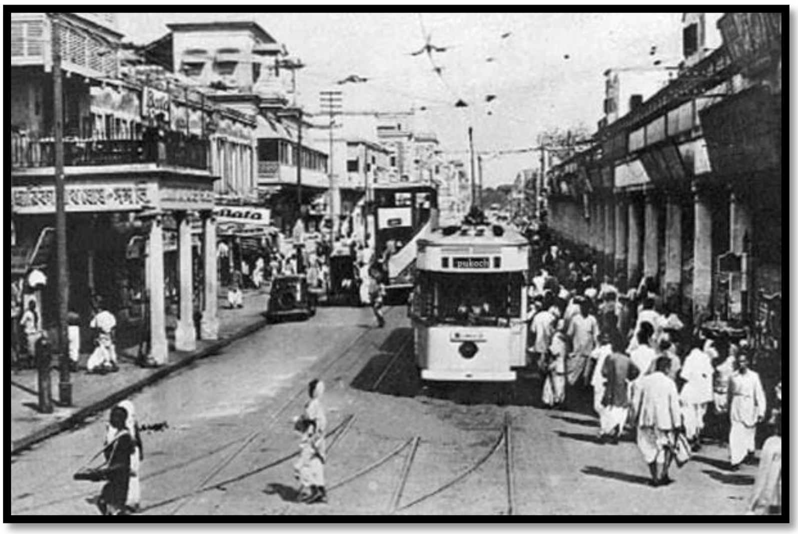

চিত্র ৭- ১৯৪০ সালের হাতিবাগান মোড়ে চলমান বৈদ্যুতিক ট্রাম।

(ছবি- অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত)

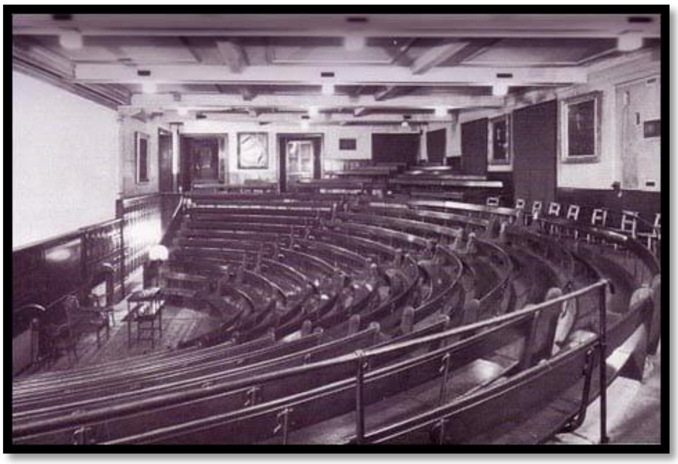

চিত্র ৮- লিট্ এন্ড ফিল থিয়েটার:১৮৮০ সালে স্যার জোসেফ সোয়ানের বক্তৃতার সময় এটি বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা আলোকিত প্রথম পাবলিক রুম ছিল। (সূত্র- বি.বি.সি)

চিত্র ৯ ও ১০- ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত কিছু স্ট্রীট লাইট।

(ছবি- অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত)

চিত্র ১১- 'অ্যান আনস্ট্রেইন্ড ডিমন' -১৯০০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিদ্যুৎ বিরোধী কার্টুন।

(সূত্র- ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি ডিজিটাল কালেকশান)

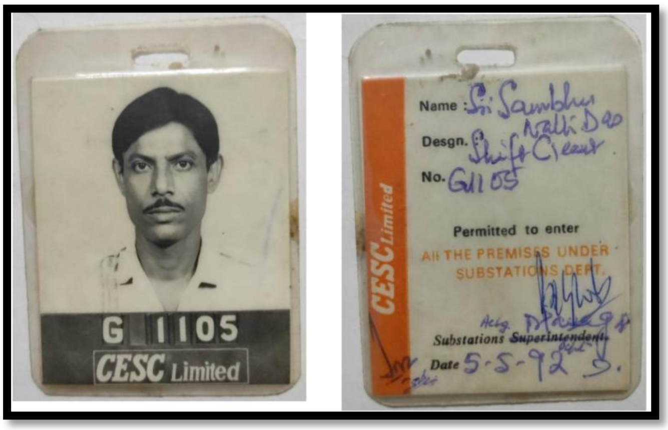

চিত্র ১২- জনৈক সিইএসসি কর্মীর পরিচয়পত্র (হাতে লেখা)
নাম- স্বর্গীয় শম্ভুনাথ দাস
পদ- শিফট ক্লিনার
সাল- ১৯৯২ (ছবি-ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

চিত্র ১৩- জনৈক সিইএসসি কর্মীর পরিচয়পত্র (ডিজিটাল)
নাম- স্বর্গীয় শম্ভুনাথ দাস
পদ- শিফট ক্লিনার
সাল- ২০০১ (ছবি-ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

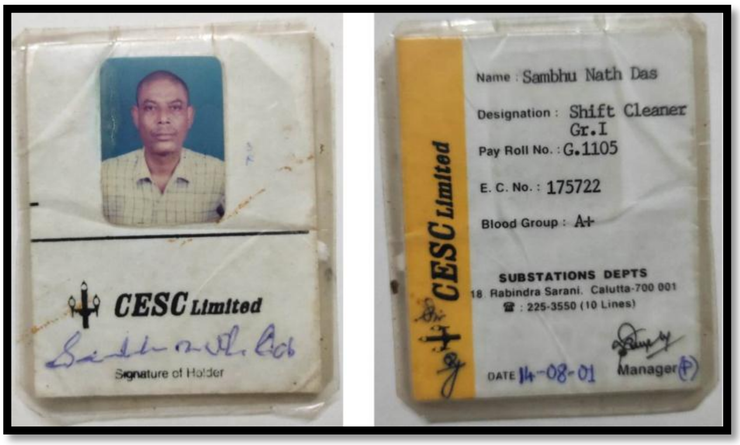

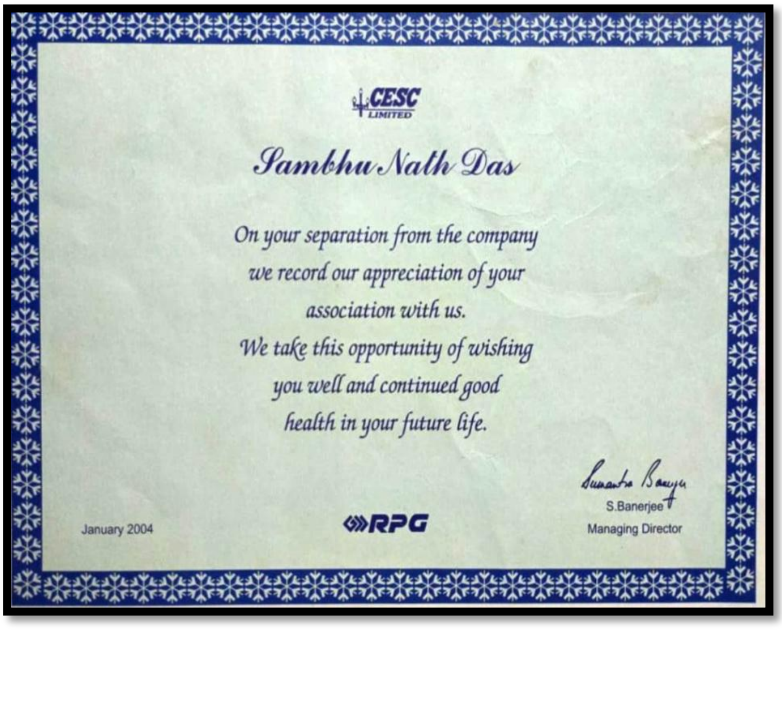

চিত্র ১৪- জনৈক সিইএসসি কর্মীর অবসরের সময়ে সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া শুভেচ্ছাপত্র
সাল- ২০০১ (ছবি-ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

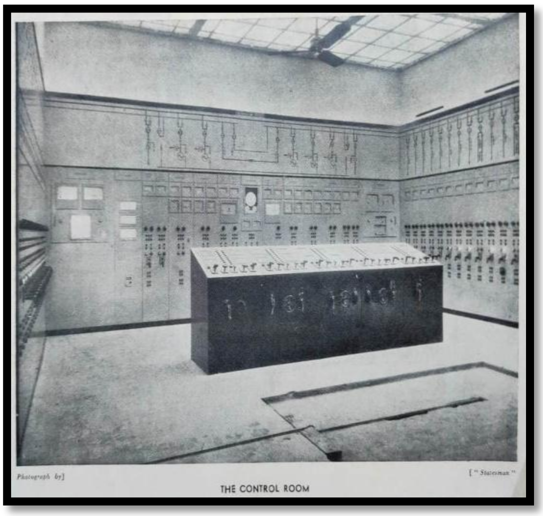

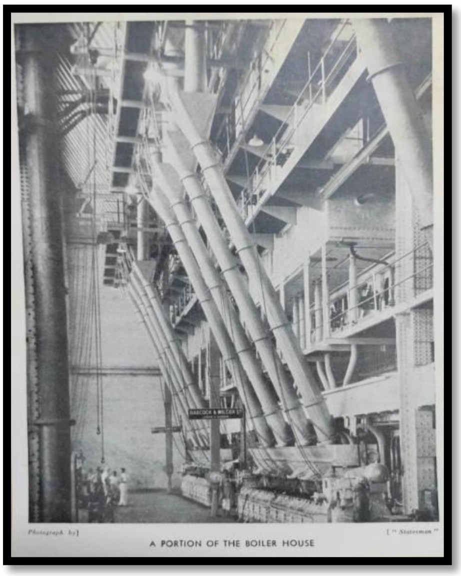

চিত্র ১৫ (বাম দিকে) ও ১৬ (ডানদিকে): [বামদিক থেকে ডানদিকে] সিইএসসি-র নিউ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম ও বয়লার হাউসের কিছু অংশ। (সূত্র-সিইএসসি/ গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

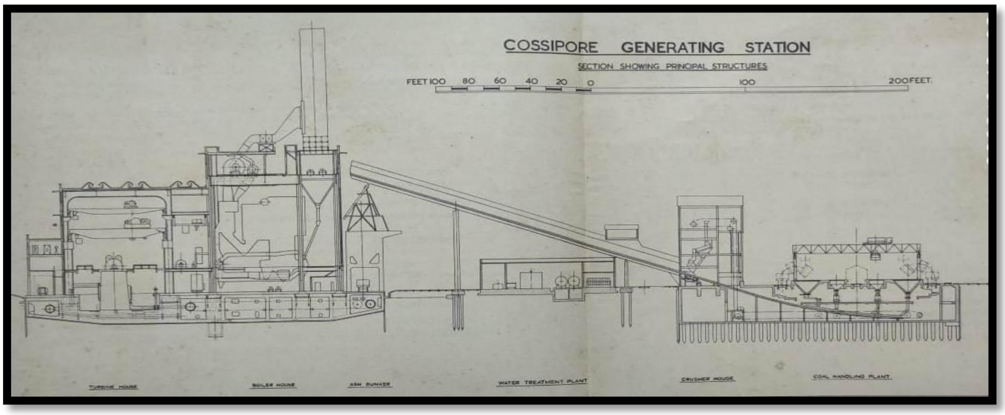

চিত্র ১৭- সিইএসসি-র নিউ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাঠামো। (সূত্র-সিইএসসি/ গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

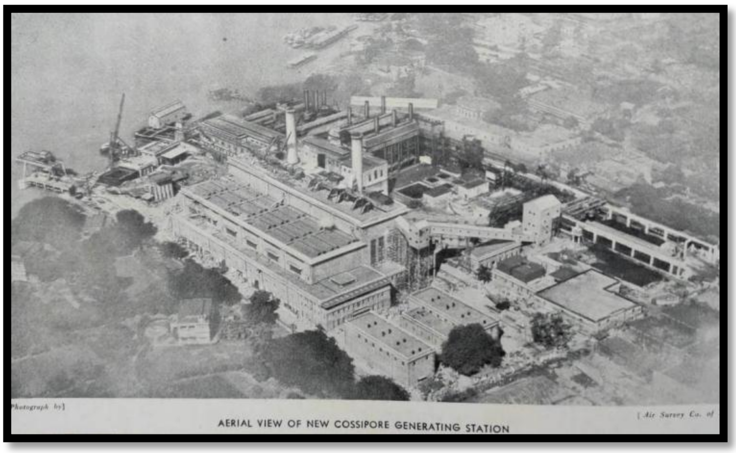

চিত্র ১৮- উপর থেকে তোলা সিইএসসি-র নিউ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছবি। (সূত্র-সিইএসসি/ গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

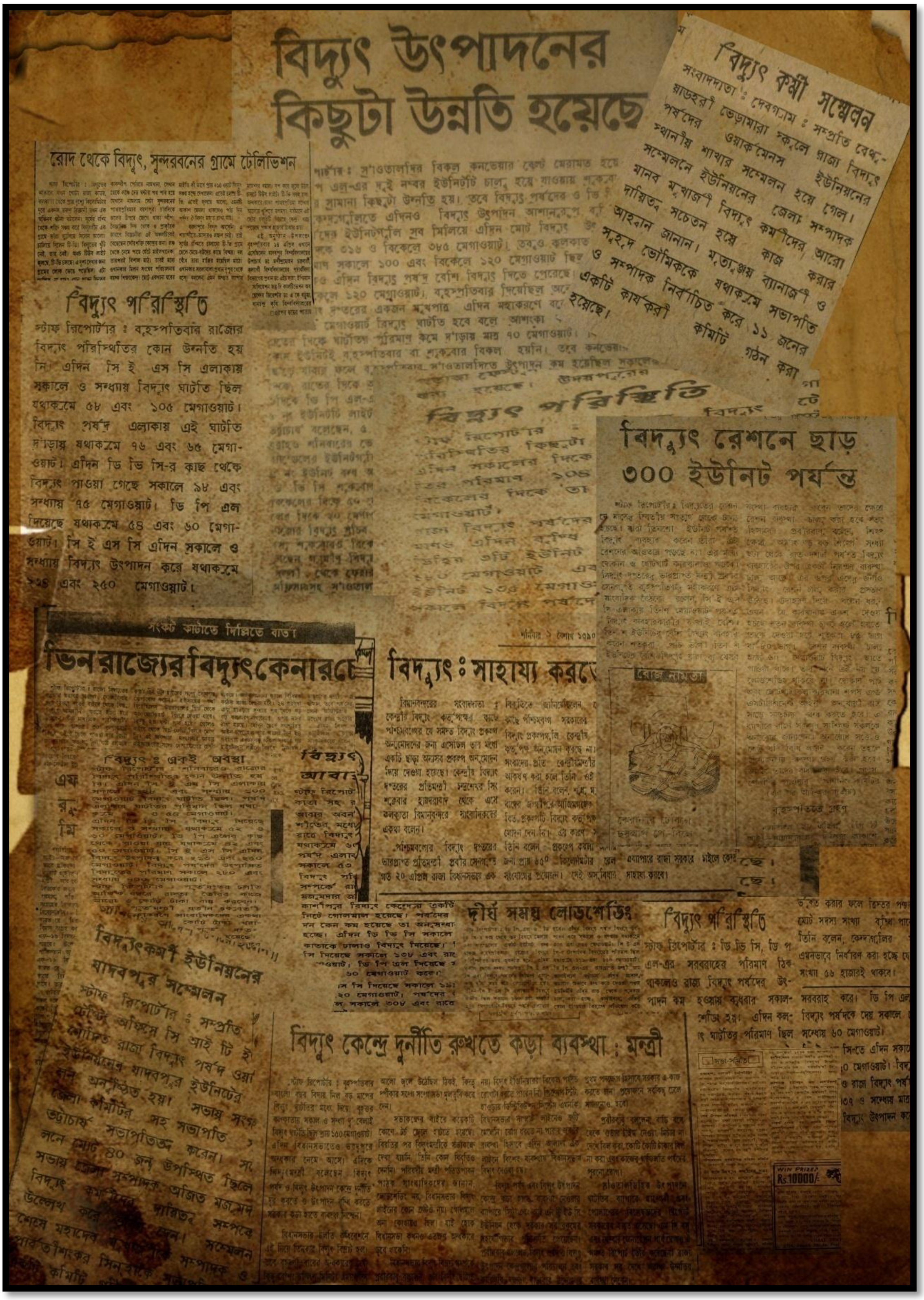

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কিছুটা উন্নতি হয়েছে

বিদ্যুৎ কর্মী সম্মেলন

সংবাদদাতা : দেবগ্রাম : সম্প্রতি বেথুয়াডহরী ভেড়ামারা স্কুলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের স্থানীয় শাখার সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক মানব মুখার্জী বিদ্যুৎ কর্মীদের আরো দায়িত্ব সচেতন হয়ে কাজ করার আহবান জানান। মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী ও সুহৃদ ভৌমিককে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে ১১ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রোদ থেকে বিদ্যুৎ, সুন্দরবনের গ্রামে টেলিভিশন

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

স্টাফ রিপোর্টার : বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নি। এদিন সি ই এস সি এলাকায় সকালে ও সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল যথাক্রমে ৫৮ এবং ১০৫ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকায় এই ঘাটতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৬ এবং ৬৫ মেগাওয়াট। এদিন ডি ভি সি-র কাছ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে সকালে ৯৪ এবং সন্ধ্যায় ৭৫ মেগাওয়াট। ডি পি এল দিয়েছে যথাক্রমে ৫৪ এবং ৬০ মেগাওয়াট। সি ই এস সি এদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যথাক্রমে ২২৪ এবং ২৫০ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

বিদ্যুৎ রেশনে ছাড় ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত

সংকট কাটাতে দিল্লিতে বার্তা

তিন রাজ্যের বিদ্যুৎ কেনা রো

বিদ্যুৎ : সাহায্য করবে

দীর্ঘ সময় লোডশেডিং

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থা : মন্ত্রী

বিদ্যুৎকর্মী ইউনিয়নের যাদবপুর সম্মেলন

চিত্র ১৯- বিভিন্ন পত্রিকা (দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার, যুগান্তর) থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতশিল্প সংক্রান্ত কিছু খবর।

<u>গ্রন্থপঞ্জি</u>

❖ <u>প্রাথমিক উপাদানঃ-</u>

- **<u>Archival Sources:-</u>**

  - **National Archives of India, New Delhi-**

GOI, Department of Economic Affairs.

GOI, Department of Statistics.

GOI, Ministry of Home & Affairs.

GOI, Ministry of Industry.

GOI, Ministry of Labour.

GOI, Ministry of Finance.

GOI, Planning Commission.

GOI, PMO Files. (ESI Section)

GOI, Power and Energy Division.

  - **Nehru Memorial, Museum and Library, (Private Paper Archives), New Delhi-**

GOI, Directorate General of Employment and Training.

GOI, Department of Labour & Employment.

GOI, Ministry of Works, Mines and Power.

GOI, Office of the Electrical Commissioner.

Ashok Mitra Files. (Subject Files)

J P Narayan Files. (Subject Files)

- **National Library of India, Kolkata-**

GOI, Ministry of Law.

GOB, Commerce Department.

GOB, Directorate of Census.

- **Reports and Governments Acts:-**

Annual Report on the Administration of the Indian Electricity Act, 1910, in Bengal; For the year 1932, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1933.

Annual Survey of Industries, 1962, Volume IX, Calcutta: Central Statistical Organistaion, 1962.

Committee on Public Undertakings (1967-68), Twelfth Report, New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1968.

Committee on Public Undertakings (1974-75)(Fifth Lok Sabha),Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1975.

Public Electricity Supply: All India Statistics 1939-1943, Calcutta: Government of India Press, 1946.

Public Electricity Supply: All India Statistics 1947, Simla: Government of India Press, 1949.

Report on Evaluation of The Rural Electrification Programme, Planning Commission, GOI, 1965.

Report on Survey of Labour Conditions in Electric Light and Power Stations; 1965-66, New Delhi: Labour Bureau, 1968.

Report on Survey of Labour Conditions in Electrical Machinery Factories in India, New Delhi: Labour Bureau, 1965.

Tenth Annual Electric Power Survey of India, New Delhi: Central Electricity Authority, 1978.

The Electricity Supply (Act) 1948, As modified up to the 1st March, 1967, New Delhi: Government of India Press, 1967.

The Electricity (Supply) Amendment Bill, 1955, New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1956.

Twenty-Fifth report Standing Committee on Energy (2001), Department of Atomic Energy, New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 2002.

- **Calcutta Electric Supply Corporation & West Bengal State Electricity Distribution Company Limited Publications & Booklets –**

English-

The Calcutta Electric Supply, Brochure released on the occasion of the official opening of the New Cossipore Generating Station,Calcutta, 4th January, 1950.

Story of Electricity in the City of Calcutta, brochure released on the occasion of the inauguration of Titagarh Generating Station, 16th March, 1983.

Story of Electricity in the City of Calcutta, A 40 page profusely illustrated brochure published in Dec.1989.

The CESC Chronicle, *History of CESC; Lighting the City of Joy… Since 1897*’, Calcutta, 2013.

Consumer Handbook, Calcutta Electric Supply Corporation, No Date

Sidrapong, Heritage Power Station, Published by Corporate Public Relations Department- Centenary Booklet, WBSEB, Calcutta. 10 November 1997

<u>বাংলা-</u>

মুখোপাধ্যায় অনুপম, *পারমাণবিক বিদ্যুৎ কার স্বার্থে?*, বিদ্যুৎ প্রবাহ, কলকাতা, ডিসেম্বর,২০০৭।

হালদার বিশ্বজিৎ (রানা), *প্রসঙ্গ: বিদ্যুৎ,* কলকাতা, তারিখ বিহীন।

- **Newspaper & Magazines-**

<u>English-</u>

Capital.

Eastern Economist.

Economic & Political Weekly.

Mainstream.

The Guardian.

The Manchester Guardian.

The Times of India.

<u>বাংলা-</u>

আনন্দবাজার পত্রিকা।

অমৃতবাজার পত্রিকা।

দৈনিক বসুমতী।

ধনধান্যে।

বিজলী।

যুগান্তর।

বিদ্যুৎ বার্তা।

হাতিয়ার।

একতা।

- **Gazette-**

The Calcutta Municipal Gazette

❖ <u>সহায়ক উপাদান-</u>

- **বাংলা গ্রন্থ-**

ঘোষ সিদ্ধার্থ, *কলের শহর কলকাতা,* কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৭।

দত্ত ভবতোষ, *ভারতের আর্থিক উন্নয়ন; অর্থনীতি গ্রন্থমালা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৮৪।

দাশগুপ্ত পরিমল, *মার্ক্সীয় অর্থনীতির সূত্র,* কলকাতা: প্রিন্টার কর্নার প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৮২।

দে শুভঙ্কর সম্পাদিত, *বিজ্ঞানের ইতিহাস ভবিষ্যতের সন্ধান; অতিমারি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০২০।

বসু নির্বাণ সম্পাদিত, *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,* কলকাতা:সেতু, ২০১৩।

মিত্র রাধারমণ, *কলকাতা দর্পণ,* কলকাতা:সুবর্ণরেখা, ডিসেম্বর ১৯৫২।

রায় অমিতাভ, *বাংলার বিদ্যুতশিল্পের বিবর্তন*, কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশান লিমিটেড, ১৯৯৩।

সত্যজিৎ রায়, “হত্যাপুরী”, *ফেলুদা সমগ্র* ২, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

সেন সুকোমল, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭০)*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫।

সুর নিখিল, *কলকাতার নগরায়ন;রূপান্তরের রূপরেখা (১৮০৩-১৮৭৬),*কলকাতা: সেতু, ২০১৫।

- **ইংরেজি গ্রন্থ-**

Banerjee Nirmala, *Demand for electricity*, Centre for studies in Social Science, Calcutta: K P Bagchi Company, 1979.

Bardhan A B, *Trade Union Foundation: Lecture Notes*, New Delhi: AITUC Publications, 1986.

Bernal J D, *Science in History*; Volume One, New York: Cameron Associates, 1954.

Bhagat R P, *Rural Electrification and Development*, New Delhi: Deep & Deep Publications, 1993.

Bunch Bryan with Alexander Hellemans, *The History of Science and Technology*, New York : Houghton Mifflin Company, 2004.

Chakraborty Saroj, *With Dr. B C Roy and other Chief Minister (A record upto 1962),* Calcutta: Bensons, 1974.

Chaudhuri Sukanta, *Calcutta The Living City, Volume 1: The Past, Calcutta*, Oxford University Press, 1990.

-----------------------, *Calcutta The Living City, Volume II: The Present and future*, Calcutta: Oxford University Press, 1990.

Dasgupta Nupur and Amit Bhattacharyya eds, *Essays in History of Science and Technology and Medicine*, Kolkata: Setu Prakashani, 2014.

Eric J Hobsbawm, *Industry and Empire, The Making of Modern English Society; 1750 to present day, Vol.II,* New York: Pantheon Books, 1968.

Goel Madan Mohan, *Administration and Management of Electricity in India*, New Delhi: Deep & Deep Publications, 1987.

Gopalakrishnan K.V., *Inventors who revolutionised our lives*, New Delhi: National Book Trust, 1999.

Gupta Gautam, *Electricity, Calcutta v/s West Bengal*, Samatat, Calcutta, 1984.

Gupta V.P, Gupta Sneh, *Electricity Pricing in India*, Printwell, Jaipur,1996.

Headrick Daniel R., *The tools of empire, technology and European imperialism in the nineteenth century*, New York, Oxford University Press, 1981.

Kannan K.P & N Vijayamohanan Pillai, *Plight of the power sector in India: SEBs and their Saga of Inefficiency*,Thiruvananthapuram: Centre for Development Studies, 2000.

Lal Mukut Behari, *Power Game;An expose of Electriciity and Water Situation*, Calcutta: Staesman Publication, 1984.

Macneil Ian Ed., *An encyclopaedia of the History of Technology*, London and New York: Routledge, 1990.

Mitra Ashok, *Calcutta Diary*, Calcutta: Rupa & Co., 1979.

Munasinghe Mohan, *Rural Electrification for Development, Policy Analysis and Application*, London & New York : Routledge, 1987.

Saha Maya, *Growth, Productivity and Technical progress in Electricity in India;1951-1977*, M.s University of Baroda, Baroda, 1982.

Sarkar Suvobrata, *Let there be light: Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1945*, India: Cambridge University Press, 2020.

Sinha Pradip, *Calcutta In Urban History*, Calcutta: Firma K L M Pvt Ltd, 1978.

Sury M.M and Mathur Vibha, *Five Year Plans of India*, New Century Publications, New Delhi, 2013.

Ruet Joel, Privatising *Power Cuts? Ownership and Reform of State Electricity Boards in India*, New Delhi: Academic Foundation, , 2005.

Thorner Daniel, *The shaping of Modern India,* New Delhi: Allied Publishers Pvt, Ltd, 1980.

➢ **Articles:-**

English-

Allerhand Adam, "Who Invented the Earliest Capacitor Bank ("Battery" of Leyden Jars)? It's complicated", Proceedings of the IEEE, Vol. 106, No.3, March 2018.

Banerjee Sivadas, "POWER CHAOS IN CALCUTTA: Scandalous bungling". The Times of India, Calcutta, Jun 10, 1974.

Basalla George, "The Spread of Western Science", Science, Vol.-156(3775), 1967.

Bhadra Gautam. "West Bengal; The Political Economy of Load-Shedding-I", Frontier, Calcutta, 15th July 1978

Bose K K, "History & growth of power supply in Calcutta area", IEEE-IERE Proceedings- India, Volume-12, Issue: 4, July-August 1974.

Chakravarty Adhir & Timir Basu, "Operation Santaldih", Economic and Political Weekly, Vol 13 No. 40, October 7 1978.

Chatterjee Santosh, "Calcutta's Electric Supply", The Calcutta Municipal Gazette, Vol. XLIX No.15, Calcutta, 12th Feb 1949.

Chatterjee Elizabeth, "A climate of Scarcity: Electricity in India, 1899-2016", in *Scarcity in the Modern World: History, Politics, Society and Sustainability, 1800-2075,* edited by John Brewer, Neil Fromer, Fredrik Albritton Jonsson, and Frank Trentmann, Britain: Bloomsbury Academic, 2019.

-----------------------, "The Asian Anthropocene: Electricity and Fossil Developmentalism", The Journal of Asian Studies, 2019.

Chattopadhyay P., "Electricity Reform", Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 31, Aug. 4-10, 2001.

Chattopadhyay Suhrid Sankar, "Hotel with a History", Frontline, Volume-22 Issue-17, Kolkata, 13-26th August, 2005.

Das Sachindra Kumar, "Better Street Lighting for Calcutta", Edited by Amal Home, The Calcutta Municipal Gazette, Calcutta, 1947.

Dhorde Amit, Anargha Dhorde and Alaka S.Gadgil, "Long-term Temperature Trends at Four Largest Cities of India during the Twentieth Century", J. Ind. Geophys. Union, Vol-13, No-2, April 2009.

Ghosh Amitabha, "Some Eminent Indian Pioneers in the field of Technology", Indian Journal of History of Science, Vol-29, No.1, 1994.

Habib S Irfan, "Engaging with Modern Science and religious orthodoxy in contemporary Islam," In *Essays in History of Science and Technology and Medicine*, edited by Nupur Dasgupta and Amit Bhattacharyya, Kolkata: Setu Prakashani, 2014.

Kamalpur G.D. & R.Y. Udaykumar, "People's participation in rural electrification- A Successful Case", IEEE, 2008.

Kumar Deepak, "Patterns of Colonial Science in India", IJHS, 15 (1), May 1980.

Madan Sandhya, Sweta Manimuthu, Dr. S Thiruvengadam; "History of Electric Power in India (1890-1990)"; IEEE, 2007.

Mandal Arpita & Debashish Sengupta, "Radioelemental study of Kolaghat, thermal power plant, West Bengal, India: Possible environmental hazards", Environmental Geology, June 2003.

Nayak Arun Kumar, "Big Dams and Protests in India: A Study of Hirakud Dam", Economic & Political Weekly, Vol XLV No 2, 9th January, 2010

Rajender B and G.K.Lieten, 'The Sovereign Power of Philips in India', Social Scientist, Vol-13, No-3, March-1895

Sangwan Satpal, "Technology and Imperialism in the Indian context-The case of Steamboat 1819-39", In *Science, Medicine and Cultural Imperialism* edited by Teresa Meade and Mark Walker, London: Macmillan, 1991.

Sarkar Suvobrata, “Domesticating Electricity: Growth of Industry, Utilities and Research in Colonial Calcutta”, The Indian Economic and Social History Review, Vol. 52 No.3, 2015.

---------------------, “The Electrification of Colonial Calcutta: Situating Technical knowledge in Nineteenth Century Bengal”, Studies in History, Vol. 38 No.1/2, Jan-Feb 2010.

---------------------, “Technological Momentum: Bengal in the Nineteenth Century”, Indian Historical Review, 37(1), New Delhi, 2010.

---------------------, “Bengali Entrepreneurs and Western Technology in the Nineteenth Century: A Social Perspective”, Indian Journal of History of Science, 48.3, 2013.

Smith Thomas B., “India’s Electric Power Crisis: Why do the lights get out”, Asian Survey, Vo. 33 No. 4, April 1993.

Tongia Dr.Rahul. “The Political Economy of Indian Power Sector Reforms .”, In *The Political Economy of Power Sector Reform :The Experiences of Five Major Developing Countries*, edited by Thomas C. Heller David G. Victor, Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

বাংলা-

দাশগুপ্ত রণজিৎ, “শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা”, নির্বাণ বসু সম্পাদিত *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, সেতু, কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু প্রকাশনী, ২০১৩।

দাস অমল, “ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাসের বর্তমান সঙ্কট ও সম্ভাবনা”, নির্বাণ বসু সম্পাদিত কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু প্রকাশনী, ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায় অময়, “শক্তি চাই আরও শক্তি”, ধনধান্যে, সপ্তদশ বর্ষ- অষ্টাদশ সংখ্যা, ১-১৫ই এপ্রিল ১৯৮৬।

বসু দীপিকা, “বাংলায় আধুনিক শিল্প শ্রমিকের জন্ম: কৃষক থেকে শ্রমিক”, রঞ্জিত সেন সম্পাদিত *বাংলার শ্রমশক্তি* , কলকাতা: অরুনা প্রকাশন, ২০০০।

বসু নির্বাণ, "বাংলার শ্রমিক চর্চার ইতিবৃত্ত: বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতা", নির্বাণ বসু সম্পাদিত *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু প্রকাশনী, ২০১৩।

বসু নির্বাণ, "প্রাক-স্বাধীনতা কলকাতার একটি গণকৃত্যক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনঃ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-একটি সমীক্ষা", নির্বাণ বসু সম্পাদিত *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু প্রকাশনী, ২০১৩।

ভৌমিক হরিপদ, "কলকাতার শ্মশানঃ নিমতলা," নেওয়া হয়েছে 'স্বদেশচর্চা লোক,' বিশেষ সংখ্যা- বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান ২, প্রণব সরকার সম্পাদিত, কলকাতা: বইমেলা,২০০৪।

সাহা বীরেন, "কলকাতায় পাতাল রেল," ধনধান্যে, পঞ্চম বর্ষঃ সংখ্যা ২১ ও ২২, ১ ও ১৫ এপ্রিল ১৯৭৪।

- **<u>Online Archive</u>**

British Library (http://explore.bl.uk/)

GOI, Indian Culture Archive (https://indianculture.gov.in/)

Internet Archive (https://archive.org/)

The West Bengal Secretariat Library (http://wbsl.gov.in/)